পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডেটেক্টিভ গল্প

কামিনী প্রকাশালয়

১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন/কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম কামিনী সংস্করণ ঃ
শুভ নববর্ষ, ১৩৯৭
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
মাঘ, ১৩৯৮
তৃতীয় সংস্করণ ঃ
ভাদ্র, ১৪০৪
চতুর্থ সংস্করণ ঃ
ফাল্গুন, ১৪০৭

সংকলক ঃ
শংকর আচার্য্য

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

অলংকরণ ঃ
অমল চট্টোপাধ্যায়
দিলীপ দাস

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুনীলকুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৫৯/২ পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভৌতিক গল্প

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভৌতিক গল্প

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভৌতিক গল্প

www.deshkal.com

॥ এতে যা আছে ॥

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পরলোকের হাতছানি	আলফ্রেড হিচকক	৫
প্রেতাত্মার হাতছানি	ব্রাম স্ট্রোকার	৮
ভূতুড়ে বাড়ি	এডগার অ্যালান পো	২৩
রহস্যময় প্রতিচ্ছবি	জর্জ বার্নাড শ'	৩৫
প্রেতাত্মার চক্র	আগাথা ক্রিস্টি	৫০
কঙ্কাল	ম'পাসা	৭৫
ভূতুড়ে মাঠ	ডেনিয়েল ডিফো	৮১
ভৌতিক অতিথি	এলগারনন ব্লাকউড	৯১
ভূতুড়ে শিকার	চার্লস ডিকেন্স	১০৮
আমার ভূত দেখা	এইচ. জি. ওয়েলস	১২১
হানাবাড়ি	রিচার্ড হিউয়েস	১২৭
কংকালে টংকার	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৫
ট্রেনের কামরায় ভূত	লর্ড হ্যালিফ্যাক্স	১৫১
ডাইনী বুড়ির ভবিষ্যৎবাণী	ই. এম. ফস্টার	১৫৭
অভিশপ্ত বাড়ি	এ. ই. ডি. স্মিথ	১৬৭
বন্ধ ঘরের আতংক	স্যার ওয়াল্টার স্কট	১৭৫
রহস্যময় ছবি	স্যার গারেট পোটার	১৮৯
অতৃপ্ত আত্মা	এ্যাডগার অ্যালান পো	২০৭
প্রাচীন প্রেতাত্মা	কেথারিন ক্রো	২১৯

পরলোকের হাতছানি

আলফ্রেড হিচকক

আগেই বলে রাখি আমি আপনাদের কাছে কোন ভূতের গল্প বলছি না। ভুত আছে বলে আমি নিজেই যে বিশ্বাস করি না। আমার কথা শুনে মনে করছেন—লোকটা কি বলে! ভূত যে আছে তা বিশ্বাস করে না অথচ ভুতের গল্প বলছে। শুনুন তবে গল্পটা।

বন্দরনগরী লাসস্পেজিয়াতে এই গল্পের শুরু।

বড় অদ্ভুতভাবে কাঠের তৈরী একটি নারীমূর্তি স্থান পায় মিউজিয়ামে।

কাঠের তৈরী এই নারীমূর্তি নাগরের সকলেরই কৌতূহলের বস্তু। এই মূর্তিটিরই নাম এ্যাটলাণ্টা। ইটালীর তৈরী নয় কিন্তু এই এ্যাটলাণ্টা। এই বন্দরে কোন এক জাহাজ একে নিয়ে আসে।

এই মিউজিয়মের কিউরেটর যুবক পল স্মিথ কিন্তু ভালবাসে এই এ্যাটলাণ্টাকে। তাকে ছাড়া যুবকের চলে না—সে যেন তার ধ্যান জ্ঞান। বন্ধুরা তাকে এ নিয়ে ঠাট্টা করে, কিন্তু সরলপ্রাণ স্মিথ-এর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

অনেকে অনেকভাবে লেখার সামগ্রী সংগ্রহ করে কিন্তু আমার সংগ্রহের লক্ষ্যবস্তু মিউজিয়ম। সেখানে আমি সব সময় যেতাম, তাই স্বাভাবিক কারণেই স্মিথ আমার বিশেষ পরিচিত। আমি বিস্মিত ভাবে লক্ষ্য করতাম স্মিথ সেই কাঠের তৈরী সুন্দরীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে —যেন তার চোখের পলক পড়ছে না।

একদিন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, বন্ধু, একাগ্রচিত্তে সব সময় কি দেখেন বলবেন কি? অনেক দিন থেকেই দেখছি, আজ আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না, তাই জিজ্ঞাসা করছি, এর মধ্যে কি পেয়েছেন, এটা একটা কাঠের পুতুল ব্যতিত আর কিছুই নয়। দেখতে খুবই সুন্দরী—তন্বী তরুণী।

মিঃ স্মিথ বললেন, সকলে ভাবে হয় আমি পাগল, আর তা না হলে ...জানেন, আমি সব জানতে পারি। আজ থেকে অনেকদিন আগে যা ঘটেছে তা সব আমার জানা।

আমি অবিশ্বাসের ভাব দেখাই।

মিঃ স্মিথ বললেন, আপনি ভাবছেন, এ আবার কোন্ পাগলের পাল্লায় পড়লাম। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন। শুনুন আমার অতীত কাহিনী।

সে আজ থেকে অনেকদিন পূর্বের কথা। ১৩ই অক্টোবর ১৭৭৪ সাল। সবে বিয়ে করেছি, নবযৌবনা সুন্দরী বউ পেলে একজন যুবকের যে অবস্থা হয়। আনন্দে, খুশিতে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি আর সেই সঙ্গে আমার বউও—নাম তার এ্যাটলাণ্টা।

বিয়ের কয়েক মাস পরেই সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। চলতে চলতে এসে পড়লাম পারস্য উপসাগরের তীরে। সেখানেই ঘটলো মর্মান্তিক ঘটনা। ভগবান বুঝি বেশীদিন সুখ আমার ভাগ্যে লেখে নাই।

সমুদ্রে ঘুরতে ঘুরতে আমরা তখন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। বনপথ দিয়ে হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলাম দুজনে।

এ্যাটলাণ্টা হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো। কিছু বোঝবার আগেই সে পড়ে গেল মাটিতে।

আমার তখন বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ে

দেখি সব শেষ। এ্যাটলাণ্টা চিরজীবনের মত চলে গেছে আমাকে ছেড়ে।

আমি ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলাম। কিন্তু কাঁদলেই তো আর মৃত মানুষ ফিরে আসে না। আমার এ্যাটলাণ্টাও আর ফিরে এল না।

দেশের দিকে রওনা হলাম এ্যাটলাণ্টাকে নিয়ে। মিশরে গিয়ে তার কাঠের মমি তৈরী করে ফিরে আসি এখানে। তারপর আবার জন্ম নিয়ে আমি হয়েছি পল স্মিথ। এইভাবেই নব নব রূপে জন্ম নিয়ে আমার এ্যাটলাণ্টাকে আগলে রাখি। আমি থাকতে পারি না তাকে না দেখে। আমি যে তার সঙ্গে কথা বলি নির্জনে, তার কথা শুনতেও পাই।

আমি ভাবি, তাও কি সম্ভব? তাকি বিশ্বাসযোগ্য, পল স্মিথ যা বললেন?

এলোমেলো এইসব কথা ভাবছি এমন সময় আমারই চোখের সামনে দেখলাম পল স্মিথ আর রক্ত মাংসে গড়া শরীরী মানুষ নেই—সে হয়ে উঠেছে বীভৎস এক অশরীরী। সেই অশরীরী হাসছে। প্রাণ খুলে হাসছে!

কিন্তু একি! সেই এ্যাটলাণ্টার কাঠের মূর্তির ঠোঁটেও দেখা দিয়েছে হাসি। সে হাসছে। দেখতে দেখতে সেই কাঠের মূর্তি এক সুন্দরী নারীর রূপে রূপান্তরিত হয়ে কাঁচের বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে মিঃ স্মিথের অশরীরী-মূর্তিকে জড়িয়ে ধরে উন্মত্ত হাসিতে হেসে উঠল দু'জনে।

প্রেতাত্মার হাতছানি

ব্রামষ্টোকার

মিউনিখ থেকে যখন যাত্রা শুরু করি তখন আকাশের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। চারিদিকে ছেয়ে আছে মিষ্টি ঝকঝকে রোদ। গ্রীষ্মের আমেজ বাতাসে।

হোটেলের মালিকের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সে আমার ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ী পর্যন্ত আসে। সে কামনা করে আমার যাত্রা যাতে শুভ হয়।

ঘোড়ার গাড়ীর দরজার হাতলে হাত রাখে। গাড়ীর গাড়োয়ানের উদ্দেশ্যে বলে, আজকের রাতটা কি রাত তা তো তোমার মনে আছে?

সম্মতি জানায় গাড়োয়ান ঘাড় কাত করে।

হোটেলের মালিক হের্ ডেলব্রুক গাড়োয়ানের উদ্দেশ্যে বলে, কাজেই ঝকঝকে রৌদ্র থাকলেও উত্তরের কনকনে বাতাস এখনও আছে। স্বভাবতঃই, ঝড় উঠতে পারে যে কোন সময়ে।

গাড়োয়ান জার্মান ভাষায় হের্ ডেলব্রুকের আদেশ শিরধার্য্য করে।

একবার নিজের মাথার টুপি ঠিক করে। তীব্র বেগে গাড়ী ছুটিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ী শহরের সীমানার বাইরে আসে। আমি গাড়ী দাঁড় করাতে বলি গাড়োয়ানকে।

গাড়োয়ান গাড়ী থামায়।

আমি গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করি, আচ্ছা বলতো ভাই, আজকের রাতটা কিসের জন্য বিখ্যাত ?

আমার কথা শুনে গাড়ীর গাড়োয়ান নিজের হাত দিয়ে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে। তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে আতঙ্কের ছাপ।

সে সংক্ষেপে বলে, আজকে ভালগার্সিসের রাত।

কথা কটা উচ্চারণ করে গাড়োয়ান একটা বেশ বড় পকেট ঘড়ি বের করে। আমার সঙ্গে কথা বলে যে সময়টুকু নষ্ট হল তা হিসেব করে। আগের চেয়েও বেশী জোরে গাড়ী চালায় সেই সময়টুকু পুষিয়ে নেবার জন্য।

ঘোড়াগুলো পথ চলতে চলতে আকাশের দিকে মুখ তুলে কিসের যেন বিপদের গন্ধ পায়, মাথা নাড়ায় সন্দেহজনকভাবে !

আমি একটু ভয় পাই নির্জ্জন পাণ্ডব বর্জিত রাস্তা দেখে। চারিদিকের রাস্তার ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখি। উঁচু মালভূমি থেকে ঝড়ো বাতাস হুহু করে বইতে শুরু করে।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ এমন একটা রাস্তা আমার নজরে পড়ে যে, যে রাস্তা দিয়ে বহুদিন কেউ যাতায়াত করেনি !

রাস্তাটা উপত্যকায় আঁকাবাঁকা পথ করে গিয়ে মিশেছে গভীর জঙ্গলে !

এই রাস্তার আকর্ষণ এত প্রবল যে, গাড়ীর গাড়োয়ানের বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমি তাকে ডাকি। বলি, এই নূতন রাস্তা দিয়ে যেতে আমার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে।

বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে গাড়োয়ান। ও রাস্তার না যাবার জন্য নানান রকম বাহানা করে।

ওর কথায় আমার কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। এ বিষয়ে আমি নানান রকম প্রশ্ন করতে থাকি।

ভয়ের চিহ্ন প্রকট হয়ে ওঠে গাড়োয়ানের মুখে চোখে।

সে বারবার নিজের বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে। নানানভাবে আমাকে ওপথে না যেতে অনুরোধ করে।

আমি কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা থেকে এক পাও নড়ি না।

গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করি, ওপথে যেতে তোমার এত ভয় ও আপত্তি কেন? তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে ওপথে যেতে বাধ্য করব না। তবে কারণটুকু জেনে রাখা আমার বিশেষ প্রয়োজন।

গাড়োয়ান গাড়ীর আসন থেকে নামে। আমার কথার উত্তর দেয় না।

জার্মান ও ইংরাজী মিশিয়ে শুধু অনুরোধ করে যে, আমি যেন আমার নির্দেশিত পথে না যাই। কারণ, আজকের রাতটা বিপদজনক "ভাল্‌গার্সিসের" রাত। বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে পদে পদে।

গাড়োয়ান কথা বলে ও বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে। ভয়ে সে যেন ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

আমাদের আলোচনার সময় গাড়ীর ঘোড়াগুলো আকাশের দিকে মুখ তোলে। কিসের যেন বিপদের আভাষ পায়। ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ঘোড়াদের আচরণে গাড়োয়ানের মুখখানা সাদা কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকায়। হঠাৎ লাগাম ধরে প্রায় পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে নিয়ে যায় ঘোড়াগুলিকে।

আমি অবাক হই গাড়োয়ানের ব্যবহারে।

গাড়ীর কাছে গিয়ে তার এ জাতীয় আচরণের কারণ জানতে চাই।

গাড়োয়ান নিজের বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে। অল্প দূরে একটা কবরের ওপরে লোহার ক্রুশ চিহ্ন আঙুল দিয়ে দেখায়।

জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় বলে, ঐ ক্রুশের জায়গায় যে শুয়ে আছে, তিনি নিজেই নিজেকে হত্যা করেছেন।

এবার আমি বুঝতে পারি।

অতীতে একটা প্রথা ছিল, যে বা যারা আত্মহত্যা করবে, তাকে চৌরাস্তায় কবর দেওয়া হবে।

এখনও এখানকার অধিবাসীরা সেই প্রথা মেনে আসছে!

যখন আমরা কথাবার্তা বলছি, ঠিক সে সময় অনেক দূর থেকে এক

পাল নেকড়ের হিংস্র আর্তনাদ ভেসে আসে।

সে শব্দে গাড়ীর ঘোড়াগুলো খুবই চঞ্চল হয়ে উঠে। ওদের বাগে আনতে গাড়োয়ানের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

সে বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, এ সময় তো নেকড়েদের বেরুবার সময় নয়!

ঘোড়াগুলো শান্ত হলে আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা শুরু হয়। সূর্যের আলো নিশ্চিহ্ন হয়। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে! পরক্ষণেই মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি মারে।

গাড়োয়ান আকাশের দিকে তাকায়।

দুশ্চিন্তার সঙ্গে বলে, এবার তুষারপাত শুরু হল বলে।

কথা বলতে বলতে গাড়োয়ান পকেট থেকে ঢাউস মার্কা পকেট ঘড়ি বের করে। ঘড়ি দেখে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠে। গাড়ীতে নিজের আসনে গিয়ে বসে। আমাকে গাড়ীতে উঠতে অনুরোধ জানায়।

আমি গাড়ীতে উঠি না। শুধুমাত্র আমার নির্দেশিত পথের সম্বন্ধে ওকে প্রশ্ন করি।

গাড়োয়ান আবার নিজের বুকে ক্রুশ আঁকে। বিড় বিড় করে প্রার্থনা জানায়।

পরে ব'লে, ঐ অঞ্চলটা খুবই বিপদজনক।

সঙ্গে সঙ্গে আমার কৌতূহলী মন মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করি, কোন জায়গার কথা বলছো?

—ওদিকের গ্রামটার কথা।

আমি বেশ স্বস্তির সঙ্গে বলি, তাই বল। তাহলে ঐদিকে একটা গ্রাম আছে?

গাড়োয়ান ব্যস্ততার সঙ্গে বলে, না না, বহু বছর আগে ছিল। অনেক বছর ধরে ওখানে কেউ থাকে না।

তারপরেই গাড়োয়ান জার্মান ও ইংরাজীতে ঐ গ্রামটার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলল।

তবে সব কথা বুঝতে না পারলেও, এটুকু বুঝি যে, বহু বছর আগে ঐ গ্রামে বহু লোক কোন এক অজানা কারণে একই সঙ্গে মারা যায়।

যারা মারা যায়, তাদের নিজেদের ভিটেতে কবর দেওয়া হয়।

তারপরই মাটির নীচে কবরের ভেতর বিভিন্ন রকম শব্দ হতে থাকে।

যারা জীবিত ছিল তারা কবরের ওপরকার মাটি খোঁড়ে। প্রত্যেকটি মৃতদেহ থেকে টাট্‌কা ও ঠোঁটে লাল রঙের আভাষ পায়।

তারপর থেকেই যারা জীবিত ছিল, তারা গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যায়। এ গ্রামটা প্রেতাত্মার কবলে কবলিত হয়ে যায়।

কথা বলা শেষ করে গাড়োয়ানের মুখখানা ভয়ে সাদা কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠে। সে কাঁপতে শুরু করে। ঘামে ঝকঝকে হয়ে উঠে মুখমণ্ডল। চারপাশে ভয়ে ভয়ে তাকায়।

ভয়ে ও প্রায় চীৎকার করে অনুরোধ করে আমাকে গাড়ীতে উঠে আসতে। কেননা, আজকে "ভালগার্সিসের" রাত। যে কোন সময় অশরীরী ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

আমি গাড়োয়ানের কথায় কান দিই না। ইংরেজের রক্ত প্রতিবাদ করে ওঠে।

গাড়োয়ানকে পরিহাসের ছলে বলি, তুমি ভয় পেতে পার, কিন্তু আমি পাইনি। পাবও না।

সুতরাং, গাড়ী নিয়ে ফিরে যাও। আমি তোমাদের "ভাল্‌গার্সিসের" রাতের মোকাবিলা করব।

আমার প্রস্তাবে গাড়োয়ান যেন হাতে স্বর্গ পায়।

সে সময় নষ্ট না করে গাড়ী উল্টোদিকে ঘোরায়। আমাকে ধন্যবাদ জানায়। গাড়ী দ্রুত গতিতে ছোটায় মিউনিখের দিকে।

আমি আমার হাতের লাঠির ওপরে ভয় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি গাড়ীটা চলে যাবার পথের দিকে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গাড়োয়ানকে দেখে মায়া হয়। পায় হাসিও।

তারপর মনে বেশ স্ফূর্তি নিয়ে উপত্যকার সরু পথ দিয়ে গাড়োয়ানের বর্ণিত পথে এগোই।

আমি প্রায় দুঘণ্টা ধরে উপত্যকার নানান দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াই।

কিন্তু জনপ্রাণীর লক্ষণ দেখতে পাই না কোথাও!

পথ চলতে চলতে সামান্য ক্লান্ত হই। একটু বিশ্রামের জন্য চারিদিকে তাকাই।

হঠাৎ চোখে পড়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড়ের পূর্বাভাস। তার আগেই

বেশ ঠাণ্ডা লাগতে শুরু হল।

মনের মত আশ্রয় না পেয়ে শরীরকে গরম করার জন্য আবার চলতে শুরু করি।

পথ চলতে চলতে কখন যে সূর্য্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে তা বুঝতে পারি না। তুষারপাত শুরু হয় সঙ্গে ঝড়ও।

এ সময় একটা আস্তানার কথা বেশী করে মনে পড়ে।

তাই তাড়াতাড়ি কাছের জঙ্গলে প্রবেশ করি।

ক্রমে আকাশ আরও গাঢ় কালো হয়ে উঠলো।

তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামনে তুষারপাত বাড়তে থাকে।

অল্প সময়ের মধ্যে আমার চারপাশে সাদা চকচকে গালিচার মত রাস্তা ঘাট ইত্যাদি সব তুষারে ঢেকে যায়।

এখানেই শেষ নয়।

আরও একটু পরে ঝড়ের বেগ আরও বৃদ্ধি পায়। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ঘন ঘন চমকাচ্ছে।

ফলে নিরুপায় হয়ে ঝড়ের বিরুদ্ধে দৌড়োতে শুরু করি।

বিদ্যুতের তিক্ষ্ন আলোয় দেখতে পাই তুষারে ঢাকা ইউ ও সাইপ্রেস গাছগুলো একে অন্যকে জড়িয়ে আছে!

ছুটতে ছুটতে অতি কষ্টে সেই গাছের ঝোপের নিচে আশ্রয় নিই। নিঃস্তব্ধ অন্ধকারে বাতাসের ভীষণ গর্জন শুনতে থাকি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের তাণ্ডবলীলা অনেকটা কমে। কিন্তু মেঘের গর্জন শুনতে পাই।

মাঝে মধ্যে মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ উঁকি মারে।

চাঁদের আলোয় দেখতে পাই আমি বোধ হয় ইউ ও সাইপ্রেসের জঙ্গলের একপ্রান্তে এসে পড়েছি।

দেখতে দেখতে তুষারপাতও বন্ধ হয়।

আমি আবার এগোতে শুরু করি। রাতের জন্য সামান্য একটু আশ্রয় খুঁজতে থাকি।

বেশ কিছুটা চলার পর গাড়োয়ানের কথামত প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত গ্রামের চারিদিকে ঘুরি। তারই মধ্যে একটা জরাজীর্ণ বাড়ী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি।

মনে বেশ আনন্দ হয়। অন্তত রাত্রিটুকু কাটাবার মত নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে মনের ক্লান্তি অনেকটা কমে আসে। বাড়ীটার দিকে দ্রুত পা চালাই।

বাড়ীটার কাছে এসে দেখি, একটা জরাজীর্ণ প্রাচীর দিয়ে বাড়ীটাকে ঘিরে রেখেছে!

আমি সেই বাড়ীর প্রাচীর ধরে এগোতে থাকি! এক সময় বাড়ীতে ঢোকার প্রবেশ পথ খুঁজে পাই। সে পথে এগোতে থাকি।

সে সময় আকাশের চাঁদকে মেঘে ঢেকে ফেলে। চারিদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে যায়, আমি অন্ধকারের মধ্যে কোন রকমে বাড়ীর কাছে পেঁছিতে চেষ্টা করি।

আবার আকাশে চাঁদের আলো দেখা দেয়।

চাঁদের আলোতে দেখতে পাই যে, আমি একটা প্রাচীন কবরখানার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি! আমার সামনে সুন্দর পাথর দিয়ে যে চাতালটা তৈরী আছে সেটি একটি কবর।

হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আমার মুখ চোখের ওপরে আছড়ে পড়ে। সেই সঙ্গে এক পাল কুকুর গর্জন করে ওঠে।

কিসের আকর্ষণে যেন আমি সেই সুন্দর চাতালটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখি।

এক সময় কবরের ওপরকার মণ্ডপের দ্রিরিস দেশীয় দরজায় জার্মান ভাষায় লেখা আছে, "ষ্টাইরিয়ার গ্রাৎস্-এর কাউণ্টেস ডলিংগেন প্রার্থিত মৃত্যুকে পেয়েছেন ১৮০১ সালে।"

তবে কবরের ওপরে পাথরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া আছে বিরাট লোহার শূল।

শূলটা ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সেখানে জার্মান ভাষায় লেখা আছে, "দ্রুত চলে মৃতেরা!"

কবরখানার অবস্থা দেখে আমার শক্ত মনও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে। ঝিম ঝিম করতে থাকে মাথা। অজ্ঞান হয়ে গেলেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নয়।

এ সময়ে মনে হয়, গাড়ীর গাড়োয়ানের কথা শুনলে হয়ত ভালই হত। তা হলে এত ঝামেলায় পড়তে হত না।

পরক্ষণেই মনে পড়ে হোটেল মালিকের "ভাল্‌গার্সিসের" রাতের কথা।

এখানকার অধিবাসীরা মনে করে "ভাল্‌গার্সিসের রাত্রে কবরখানার প্রত্যেকটি কবর খুলে যায়। সেখান থেকে প্রেতাত্মারা বেরিয়ে আসে। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। নিষ্ঠুর ও বিভৎস আনন্দে মেতে ওঠে।

কথাটা মনে হতে পরক্ষণে আবার মনে হয় দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি শিখেও কুসংস্কার মুক্ত হতে না পারার জন্য নিজেকে ধিক্কার দেওয়া উচিত।

আমি যখন নিজের সমালোচনায় ব্যস্ত, সে সময় একটা হঠাৎ ঘূর্ণী-ঝড়ের সৃষ্টি হয়। ঝড়টা আমার উপর আছড়ে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নীচেকার মাটি কাঁপতে শুরু করে। মনে হয়, কয়েকশো প্রেতাত্মা যেন উন্মাদের মত ছুটে চলেছে!

তুষারপাত শুরু হয়, বড় বড় শিলাখণ্ডও আকাশ থেকে পড়তে শুরু করে।

এই শিলাখণ্ডের আঘাতে গাছের ডালপালা সশব্দে ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

এই বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য একটা সমাধির বিরাট ব্রোঞ্জের দরজার গায়ে এক রকম পা মিশিয়ে দিয়ে নিজেকে শিলাখণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি।

এক সময় সেই দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করি।

কিন্তু দরজাটা আমার ভার রাখতে পারে না। সেটা আস্তে আস্তে খুলে যায়।

ঘরের ভেতরে যে কবর আছে তা বুঝতে আমার অসুবিধে হয় না।

কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চেয়ে যে কোন কবরের পাশে আশ্রয় নেওয়া আমার পক্ষে বেশী নিরাপদ ছিল।

যখনই আমি সেই কবরের ঘরে ঢুকি, ঠিক সে সময় আকাশ চিড়ে একাধিক বিদ্যুৎ চমকায়।

সেই বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পাই যে একটি সুন্দরী যুবতী শবাধারে শুয়ে আছে। তাকে কখনই মৃত বলে মনে করা সম্ভব নয়। তবে তার মুখে টাট্‌কা রক্ত মাখানো!

ঠিক সে সময় কান ফাটানো শব্দ করে বাজ পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন অদৃশ্য থেকে আমাকে ধরে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ব্যাপারটা এতই আকস্মিক, যে ব্যাপারটা বুঝতে আমার বেশ একটু সময় লেগেছিল। তারপর আমার ওপরে যথেষ্ট শিলাখণ্ড পড়তে থাকে।

আমি আমার স্মৃতি শক্তিকে সজীব করতে চেষ্টা করি।

সে সময় আমার বোধ হয় না যে, আমি এখানে একলা আছি। আমি ছাড়া আরও লোক আছে বলে আমার মনে হয়।

সে সময় চোখ ধাঁধিয়ে একটা আলোর শিখা আকাশ থেকে নেমে সমাধির ওপর গাঁথা লোহার শূলটাকে স্পর্শ করল।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের মত সুন্দর পাথরের তৈরী কবরটা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দরী মহিলাকে কবরের ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় দেখা যায়। তার চারদিকে লকলকে আগুন। শিখা যেন মহিলাটিকে পুড়িয়ে ফেলছে।

মহিলাটিও মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকে।

কিন্তু আকাশে গগন বিদারক বজ্রের শব্দে মহিলাটির আর্তনাদ ঢাকা পড়ে যায়।

তারপরেই ক্ষুধার্ত নেকড়ে ও হিংস্র কুকুরের আর্তনাদ শুরু হয়। কবরখানার কবর থেকে প্রেতাত্মারা বেরিয়ে আসে। পায়ে পায়ে আমার দিকে আসতে শুরু করে।

আমি আর নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারি না। এক সময় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ি।

অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে আমার জ্ঞান ফিরে আসে।

প্রথমে আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তবে বেশ ক্লান্ত লাগে।

চেতনা যখন বেশ একটু ভাল করে এল, তখন আমি আমার দুটো পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকি। শত চেষ্টা করেও পা দুটোকে নাড়াতে পারি না।

শুধু পায়ে নয়, সমস্ত দেহেই অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করি। কিন্তু দেহের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আমি নাড়াতে পারি না। শ্বাস প্রশ্বাসে বেশ কষ্ট হতে থাকে।.....

এক সময় আমার মনে হ'ল, একটা বেশ বড় নেকড়ে আমার বুকের

ওপরে বসে আছে! সে তৃপ্তির সঙ্গে আমার গলা তার জিভ দিয়ে চাটছে। তার গরম নিঃশ্বাস আমার দেহে পড়ছে!

আস্তে আস্তে আমার চেতনা আরও ফিরতে থাকে।

আমি শুনতে পাই কে বা কারা যেন ওহে-ওহে বলে কাকে যেন ডাকছে! তারা যে সংখ্যায় একাধিক তা তাদের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়।

নেকড়েটা আমার কাছ থেকে উঠে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড গর্জন করতে শুরু করে। একটা লাল আভা চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

মানুষের কণ্ঠস্বর যতই আমার দিকে তাকাতে শুরু করে, ততই নেকড়ের গর্জন বিভৎস হয়।

মানুষের কণ্ঠস্বর পেয়েও আমি সাড়া দিতে পারি না ভয়ে।

একটু পরেই কয়েকজন ঘোড়ায় চড়ে আমার দিকে আসছে বলে মনে হয়। তাদের হাতে টর্চ আছে। সেই টর্চের আলো ফেলে তারা কাকে যেন খুঁজছে!

কিছু পরেই ঘোড়সওয়াররা কাছাকাছি আসে। তাদের দলপতি আমাকে নেকড়ে মনে করে বন্দুকের নিশানা করে।

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ অন্য ঘোড়সওয়াররা দলপতির হাতে ধাক্কা দেয় ফলে গুলিটা আমার সামান্য ওপর দিয়ে চলে যায়।

পরক্ষণে নেকড়েটাকে সমাধি ক্ষেত্রের দিকে চলে যেতে দেখে আর, একজন ঘোড়সোওয়ার তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে।

একটু পরেই ঘোড়সোওয়াররা আমার কাছে আসে।

তাদের দলপতির নির্দেশে দুএকজন ঘোড়সোওয়ার নেকড়েটার সন্ধানে যায়।

ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে দুজন ঘোড়া থেকে নামে। আমার পাশে বসে। হাত দিয়ে আমার মাথা তোলে। বুকে কান দিয়ে হৃৎপিণ্ড কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করে।

পরক্ষণেই দলপতির উদ্দেশ্যে বলে. লোকটার জীবনী শক্তি এখনও আছে। মরে যায়নি।

সঙ্গে সঙ্গে তারা উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী তরল পানীয় আমার মুখে ঢেলে দেয়।

তার পরেই শরীরে যেন সামান্য শক্তি ফিরে পাই। চারিদিকে তাকাই।

ঘোড়সওয়ার দলে সর্দার সকলকে একত্রিত হবার জন্য হাঁক দেয়।

নেকড়ের খোঁজে যারা গিয়েছিল, তারা কবরের গোলক ধাঁধাঁ পথ দিয়ে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে আসে।

সকলে একত্রিত হলে সর্দার নেকড়েটার কথা জিজ্ঞাসা করে।

সঙ্গে সঙ্গে একজন ঘোড়সওয়ার ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে বলে, না না, নেকড়েটাকে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া, আমাদেরও এক্ষুণি স্থান ত্যাগ করা উচিত। কেননা জায়গাটা সুবিধের নয়। তা ছাড়া, আজকের রাতটার কথা মনে রেখো।

একজন আমাকে দেখিয়ে বলে, ঐ নেকড়েটা এর বুকের ওপরে বসেছিল। ওর গলাটা পরীক্ষা করে দেখ না?

সর্দারটি আমার গলায় টর্চের আলো ফেলে।

বলে, না, না, সেরকম কিছু নেই। গলার চামড়ায় বোধ হয় সে-রকম কোন ক্ষত হয়নি। আর ঐ নেকড়েটা গর্জন না করলে হয়ত এই লোকটিকে আমরা খুঁজেই পেতাম না! ওকে বাঁচানোর কোন প্রশ্নই উঠতো না।

যে ঘোড়সওয়ারটা আমার মাথা তুলে ধরেছিল সে প্রশ্ন করে,নেকড়েটার কি হল? ওকে কি আঘাত করা যায়নি?

লম্বাটে ফ্যাকাশে মুখওলা ঘোড়সওয়ারটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে, এই বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে যে কবর আছে, তারই একটায় ওর আস্তানা।

কাজেই, আর দেরী করা ঠিক হবে না। যত তাড়াতাড়ি এই অভিশপ্ত জায়গা থেকে চলে যেতে পারি, ততই মঙ্গল।

দলের সর্দার আমাকে বসাতে চেষ্টা করে। সঙ্গের লোকদের কি যেন ইশারা করে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরা ধরাধরি করে আমাকে একটা ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল।

যতক্ষণ পর্যন্ত সর্দার সেই ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে না ওঠে, ততক্ষণ অন্যান্যরা ঘোড়ার দুদিক দিয়ে আমাকে ধরে রাখে।

সর্দার এক পায়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে দুহাত দিয়ে বেশ শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরে।

সকলকে এগোবার জন্য আদেশ করে।

সর্দ্দারের আদেশে সকলে নিজের নিজের ঘোড়ায় ওঠে। সামরিক কায়দায় ঘোড়া ছুটায়।

সে সময় শরীরের অবস্থা খুবই কাহিল ছিল।

কাজেই অনেক চেষ্টা করেও মুখ থেকে কোন কথা বের করতে পারি না। অল্প পরেই হয়ত আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

কেননা, আমার যখন ঘুম ভাঙ্গে, তখন আমি দেখি আমিমাটির ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দুপাশে ঘোড়সোয়ারের মধ্যে দুজন দুপাশ থেকে আমাকে ধরে আছে।

চারিদিকে পরিষ্কার সূর্যের আলো চমৎকার এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। দূরে বরফের ওপরে সূর্যের আলো পড়ে যেন আবির রঙের সৃষ্টি করেছে!

ঘোড়সোয়ারদের সর্দ্দার ওরফে সৈনিকদের অফিসার সৈনিকদের বলে প্রকৃত ঘটনা তোমরা কাউকে বলবে না।

একজন সৈনিক ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করে, তা হলে কি বলবো স্যার?

অফিসার ইশারায় সৈনিকটিকে থামায়।

বলে, বলবে, পথে একজন অজ্ঞাত পরিচিত ইংরেজ ভদ্রলোককে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখি। অবশ্য একটা কুকুর তাকে পাহারা দিচ্ছিল।

—ওটা কোন মতেই কুকুর ছিল না। আমি বেশ জোর দিয়ে বলতে পারি যে, ওটা একটা হিংস্র নেকড়ে ছিল।

অফিসারটি এবারও সৈনিকটাকে থামিয়ে দেয়।

বেশ বিরক্তির সঙ্গে বলে, আমি বলছি, ওটা কুকুর ছিল। নেকড়ে নয়।

অন্যান্য সৈনিকরা অফিসারের আদেশ মাথা পেতে নেয়। শুধু মৃদু স্বরে বলে হ্যাঁ কুকুরই।

একজন মাত্র সৈনিক ভীত স্বরে বলে, ইংরেজ ভদ্রলোকের গলায় যে ক্ষতের চিহ্ন আছে, তা কোন মতেই কুকুরের নয় স্যার। ওটা নেকড়ের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।

সৈনিকটির কথায় আমি আমার গলায় হাত দিই।

সঙ্গে সঙ্গে গলায় বেশ যন্ত্রণা অনুভব করি। ক্ষতের কষ্টে চিৎকার করে উঠি।

আমার চিৎকারে সকলে আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়। আমার গলার ক্ষত স্থান দেখার জন্য ব্যস্ত হয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই অফিসারটির গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সকলকে নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়াতে আদেশ করে।

বলে, কুকুর ছাড়া অন্য কথা বললে সকলে আমাদের পরিহাস করবে। আমরা মুখ দেখাতে পারব না।

এবার সকলেই অফিসারটির বক্তব্যকে মেনে নেয়। আমাকে একটা অশ্বারোহী সৈনিকের ঘোড়ায় তুলে দেয়। আমাকে নিয়ে সকলে মিউনিখের শহরের দিকে যেতে থাকে।

শহরের ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ীকে অপেক্ষা করতে দেখে আমি অবাক হই।

সৈন্যরা ধরাধরি করে আমাকে ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে দেয়। আমিও বেশ স্বস্তি পাই।

সৈন্যদের অফিসারটি অন্যান্য সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরে যেতে আদেশ করে। নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে আমার ঘোড়ার গাড়ীর পেছনে আসতে থাকে।

হোটেলের সামনে গাড়ী পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের মালিক হের্‌ডেলব্রুক হন্তদন্ত হয়ে গাড়ীর দিকে ছুটে আসে। আমার জন্য যে সে খুবই চিন্তিত ছিল, তা তার হাবভাব দেখে বোঝা যায়।

এবার অফিসারটি হের্‌ডেলব্রুককে দেখে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে। আমাকে হের্‌ডেলব্রুকের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যেতে চায়।

হের্‌ডেলব্রুক আগে থেকে সৈনিকদের জন্য খাবার দাবারের বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল।

অফিসারটি বিদায় চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের একটি পরিচারিকা হের্‌ডেলব্রুককে সে কথা মনে করিয়ে দেয়।

অফিসারটি কাজের অজুহাতে হের্‌ডেলব্রুকের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারে না।

এবার আমি অতিকষ্টে কৃতজ্ঞতা জানাই অফিসার ও তার সঙ্গী সৈনিকদের প্রতি!

অফিসারটি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের ব্যারাকের দিকে ঘোড়া

ছোটায়।

হোটেলের মালিক নিজের লোকজনদের সাহায্যে অতি যত্নে আমাকে হোটেলের ভেতরে নিয়ে যায়। আমি একটু সুস্থ বোধ করি।

মনের কৌতুহলকে আর চেপে রাখতে পারি না।

হের্ ডেলব্রুককে একলা পেয়ে বলি, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না যে, সৈন্যেরা হঠাৎ আমাকে খুঁজতে বেরুলোই বা কেন? আর আমাকে সেই পরিত্যক্ত গ্রামের কবরখানার পাশ থেকে এত ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারই বা করল কেন?

আমি পাঠিয়েছিলাম ওদের। উত্তর দেয় হের্ ডেলব্রুক।

আপনিই বা জানলেন কি করে যে, আমি বিপদে পড়েছি!

প্রথমে বুঝি যখন, আপনার ঘোড়াগাড়ীর গাড়োয়ান ভাঙ্গা গাড়ীকোন মতে এখানে নিয়ে আসে।

গাড়ীর এ অবস্থা হওয়ার কারণ হল, গাড়ীর ঘোড়াগুলো হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে গাড়ীর বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। গাড়ীটা হঠাৎ কাত হয়ে পড়ে। গাড়ীটা প্রায় ভেঙ্গে যায়।

সৈন্যবাহিনী নিশ্চয়ই পাঠানো সম্ভব হয় না সামান্য এ কারণের জন্য?

আপনি ধরেছেন ঠিকই। তবে গাড়ীর গাড়োয়ান আসার আগেই যে ভদ্রলোকের অতিথি হবার জন্য আপনি যাচ্ছিলেন, তিনি একটা চিঠি আমাকে পাঠান। কথা বলতে বলতে হের্ ডেলব্রুক পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে। আমার দিকে এগিয়ে দেয় চিঠিটা। বলে পড়ুন চিঠিটা।

আমি চিঠিটা খুলি। লেখা আছে "একজন ইংরেজ ভ্রমণবিলাসী আমার আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য আমার কাছে আসছেন। আমার বিশেষ প্রয়োজন সেই ভদ্রলোককে। ভদ্রলোকের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার দায়দায়িত্ব আপনাকে দিলাম। কেননা, অন্ধকার রাত্রে তুষারপাত, নেকড়েদের আক্রমণ ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই জানাই, ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে যদি সামান্যতম বিপদের কথা মনে পড়ে তা হলে কোন মতেই সময় নষ্ট করবেন না। সবরকম চেষ্টা করবেন তাকে বিপদমুক্ত করার জন্য। এ বিষয়ে আপনার উৎসাহ ও

প্রচেষ্টা আপনাকে লাভবান করবে।—ড্রাকুলা।"

চিঠিটা পড়ার পর আমি আর কথা বলতে পারি না। আমার চারিদিকে যেন সব কিছু বন বন করে ঘুরছে।

হোটেলের পরিচারিকা যদি ঠিক সময়ে ছুটে এসে আমাকে না ধরত, তা হলে আমি হয়ত নিজের ভারসাম্য হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়তাম।

আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন কোন অদৃশ্য শক্তির হাতের মুঠোয় চলে গেছি। এই চিন্তায় আমি দিকহারা হয়ে পড়ি। সব ঘটনাই আমার কাছে এক দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়!

---

www.deshkal.com

এড্‌গ্যানএল্যান পো

আমার ছোটবেলাকার বন্ধু রোডেরিক আসার। বহুদিন আমার দেখাসাক্ষাৎ নেই ওর সঙ্গে। ওর একটা চিঠি পেয়েছি কিছুদিন আগে চিঠিটা শুধু অনুরোধে ভরা। রোডেরিক লিখেছে ও ভীষণ অসুস্থ। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে মানসিক ও শারীরিক রোগে। যার জন্যে ও আমাকে বারবার অনুরোধ করেছে ওর বাড়িতে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ থাকবার জন্যে। আর আমি গেলে নাকি ওর শারীরিক ও মানসিক দুটো রোগই খানিকটা উপশম হবে। তাছাড়া আরও লিখেছে আমি গেলে ওর মন ভাল হয়ে যাবে। ওর চিঠিটা পড়ে আমি আমার বন্ধুর অনুরোধ না রেখে পারলাম না। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করলাম যাবার জন্যে।

আমি রওনা হলাম। সেদিনটা ছিল শরৎকালের একটা ক্লান্তিকর, নিস্তেজ আবহাওয়ার দিন। চারিদিক সব চুপচাপ, আকাশ থেকে যেন নীচের দিকে নেমে আসতে চাইছে শান্তশিষ্ট, মেঘগুলো। এইরকম একটা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমি ঘোড়ার পিঠে চেপে গ্রামের নির্জন

পায়ে-চলা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম। যেতে যেতে রাত্রির অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হতে আরম্ভ করলো। রোডেরিক আসারের বাড়িটা আমার গন্তব্যস্থল ছিল। আমার বন্ধুর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনটা দুঃখে ভরে উঠল বেশ খানিকটা যাবার পর।

বাড়িটার চারপাশের জায়গাগুলো ভালভাবে দেখতে লাগলাম যেতে যেতে। দেখলাম দেয়ালগুলো একেবারে বিবর্ণ, ফ্যাকাশে আর জানালাগুলোও ফাঁকা ফাঁকা মলিন বর্ণ। তাছাড়া দেখলাম নলখাগড়ার জঙ্গল আর কিছু মৃত গাছের গুঁড়ি। মনের মধ্যে অদ্ভুত রকমের একটা অনুভূতি এলো। মনে হলো পৃথিবীর অন্য কোন জায়গার সঙ্গে এই জায়গার কোন তুলনা করা যায় না। আমি আমার মনের থেকে এই সব আজেবাজে চিন্তাগুলি ঝেড়ে ফেলে ভাবতে লাগলাম হঠাৎ আমি কেন এই সব ভাবছি আসারের বাড়িটার সম্পর্কে। তবে মনে হলো কোন অলৌকিক শক্তি আমার মনটাকে এইভাবে আচ্ছন্ন করে তুলছে। আমার মনটা ছেয়ে গেল একটা আবছা কল্পনায়! এত ভেবেও এই রহস্যের কোন সমাধান করতে পারলাম না! আমি এগোতে লাগলাম নানান কথা ভাবতে ভাবতে। হঠাৎ বাড়িটার সামনে গিয়ে কালচে মত যে খালটা বয়ে গেছে দেখতে পেলাম। খালটার সামনে এসে ঘোড়াটাকে থামালাম। খালের জলের দিকে তাকালাম। জলের নীচে ফ্যাকাশে নলখাগড়াগুলো আর মৃত গাছের গুঁড়িগুলো চোখে পড়লো। আরও স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম জানালাগুলোকে। কেমন যেন উলটে রয়েছে। একটা রোমাঞ্চকর। শিহরণ খেলে গেল আমার সারা শরীর মন জুড়ে।

বিষণ্ণ নির্জন ভূতুড়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনটা কেমন কেঁপে উঠল। সাথে সাথে রোডেরিকের মুখটা মনের মধ্যে ভেসে উঠল। সত্যি কথা বলতে কি আমি আমার বন্ধুর সম্পর্কে খুব কমই জানি। কারণ ও খুব রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে উঁচু দরের কাজকর্মের জন্যে বিখ্যাত। ওদের কাজকর্ম অনেকেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে! আমি ওদের বংশের একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি তা হলো রোডেরিকের বংশে লোকসংখ্যা একদমই বাড়েনি। যার ফলে ওদের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে। আমি একদৃষ্টে খালটার দিকে তাকিয়ে থেকে এইসব কথাগুলো ভাবছিলাম। সেই সঙ্গে আমার ভেতরের সেই অলৌকিক অনুভূতিটা টের পাচ্ছিলাম।

মনে ভাবলাম ছোটদের মত আমার মনটাকেও কুসংস্কারে গ্রাস করে ফেলছে।

মনের অবস্থা এমন হলে মানুষের যেমনটি হয় ঠিক তেমনি আমার গা ছম ছম করতে লাগলো। টান টান হয়ে উঠল স্নায়ুগুলো। ক্রমশ ভয়ে আতংকে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। জোর করে খালের থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে সোজাসুজি বাড়িটার দিকে চোখ রাখলাম। কিন্তু কিছুতেই মনটা স্থির করতে পারলাম না। একটা ভয়ংকর ভাবনা আমার মনটাকে ক্রমশ অসুস্থ করে তুলতে লাগল। আমি বাড়িটা ও তার চারপাশটা ঘিরে নানানরকম কল্পনা করতে লাগলাম। আমার দেখা পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে এই জায়গার কোথায়ও কোন মিল খুঁজে পেলাম না। মনে হতে লাগলো গাছের গুঁড়ি ফ্যাকাশে দেওয়াল মনের যেন এই রহস্যময় খালটার থেকে উঠে আসছে। ছড়াতে লাগলো মনের কল্পনাগুলো ধীরে ধীরে ডালপালা জীবাণুর মতো—

আমার মনের সমস্ত চিন্তাভাবনাগুলোকে জোর করে চুপ করিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলাম বাড়িটাকে। এইবার আমার নিখুঁতভাবে সমস্তকিছু নজরে পড়লো। বাড়িটা একেবারে প্রাচীন আমলের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবদিক থেকে। রঙ চটে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গোটা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। আসলে বাড়িটার কি রং ছিল তাও বোঝা যাচ্ছে না। বাড়ীর বাইরেটা বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। উঁচু ছাদের কোণ থেকে অনেক গুলো মাকড়সার জাল ঝুলে আছে। এত পুরনো হলে কি হবে বাড়িটা একেবারে ধ্বংসের স্তূপে পেঁছায়নি। আমি বিস্মিত ভাবে দেখলাম এত প্রাচীন হয়েও বাড়িটা ঠিক মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কোন অংশই এখনও ছেড়ে পড়ে নি।

নিখুঁতভাবে সমস্ত কিছু দেখতে দেখতে আমি বাড়িটার একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাড়িটার ভেতর থেকে লোক বেরিয়ে এসে আমার ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল। মনে হলো লোকটা বাড়ির চাকর তারপর আমি হাঁটতে হাঁটতে কড়িডোরে এসে পেঁছলাম। খিলান ঘেরা কড়িডোরটা দেখতে ভারী অদ্ভুত। চাকরটা এসে আমাকে নিয়ে যেতে লাগলো রাস্তা দেখিয়ে। জায়গাটা ভারী অন্ধকার আর যাবার রাস্তাটাও কেমন আঁকাবাঁকা। আমাকে নিয়ে চলল লোকটা ওর মালিকের ষ্টুডিওর দিকে। আমি শুধু

ওকে অনুসরণ করে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে আমার সেই আগের ভৌতিক অনুভূতিটা মনের মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠল। যা কিছু দেখতে পেলাম সবই আমার চোখে অদ্ভুত মনে হতে লাগলো। আশেপাশে যা দেখলাম সবই আমার অচেনা-অজানা মনে হলো। সিঁড়ির মুখে রোডেরিকের পরিবারের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভদ্রলোক আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন তারপর আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। আমার শরীরে লাগলো ওঁর মৃদু স্পর্শ। এইবার চাকরটা দরজা খুলে আমার বন্ধু রোডারিক আসারের কাছে নিয়ে গেল।

প্রথম যে ঘরটা দেখলাম সেই ঘরটা বেশ উঁচু আর বড় বড় জানালা-গুলো সব লম্বাটে আর সরু, জানালাগুলো কালো রংয়ের ওক কাঠের তৈরী, মেঝে থেকে জানালাগুলো এত উঁচুতে ছিল যে ছোঁয়া যায় না। লাল আলোর একটা মৃদু রেখা জানালাটার জাফরি ভেদ করে ঘরের মধ্যে ঢোকায় পড়ার ঘরের সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। খুব সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে আমি ঘরটার সবকিছু দেখতে লাগলাম। দেওয়াল-গুলোতে কালো রংয়ের ঝালর ঝোলানো, ঘরে পুরনো ভাঙ্গাচোরা আসবাবপত্র ভর্তি। চারদিকে অনেক বইপত্র ও বাদ্যযন্ত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইসব দিকে কারও নজর আছে বলে আমার মনে হলো না। তাছাড়া ঘরের সমস্ত পরিবেশটাও কেমন যেন বিষণ্ণতায়, মলিনতায় পরিপূর্ণ ছিল।

ঘরের মধ্যে একটা সোফার উপর রোডেরিক লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে। আমাকে দেখেই ও সোফা থেকে উঠে বসল ও মৃদু হেসে আমাকে অভিনন্দন জানালো। আমি ওকে দেখে বুঝলাম আমাকে দেখে ও সত্যিই খুব খুশী হয়েছে আর মনে হলো সত্যিই রোডেরিক আমাকে খুব ভালবাসে। আমরা দুই বন্ধুতে বসে কথা বলতে আরম্ভ করলাম। কথা বলতে বলতে ও যখন থেমে যাচ্ছিল তখন আমি কিছুটা ভয় আর কিছুটা সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম মানুষ কি করে এই রকম বদলে যেতে পারে? রোডেরিক আমার সেই ছোট-বেলাকার বন্ধু। যার সঙ্গে আজকের বিছানায় শোয়া রোডেরিককে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। যদিও মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম ওর মুখটায়। ওর বড় বড় চোখ দুটো পরিষ্কার আর চকচকে—

ঠোঁটদুটো খুবই পাতলা আর ফ্যাকাশে। নাকটা বেশ লম্বাটে—কিন্তু নাকের ডগাটা খানিকটা বাঁকা, চিবুকটার গড়ন খুব সুন্দর—মাথার চুলগুলো খুব নরম কিন্তু মুখের গড়ন এক থাকলে কি হবে? ওর মুখের হাব-ভাব ও কথা বলার ধরন এত বদলে গেছে যে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে—আমি ঠিক আমার বন্ধু রোডেরিকের সঙ্গে কথা বলছি কি? ওর এই অচেনা ভাবভঙ্গী, কথাবার্তা সব আমাকে অবাক করে দিচ্ছিল। মনে মনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম, আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই বিছানায় শুয়ে থাকা রোডেরিকের মিল খুঁজে আমি পেলাম না!

ওর কাছে কোন কিছু প্রকাশ করলাম না, মনে মনে ভয় পেলেও। আমরা দুজনে কথাবার্তা বলে যেতে লাগলাম, রোডেরিক আমাকে ডেকে আনার কারণগুলো খুলে বলতে লাগলো এবং আরও বললো ও আমার কাছ থেকে কিরকম সাহায্য চায়! তারপর আস্তে আস্তে ও বলতে শুরু করল ওর শারীরিক ও মানসিক রোগের প্রধান কারণগুলো পারিবারিক। ও প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে এই রোগটা কাটিয়ে উঠবার জন্য। কিছুক্ষণ কথা বলার পর রোডেরিক ক্লান্ত হয়ে চুপ করে থাকল, তারপর বলল—এই ঘটনাগুলো খুব শীঘ্রই ঘটে যাবে। আমি ওর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলাম ও মানসিকভাবে খুবই অসুস্থ। ওর কাছে সব কিছুই বিষাদ লাগে। কোন কিছুতে ওর মন নেই। কোন খাবার পছন্দও করে না, এমন কি কোন ফুলের গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতেও পারে না, চোখে আলো পড়লে ক্ষেপে যায়। পোশাকের প্রতিও ওর কোন নজর নেই। শুধু এক ধরনের পোশাক ছাড়া কিছুই পরতে ভালবাসে না। শুধু অদ্ভুত অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে ভালবাসে। একমনে ও এই বিচিত্র ধরনের শব্দ শুনতে ভালবাসতো।

রোডেরিক আবার বলে চললো—জান হয়তো আমি শীঘ্রই মারা যাব, আমার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোর কথা ভেবে ভেবেই আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি। আমি সব সময় একটা আতংকের মধ্যে থাকি কখন যে সেই ঘটনাটা আমার জীবনে ঘটে যায়। আর ঠিক তখনই আমি মরে যাব। এইটাই আমার সবচেয়ে ভয়ংকর আতংক। ও থামলো একটানা কথাগুলো বলে। আমি বুঝলাম এইটাই ওর

মানসিক অসুস্থতার মূল কারণ! রোডেরিকের মনটা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এই বাড়িতে থেকে। যার ফলে ওর মানসিক অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। আর এই মানসিক অসুস্থতার থেকেই ওর শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। ও ভীষণ একা এই বাড়িতে। ওর আপনজন বলতে ওর একমাত্র বোন। যাকে রোডেরিক ভীষণ ভালবাসে। আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন ওর বোন ম্যাডলিন আমাকে না দেখেই চলে গেল। আবার কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এলো। ওর দিকে তাকাতেই আমার মধ্যে একটা অদ্ভূত অনুভূতি সারা মনটায় ছেয়ে গেল। ম্যাডলিন বেশী-ক্ষণ দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি করে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি একটু অবাক হয়েই রোডেরিকের দিকে তাকালাম। দেখলাম ও ওর রুগ্ন হাতটা দিয়ে মুখটা ঢেকে রেখেছে আর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ওর চোখের জল পড়ছে। ওর শীর্ণ হাতের আঙ্গুলগুলো ও চোখের জল দেখে মনটা আমার কষ্টে ভরে উঠল।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল এই ভূতুড়ে বাড়িটায়। আমি কিন্তু কখনো ওর বোনকে নিয়ে কোন কথা বলতাম না। আমি সবচেয়ে বেশী ব্যস্ত ছিলাম আমার বন্ধুকে নিয়ে! ওর মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা কমানোর দিকেই আমার লক্ষ্য ছিল। আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি, ছবি এঁকেছি, গীটার বাজিয়েছি। খুবই গভীর বন্ধুত্ব ছিল আমাদের মধ্যে। রোডেরিক ছবি, গান, লেখাপড়া কোনটাই বাদ দেয় নি। কিন্তু এত গভীর বন্ধুত্ব থাকলে কি হবে আমি কখনো রোডেরিকের মনের ভিতর ঢুকতে পারি নি। ওকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তাছাড়া ওর পড়াশুনার আসল উদ্দেশ্যটা যে কি তা বুঝতে পারতাম না। সবচেয়ে বড় কথা হলো কেন আমাকে ও ডেকেছে এবং কি কাজের জন্যে—তাও আমার কাছে পরিষ্কার হলো না। ওর বাজনা বাজানোর হাতটাও ছিল খুব মিষ্টি। তাছাড়া ও ছবি আঁকতো দারুণ! কিন্তু ওর আঁকা সমস্ত ছবিগুলোতে একটা দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার অনুভূতি ফুটে উঠত। ছবিগুলো দেখলেই আমার মনটা কষ্টে ভরে উঠত। ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না আসল ব্যাপারটা কি! কিন্তু মজার কথা হলো রোডেরিকের আঁকা ছবিগুলো আমাকে ভীষণভাবে কাছে টানতো।

একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটলো। রোডেরিকের প্রিয় বোন

ম্যাডলিন মারা গেল। শোকের ছায়া নেমে এল সারাবাড়ি জুড়ে। রোডেরিক শোকে, দুঃখে আরও ভেঙ্গে পড়লো। ও আমাকে ওর মনের অদ্ভুত একটা ইচ্ছের কথা বলল। ওর ইচ্ছে ম্যাডলিনের মৃতদেহটা ওদের বাড়ির দেওয়ালের ভল্টে দিন পনেরোর জন্যে রেখে দেওয়া হোক। আর এই ভল্ট বাড়ির মূল দেওয়ালের মধ্যেই ছিল। আমি রোডেরিকের ইচ্ছামতোই সাহায্য করলাম। ম্যাডলিনের দেহটা কফিনে রাখা হলো। তারপর আমরা দুজনে মিলে ওটাকে নিয়ে ভল্টের সামনে এলাম। দেখলাম দেওয়ালের ভল্টটা আকারে বেশ ছোট, ঘরের ভেতরটা স্যাঁত-স্যাঁতে, একদম আলো নেই, এই ভল্টটা ছিল আমার শোবার ঘরের ঠিক নীচে। ঘরটা দেখেই বোঝা গেল পুরনো আমলে এই ঘরটা ব্যবহার হতো এবং এই ঘরটায় দাহ্য পদার্থও রাখা হতো। ভল্টের ভিতরের সমস্ত জায়গা জুড়ে লম্বা লম্বা লোহার দরজা লাগানো ছিল। আমরা কফিন রাখার জায়গাটায় রেখে দিলাম। রাখার সময় কফিনের ঢাকনাটা সামান্য একটু সরিয়ে দিলাম। আমি ভাল করে দেখলাম ম্যাডলিনের মৃতদেহটা। মনে হলো রোডেরিকের সঙ্গে ওর বোনের মুখটার খুব মিল রয়েছে।

আমি দেখলাম আমার বন্ধু বোনের দিকে তাকিয়ে আপনমনে কি সব বিড়বিড় করে বলতে লাগলো। ম্যাডলিনের বোঁজা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে খুব কষ্ট হচ্ছিল। পরিপূর্ণ বয়সে ম্যাডলিন মারা গেছে ওর ঠোঁটে রহস্যময় হাসির ছোঁয়া লেগেছিল যা আমার কাছে খুব ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। তাই ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না বেশীক্ষণ। ঢাকনাটা সরিয়ে আমরা কফিনটা ঢেকে দিলাম তারপর ভল্টে রেখে লোহার দরজাটা বন্ধ করে আমরা দুজনে ফিরে এলাম!

এদিকে আমার বন্ধুর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যেতে লাগলো। লক্ষ্য করলাম ওর স্বাভাবিক আচরণগুলো সব কেমন গোলমেলে হয়ে গেছে। কোনদিকে খেয়াল নেই। কাজকর্মে একদম মনযোগ নেই। ঘুরে বেড়ায় উদ্দেশ্যহীনভাবে। চোখে মুখে সেই আগের মতো উজ্জ্বলতা নেই। কণ্ঠস্বর কেমন অস্বাভাবিক মনে হতে লাগলো। ওর গলার আওয়াজে একটা কাঁপুনিভাব ছিল। আমার মনে হতো ও ভিতরে ভিতরে কারও সঙ্গে প্রতিমুহূর্তই যুদ্ধ করে চলেছে। ওকে দেখে আমারই মনে হতো ওর অশিরীরি দেহটা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি মনে মনে ভীষণ ভীত হয়ে উঠলাম। যদি ওর মত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে যাই! আমি তখন কি করবো? মনে মনে সত্যি আমি আতঙ্ক গ্রস্থ হয়ে পড়লাম। আর রোডেরিকের জন্য মনটা কষ্টে ভরে উঠল। আস্তে আস্তে আমিও কেমন যেন হয়ে গেলাম।

ম্যাডলিনকে কবর দেবার পর দিন সাতেক কেটে গেল নিশ্চিন্তেই। ঠিক আটদিনের মাথায় আমি ভীষণ ভয় পেলাম। সেদিন অনেক রাত্রি করেই বিছানায় শুতে গেলাম, তার সাথে মনের ভয়টা কেমন চেপে বসলো। এদিকে রাত ক্রমশ বেড়ে চললো। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ঘুমাবার চেষ্টা করেও ঘুমতে পারছি না তাতে মনের ভয়টা ক্রমশ বাড়তেই লাগলো। যতসব আজে-বাজে ভাবনা-চিন্তা আমাকে গ্রাস করে ফেলতে লাগলো। যত মনে সাহস আনবার চেষ্টা করতে লাগলাম ততই অজানা ভয়টা আমাকে চেপে ধরতে লাগলো। ভাবলাম এই পুরনো বাড়ি, পুরনো আসবাবপত্রের জন্যই হয়তো আমার মনটা এত দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেখলাম মৃদু হাওয়াতে কালো আর ছেঁড়া ঝালরগুলো কেমন অদ্ভুতভাবে দুলছে। তার সাথে আমার মনে হতে লাগলো সামনের দেয়ালগুলো এগোচ্ছে আর পেছোচ্ছে।

মনের ভয়টা কাটাবার জন্যে বিছানার চাদর-বালিশগুলোকে এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। একটা বালিশে আরাম করে মাথাটা রাখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই আজেবাজে ভাবনা-চিন্তা-গুলোকে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করলাম। কিছুই দেখতে পেলাম না ঘন অন্ধকার ছাড়া। ঠিক সেই সময় অদ্ভূত একটা শব্দ শুনতে পেলাম। আমি মরিয়া হয়ে তা শোনার চেষ্টা করলাম। শব্দটা মাঝে মাঝে থামছে আবার হচ্ছে। এইবার আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। নিজের পোশাকগুলো খুলে ছুঁড়ে ফেললাম। আস্তে আস্তে ঘরে পায়চারী করতে লাগলাম। হঠাৎ থমকে গেলাম। সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ভাবলাম নিশ্চয় রোডেরিক উঠে আসছে। আমার কথাই ঠিক হলো। রোডেরিক একটা আলো হাতে আমার ঘরে ঢুকলো। ওর দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পেলাম। কি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওর মুখটা, ওর কথাবার্তা হাবভাব সবই অস্বাভাবিক মনে হতে লাগলো। তবুও

আমি মনে মনে খুশিই হলাম। মনে হলো রোডেরিক এসে আমাকে বাঁচিয়ে দিল। ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'ওটা দেখ নি তুমি'?

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তাই কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ রইলাম। রোডেরিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে উঠল —তাহলে সত্যিই তুমি ওটা দেখ নি? ঠিক আছে এখনই দেখতে পাবে। কথাটা শেষ করেই রোডেরিক হাতের আলোটা নিয়ে গরাদহীন জানালাটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর আলোটা বাইরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বাইরে তখন প্রচণ্ড বেগে ঝড় বয়ে চলেছে। তাই এক নিমেষে আলোটা ঝড়ের নৃত্যে হারিয়ে গেল। তার সাথে খোলা জানালা দিয়ে দমকা হাওয়া এসে আমাদের ছুঁয়ে যেতে লাগলো। এই প্রচণ্ড ঝড়ের রাতটা আমার কাছে কিন্তু বেশ মনোরম মনে হচ্ছিল। কারণ এই রাতের সঙ্গে মিশে ছিল আমার ভয় আর রোমাঞ্চ। আমি বাইরেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখলাম ঘন কালো মেঘেরা নীচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে নীচু চাঁদটা। একটাও তারা দেখতে পেলাম না আকাশে। বিদ্যুৎ চমকানোও চোখে পড়লো না। কিন্তু একটা অদ্ভুত আলো মেশানো ধোঁয়া ঘূর্ণি ঝড়ের মতো খেলে বেড়াতে লাগলো। মনে হলো হঠাৎ এক ধরনের গ্যাস সমস্ত বাড়িটাকে ছেয়ে ফেলেছে। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। রোডেরিকের দিকে তাকিয়ে আতংকিত গলায় বললাম, আর দেখতে হবে না, চল। আমি প্রায় ওকে জোর করেই জানালা থেকে সরিয়ে এনে ঘরের চেয়ারটায় বসিয়ে দিলাম আর বললাম ওটা তেমন কিছুই নয় রোডেরিক। মনে হয় কোন প্রাকৃতিক ব্যাপার, তার থেকে বরং জানালাটা বন্ধ করে দিই। এই ঠাণ্ডা হাওয়া তোমার শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এইসব ছেড়ে চল তোমাকে একটা বই পড়ে শোনাই; তোমার যে বইটা সবচেয়ে ভাল লাগে সেইটাই পড়ে শোনাই। আশা করি তোমার খুব ভাল লাগবে বইটা। আর এই অন্ধকার রাতটাও কেটে যাবে।

আমার কথায় রাজী হয়ে গেল রোডেরিক। ও রাজী হওয়াতে আমি খুব খুশি হলাম। আমি বইটা পড়তে শুরু করলাম। বইটির নাম ছিল 'পাগলের কাহিনী'। স্যারল্যান্সটা ফ্যানিং বইটার লেখক ছিলেন। আমি জানতাম আমার বন্ধুর এই বইটা খুবই প্রিয় বই। পড়তে পড়তে কাহিনীর

একটা পরিচিত জায়গায় এসে পড়েছি নায়ক এথেলরেড্ এক সন্ন্যাসীর বাসস্থানে যাবার জন্যে অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে জোর করে সেখানে ঢুকেছিল। বইতে লেখাটা ঠিক এমন ছিল। খুব তাড়াতাড়ি এথেলরেড্ দস্তানা লাগানো হাতে দরজার কাঠটা ধরলো তারপর সজোরে টান দিলো। সেটাকে ভেঙ্গে একেবারে তছনছ করে দিতে লাগলো। সেই কাঠ ভাঙার শব্দ সারা বন জঙ্গল জুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

এই জায়গাটা পড়েই আমি চুপ করে গেলাম। মনে হলো এই বাড়িটার কোন দূরের এক জায়গা থেকে এই রকম ভাঙ্গাচোরা শব্দ ভেসে আসছে। লেখকের বইয়ের বর্ণনার সাথে হুবহু মিল আছে। প্রচণ্ড ঝড়, বাইরে তার সাথে জানলার কাঁচের ঝনঝন শব্দ, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, আমি তবুও বইটা পড়ে যেতে লাগলাম। এইভাবে এথেলরেড দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। সেখানে সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল না, তার বদলে দেখলে একটা ভয়ঙ্কর ড্রাগন। জিভ আগুনের মত সকলকে রুপোর তৈরী মেঝেওয়ালা একটা সোনার প্রাসাদকে পাহারা দিচ্ছে। আর ঠিক প্রাসাদের ওপরের দেওয়ালে একটা চকচকে তামার ফলক ঝুলছে এবং তাতে কবিতার ছন্দে লেখা আছে "এখানে একমাত্র বীরেরাই ঢুকতে পারে —আর কোন বীর যদি ড্রাগনকে মেরে ফেলতে পারে তাহলে এই ফলকটা সে জয় করতে পারবে।"

এইবার এথেলরেড ক্রুদ্ধ চোখে ড্রাগনটার দিকে তাকালো। ও হাতের গদাটা ওপরে তুলে ড্রাগনটার মাথায় সজোরে আঘাত করলো। আঘাতের চোটে ড্রাগনটা বিকট চীৎকার করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ড্রাগনের ভয়ঙ্কর চীৎকার এথেলরেড সহ্য করতে না পেরে দুই হাতে কান দুটো চেপে ধরলো। এই ধরনের বীভৎস চীৎকার ও আগে কখনো শোনে নি। শেষে ড্রাগনটা মারা গেল!

এতখানি পড়ে আমাকে হঠাৎ থেমে পড়তে হলো। আমি ভীষণভাবে অবাক হয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম বাড়ির কোন দূরের জায়গা থেকে— একটা মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ শব্দ কানে ভেসে আসতে লাগলো আর তার সাথে বিকট একটা চীৎকার। ঠিক গল্পের ড্রাগনের মতো সেই চীৎকারটা এইবার আমি সত্যিই মনে মনে ভয় পেতে আরম্ভ করলাম। আমি রোডেরিকের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম ও কিছু বুঝছে কিনা

কোন শব্দ শুনছ কি না। অবশ্য ওর হাবভাব সেই আগের মতোই মনে হচ্ছিল। চেয়ারটায় এমনভাবে বসেছিল যে আমি ওকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছিলাম না! কারণ ওর মুখটা দরজার দিকে ফেরানো ছিল। তবুও দেখলাম ওর ঠোঁটদুটো অসম্ভবভাবে কাঁপছে আর বিড়বিড় করে কি সব যেন বলে চলেছে। মাথাটা একেবারে বুকের কাছে নামিয়ে রেখেছে, চোখ দুটো খোলাই ছিল। ওর দেহের নাড়াচড়া দেখে বুঝতে পারলাম রোডেরিক একদম ঘুমায় নি। জেগেই রয়েছে কিন্তু ওকে আমার কাছে খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। আমি এইসব কিছু লক্ষ্য করে আবার পড়তে শুরু করলাম—

এইভাবে এথেলরয়েড সেই ড্রাগনটাকে শেষ করে জয়ের আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল, ও এই বীভৎস জন্তুটার মৃতদেহ সরিয়ে নিজের যাবার রাস্তা করে নিল। তারপর প্রাসাদের মধ্যে রুপোর মেঝেতে গেল, ওখানেই ঝুলানো রয়েছে তামার ফলকটা ঃ ও যেই তামার ফলকাটা নামাতে গেল ঠিক তখনই ওটা মেঝেতে পড়ে গেল। তার সাথে প্রচণ্ড একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হলো।

এইখানেও আমাকে থামতে হলো। শুনতে পেলাম দূরে কোথাও এমনি একটি তামার ফলক মাটিতে পরে একটা বিকট শব্দের সৃষ্টি করলো। আমি ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলাম, মুখে কোনো কথা সরছিল না। ভয়ে আতংকে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার বন্ধু রোডেরিক আসারের কোন পরিবর্তন দেখলাম না। আমি ছুটে গেলাম ওর চেয়ারটার দিকে। দেখলাম রোডেরিকের মুখটা পাথরের মতো কঠিন, পলকহীন চোখদুটোয় কোন ভাষা নেই, স্থির হয়ে রয়েছে। ওর সমস্ত শরীরটা একটু কেঁপে উঠল, আমি ওর কাঁধে একটা হাত রাখতেই অসুস্থ দেহে মৃদু হেসে মাতালের মতো জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে বলতে লাগলো—শোননি? আমি শুনেছি কিন্তু। শুধু আজকে নয়—। অনেক মিনিট, অনেক ঘণ্টা, অনেক দিন ধরে আমি শুনে আসছি, কিন্তু আমি কিছুই করতে পারিনি। মোদ্দা কথা হলো আমার সাহসে কুলোয়নি, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। তাছাড়া শোন, আমি আমার বোন ম্যাডলিনের কান্না বেশ কিছুদিন শুনেছি কিন্তু সাহস করে বলতে পারিনি। কিন্তু আজ যখন তুমি

পড়তে আরম্ভ করলে এথেলরেড সন্ন্যাসীর সরঞ্জা ভেঙ্গে ড্রাগনটাকে মারল এবং তার সাথে ড্রাগনের আর্তনাদ আর তামার ফলকটার বিকট শব্দ সব মিলে আমাকে স্তব্ধ করে দিল। তাই আমি ওর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পাই নি।

রোডেরিক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল কথাগুলো শেষ করেই। দেখে মনে হচ্ছিল ওর প্রাণটা এখনই বেরিয়ে যাবে। ও চীৎকার করে বলতে লাগলো—পাগল, তোমাকে আমি বলতে পারি—আমার বোন ম্যাগলিন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যিই আমরা দেখতে পেলাম ম্যাডলিনের দীর্ঘকায় শরীরটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। রক্তে মাখা ওর সাদা জামাটা। ধস্তাধস্তির চিহ্ন ওর শীর্ণ দেহের প্রতিটি অংশে। দেখে মনে হচ্ছিল ও কাঁপছে। ছটফট করছে আর ঠিক দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কেঁদে উঠল চাপা কণ্ঠে। তারপর ও সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে রোডেরিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর রোডেরিক চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল মেঝের উপর। আমি বুঝলাম রোডেরিক শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে পরলোকে পা বাড়ালো।

তখনও প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য চলছে বাইরে। ঝড়ের বেগে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি, এই ঘটনার পর। আমি ভয়ে আতঙ্কে ছুটতে লাগলাম। আমি ছুটছিলাম উদ্‌ভ্রান্তের মতো। এইবার নিজেকে অনুভব করতে পারলাম। কোথায় যেন আলো জ্বলে উঠল হঠাৎ। আমি রোডেরিকের ভূতের বিশাল বাড়িটাকে দেখতে লাগলাম অবাক বিস্ময়ে। দেখতে পেলাম বাড়িটার ফাটলগুলোও। হঠাৎ মনে হলো ফাটলগুলো ক্রমশ বড় হতে আরম্ভ করেছে, আর কোথা থেকে একটা ঘূর্ণীঝড় দৈত্যের মতো বাড়িটার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার সাথে সাথে গোটা বাড়িটাই ধ্বসে পড়ল। দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অসংখ্য জলতরঙ্গ বাজার মতো আমার মনে ভেসে এলো একটি বিরাট জল কোলাহল। আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তখন সেই কালচে সরু খালটার সামনে। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলাম খালের জলের মধ্যে কেমন করে তলিয়ে যাচ্ছে রোডেরিক অসারের ভুতুড়ে বাড়িটা।

রহস্যময় প্রতিচ্ছবি

জর্জ বার্নাড শ'

রোডের নাম চার্চ। লণ্ডন শহরের উপকণ্ঠে রাস্তাটা। ভীড় নেই শহরের বেশ সুন্দর খোলামেলা জায়গা এখানে, ঐ রাস্তায় আমরা তখন থাকতাম। বেশ আনন্দেই ছিলাম।

ও রাস্তা আমাদের ছাড়তে হল। ঐ সুন্দর এলাকাটা দুঃখের সঙ্গেই ছাড়লাম ঐ বিশ্রী বাড়িটার জন্যই আমাদের ছাড়তে হল ঐ রাস্তাটা। আমরা যখন এ পাড়ায় এলাম তখনও বাড়িটা ছিল না, জায়গাটা ফাঁকাই পড়ে ছিল ওখানে।

আমাদের বাড়িখানা একেবারে শেষ মাথায় চার্চ রোডের আর্ল স্ট্রীটের কাছাকাছি। আমরা আসবার অনেকদিন পরে উল্টো দিকের ফাঁকা জারগায় একটা বিরাট চৌকণা বাড়ি উঠল, বাড়ির গড়নে কোন শিল্প কার্য নেই। বাড়িখানা পীড়িত করে দর্শকের চোখ দুটিকে। বলতে কি বাড়িখানা অত্যন্ত কু-শ্রী। এমন বাড়ি কে তৈরী করল এত টাকা খরচ করে?

তারপর মিস স্পেনসার নামে একজন ভদ্রমহিলা সে বাড়িতে থাকতে এলেন, তাঁর সঙ্গে এল কয়েকজন ঝি-চাকর। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোন আপনজন ছিল না। নতুন প্রতিবেশিনীকে লক্ষ্য করবার অনেক সুযোগ ছিল আমার, সুযোগটাকে কাজে লাগালাম, অনেক কিছুই জানলাম তাঁর সম্বন্ধে।

রোজ সকালে ভদ্রমহিলা বাড়ির পাশের একটা দরজা দিয়ে বাইরে আসতেন। তিনি চার্চ রোডের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতেন প্রায় এক ঘণ্টা ধরে। মিস স্পেনসারের চেহারা লম্বা, দোহারা, চেহারায় ছাপ রয়েছে একটা আভিজাত্যের, তাঁর পোশাক বেশ আভিজাত্যপূর্ণ তাঁর হাঁটাচলার মধ্যেও ফুটে উঠত আভিজাত্য। রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় ছায়ায় যখন তিনি চলতেন তখন আমার দেখতে বেশ ভাল লাগত। ভদ্রমহিলার আর কোন পরিচয় জানতাম না নামটুকু ছাড়া। তবে তিনি যে অভিজাত পরিবারের সন্তান সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। বেশ দামী ভদ্রমহিলার গাড়িখানাও। কাজেই তাঁর যে অর্থের অভাব নেই, তা বেশ বোঝা যেত। রোজ বিকালে তিনি গাড়ী করে বেড়াতে বেরোতেন। কিন্তু সকালে হেঁটে চলবার সময় কিংবা বিকেলে গাড়ী করে বেড়াবার সময় ভদ্রমহিলা একাই থাকতেন, তাঁর জীবন ছিল নিঃসঙ্গ।

আমার সমবেদনা হত তাঁর এই নিঃসঙ্গ জীবন দেখে, তাঁর কি কোন কাছের মানুষ নেই ?

একদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে আমি বললাম, "অত বড় একখানা বাড়িতে থাকতে মিস্ স্পেনসারের নিশ্চয় কষ্ট হয়। ও রকম একলা থাকাটা খুবই একঘেয়ে ব্যাপার।"

—"ঠিক বলেছ", খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে আমার স্বামী বললেন, ঐ মহিলার জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই। অথচ মহিলা বেশ সুন্দরী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না। দেখলেই মনে হয় অভিজাত বংশের।

স্বামী বললেন একটু থেমে, "আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না ?"

"—কি কাজ ?"

—"তুমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করতে পার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এক সুন্দরী নারী আবার আর এক সুন্দরী নারীকে মোটেই সহ্য

কথাটা বলেই আমার স্বামী হেসে ফেললেন—"খুব হয়েছে মশাই, আমিও না হয় একদিন গিয়ে মিস্ স্পেনসারের সঙ্গে আলাপ করে আসব", হাসতে হাসতে আমি বললাম।

একটা ছোট ঘটনা ঘটল সেইদিনই। এত তাড়াতাড়ি হয়ত আমার মনের বাসনা পূর্ণ হত না এই ঘটনা ঘটলে।

আমাদের পোষা কুকুর কার্লোকে সঙ্গে নিয়ে চার্চ রোডে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ দূরে দেখলাম মিস্ স্পেনসারকে। ভদ্রমহিলা এদিকেই আসছেন। কার্লো এতক্ষণ মহাখুশিতে আমার চারপাশে ছোটা-ছুটি করছিল, ওর গলা থেকে বেরিয়ে আসছিল আনন্দের ডাক। হঠাৎ কুকুরটার কি যেন হল। ওটা দাঁত বের করে হিংস্রভাবে তীর বেগে ছুটল মিস্ স্পেনসারের দিকে, কার্লো ভদ্রমহিলাকে এমন জোরে ধাক্কা মারল যে তিনি পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলেন। আমিও ছুটে গেলাম ওঁর দিকে। আমার কুকুরটার আচরণের জন্য বার বার ক্ষমা চাইলাম ভদ্র-মহিলার কাছে।

ভদ্রমহিলা ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন; আমার দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় উনি বললেন, "ঠিক আছে, আপনি এত অপ্রস্তুত হচ্ছেন কেন। আমি কিছু মনে করিনি, আর তা ছাড়া আমি নিজেও কুকুর ভালবাসি।

কার্লো বুঝতে পেরেছিল যে সে অন্যায় করে ফেলেছে, আমার পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল কুকুরটা, মিস স্পেনসার ওকে আদর করবার জন্য হাত বাড়াতেই চাপা গর্জন করে পিছিয়ে গেল কুকুরটা। বেশ বোঝা গেল ও রেগে গিয়েছে, ওর এরকম আচরণের কারণ বুঝতে পারলাম না।

—"আপনার কুকুরটা কি সুন্দর!" একথা বলে মিস্ স্পেনসার আবার কার্লোর গায়ে হাত বুলাবার জন্য হাত বাড়ালেন।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। দাঁত বার করে কার্লো হিংস্রভাবে গর্জন করে উঠল, গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠল কুকুরটার। ওর আচরণে একই সঙ্গে ফুটে উঠল নিদারুণ ভীতি আর প্রচণ্ড ক্রোধ।

"আপনার কুকুরটি দেখছি আমাকে মোটেই পছন্দ করতে পারছে না, মিস্ স্পেনসার বললেন বিষণ্ণ গলায়।

—"আমি বুঝে উঠতে পারছি না ওর এরকম আচরণের অর্থ। আমরা পরস্পর প্রতিবেশী, আপনার সঙ্গে ওর এমন আচরণ করা উচিত নয়।"

—"প্রতিবেশী ?"

—"হ্যাঁ আমি থাকি আপনার বাড়ির উল্টো দিকের বাড়িখানায়।

—"তাই নাকি !"

এরপর নিজের পরিচয় দিলাম, দু' একদিনের মধ্যেই তাঁর বাড়িতে আমি যেতাম।

ভরে গেল খুশির হাসিতে ভদ্রমহিলার মুখ। বললে, 'বেশ তো, খুবই আনন্দের কথা। আচ্ছা, আসুন না কেন কালকেই।"

—"বেশ।"

ভদ্রমহিলাকে কথা দিয়ে তখনকার মত বিদায় নিলাম।

মিস্ স্পেনসারের বাড়িতে গেলাম। আমার খুব পছন্দ হল ওঁকে। ভদ্রমহিলারও আমাকে ভাল লাগল। আলাপ পরিচয়ের পর প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতাম, ভদ্রমহিলা বিদুষী, সুরুচিসম্পন্না। তিনি চমৎকার সঙ্গী হিসেবেও। তাঁর মধ্যে একটা প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি বর্তমান। যখন তাঁর কাছাকাছি থাকতাম, তখন সেই আকর্ষণী শক্তি যেন আমাকে অভিভূত করে ফেলত। যখন তাঁর কাছে থাকতাম না তখন সেই শক্তি যেন আমাকে টানত, ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে আমার প্রকৃত মনোভাবটা যে কি তা আমি সঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। তাঁকে আমি ভালোবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম কিন্তু তার সম্পর্কে আমার মনের এক কোণে একটা ক্ষীণ বিরূপ ভাবও ছিল। কেন যে ছিল তা আমি বলতে পারব না! ভদ্রমহিলার কথাবার্তার বা আচার আচরণে এমন কিছু ছিল না যার ফলে এই বিরূপতার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এখন থাক এসব জটিল মনস্তত্ত্বের কথা। সোজা কথায় ভদ্রমহিলার প্রতি আমার মনোভাবকে আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না।

তবে যারা মিস্ স্পেনসারের কাছাকাছি আসতেন তাঁদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল সন্দেহের কোন অবকাশ নেইএ ব্যাপারে, ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের কম নয়। কিন্তু এখনও ওঁর যা রূপ, তাতে অভিজাত সমাজের সুন্দরী তরুণীরা পর্যন্ত ম্লান হয়ে যাবে তাঁর সৌন্দর্যের কাছে, কিন্তু ভদ্রমহিলা সমাজে মিশতে চাইতেন না, বরং এড়িয়ে যেতেন সমাজকে, একমাত্র আমার সঙ্গেই তার কিছুটা অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, সমাজকে এড়িয়ে একক নিঃসঙ্গ জীবনই তাঁর কাম্য ছিল।

আমি অনেকবার মিস্ স্পেনসারের বাড়িতে গিয়েছি, কিন্তু উনি আমাদের বাড়ি বেশী আসেন নি, আসতে বললে নানা অজুহাতে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। আর যদি না কখনও আমাদের বাড়িতে আসতেন তাহলে নিজের বাড়ির মত কখনও স্বস্তি বোধ করতেন না। সহজ হয়ে উঠতে পারতেন না নিজের বাড়ির মত। হয়ত কার্লোর অদ্ভুত অস্বাভাবিক আচরণে উনি বিব্রত হয়ে পড়তেন। ওঁকে দেখলে কুকুরটা যে কেন ওরকম করত তা আমি বুঝতে পারতাম না। উনি আমাদের ঘরে এলেই কার্লো গুটিসুটি মেরে সোফার তলায় ঢুকে পড়ত। একবার ওঁকে দেখে কার্লো এমন করুণ আর্তনাদ করে উঠল যে মিস্ স্পেনসার দস্তুরমত ঘাবড়ে গেলেন। ভদ্রমহিলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তাঁর প্রায় অজ্ঞান হবার মত অবস্থা।

কি অস্বস্তিকর ব্যাপার ভাবুন দেখি।

মিস স্পেনসার জোর করে মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনলেন। ম্লান হেসে বললেন, "দেখুন দেখি কাণ্ড, মাঝে মাঝে কি যে হয় আমার! সামান্য ব্যাপারেই ঘাবড়ে যাই—ভয় পেয়ে যাই, স্বস্তি পাই না নিজের বাড়ি ছাড়া—সহজ হয়ে উঠতে পারি না।"

"না না কি হয়েছে; মানুষমাত্রেই তো হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।" আমি ভদ্রমহিলার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

—ছেড়ে দিন, "লৌকিকতার কথা আপনার যখনই সুবিধা হবে তখন আমার বাড়িতে চলে আসবেন," মিস্ স্পেনসার বললেন, "মাঝে মাঝে অবশ্য আমিও আসব আপনাদের এখানে। তাছাড়া আপনি তো বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, কাজেই আপনি বেশী যাবেন।"

ভদ্রমহিলা হাসলেন।

হাসলাম আমিও।

প্রায়ই যেতাম মিস্ স্পেনসারের বাড়িতে। তিনি কেবল আমাকে আকৃষ্টই করতেন না, তার সম্পর্কে আমার মনে জেগে উঠেছিল এক অদম্য কৌতূহল। ভদ্রমহিলার চারপাশে যেন ছিল একটা রহস্যের আবরণ। সে আবরণ দুর্ভেদ্য। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি রহস্যটাকে, আলাপ করবার সময় তিনি কখনও বাবা, মা, ভাই, বোন, প্রেমিকা বা বন্ধু-বান্ধবের

প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন না। সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, রাজনীতি এবং আরও অনেক টুকিটাকি ব্যাপার নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন, কিন্তু নিজের অতীত জীবন সম্পর্কে তিনি ছিলেন একেবারেই চুপ। মিস্ স্পেনসারকে কোনদিন রোমন্থন করতে দেখিনি অতীত স্মৃতির। একবার আমি সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর বাবা-মার কেউই বেঁচে নেই। আমার প্রশ্ন শুনে মিস স্পেনসারের মুখে নিষেধের যে ভাব ফুটে উঠেছিল তা দেখে আমি আর তাঁকে ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন করিনি।

টাকার কোন অভাব ছিল না মিস্ স্পেনসারের। তাঁর দামী পোশাক পরিচ্ছদ এবং জীবনযাত্রার ধরন দেখে মনে হত তিনি প্রচুর অর্থের অধিকারিণী। তাঁর ঝি চাকরেরাও বেশ খানদানী ঘরের ঝি চাকরের মত, নিশ্চয়ই খুব ভাল ছিল তাদের মাইনেপত্তরও। তাঁর রাধুনী আর খাস ঝি ছিল ইংরেজ। খাসনামা লুই ছিল ফরাসী। মিস্ স্পেনসার যখন গাড়ী করে বেড়াতে বেরোতেন, তখন তাঁর সঙ্গে যেত লুই। লুই মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত চিঠি নিয়ে মিস্ স্পেনসারের। চিঠিতে আমন্ত্রণ থাকত তার সঙ্গে বেড়াতে যাবার। গাড়ী ছিল না আমাদের। ফাঁকা হাওয়ায় বেড়াবার লোভে আমি খুশি মনেই সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতাম। একবার এক সপ্তাহে বিশেষ কারণ বশতঃ আমাকে মিস্ স্পেনসারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করতে হল দু-দু-বার। উনি হয়ত আমাকে অভদ্র ভাবছেন—একথা চিন্তা করে আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভাবলাম কেন দুদিন ওঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারি নি তা ভদ্র-মহিলাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলব। উনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। আমার সম্বন্ধে ওঁর মনে যদি কোন বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে তারও অবসান হবে।

ভদ্রমহিলা যেন খুবই বিচলিত, গিয়ে দেখলাম। একটা চাপা উত্তেজনায় তিনি যেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

কেন দু'দিন তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারি নি সে কথা বুঝিয়ে বলতে গেলাম কিন্তু আমার ব্যাখ্যায় কান না দিয়ে তিনি বললেন, "জানেন, আমার বাড়িতে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, কে এসেছিলেন বলুন দেখি—অনুমান করুন।"

—"মনে হয় গীর্জার যাজক মিঃ মার্শাল।"

—"ঠিক বলেছেন। যাজকমশাই বলেছিলেন যে এমন বড় বাড়ির লোক

জনের সঙ্গেই তিনি দেখা করতে যান যাঁরা তাঁর গীর্জার এলাকায় পড়ে। যান নিয়মিতই। কিন্তু···কিন্তু আমার সঙ্গে আর তিনি দেখা করতে আসবেন না বলে আমার মনে হয়।"

মৃদু হাসলেন মিস্ স্পেনসার।

—"কেন ?" একটু আশ্চর্য হয়েই প্রশ্ন করলাম।

"—কারণ আমার মনের কথা বলেছি আমি পরিষ্কার ভাবেই, এটা বলতেও ভুলি নি যে ধর্মের ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা মতামত রয়েছে তা ছাড়া আমি কোন দিন গীর্জায় যায় নি।"

—"যাজক মশাই যা বললেন"—আমার বেশ মজাই লাগছিল। যাজক মশাই-এর আতংক ভরা মুখখানা আমার মনে পড়ছিল।

—"উনি খুব একটা কিছু বললেন না, তবে মনে হল অনেক কথাই ভাবলেন। পুরুষ মানুষের পক্ষেই বিরাট অপরাধ, ধর্মের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত মতের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করা মেয়েদের পক্ষে তো এ অপরাধের কোন মার্জনা নেই।"

"কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে তো আপনি ধর্মায়তনের প্রতিষ্ঠিত মতের বিরুদ্ধে নন," একটু অবাক হয়ে বললাম, কারণ আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে যে একাধিকবার আমি মিস্ স্পেনসারকে আমাদের এলাকায় গীর্জায় যেতে দেখেছি। কিন্তু যদি উনি তা অস্বীকার করেন তবে আমার বলবার কি আছে। আমি বলতে যাবই বা কেন এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে।

এরপর যে দিন মিস্ স্পেনসারের বাড়ি গেলাম, দেখলাম তিনি বাইবেল পড়ছেন। গা এলিয়ে দিয়েছেন তিনি তাঁর প্রিয় 'ইজিচেয়ার' খানায়। তাঁর কোলে খোলা বাইবেল। মিস্ স্পেনসার আমাকে স্বাগত জানালেন। তাঁর পাশের চেয়ারখানায় বসলাম আমি। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিস্ স্পেনসার বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই বাইবেলের 'কেইন আর অ্যাবেল'-এর কাহিনী পড়েছেন ?"

এমনভাবে তিনি প্রশ্নটা করলেন যেন তিনি সদ্য প্রকাশিত কোন উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন।

আদিম মানব-মানবী আর ইভের পুত্র কেইন তার ভাই অ্যাবেলকে হত্যা করে। সবাইকারই জানা বাইবেলের এ কাহিনী।

—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পড়েছি" মিস স্পেনসারের প্রশ্নের উত্তরে বললাম।

—"আপনি কি পৃথিবীর প্রথম খুনীর মুখে যে কলঙ্ক চিহ্ন ফুটে উঠেছিল, তার কথা কখনও ভেবেছেন ?"

—"ভেবেছি, মাঝে মাঝে" উত্তর দিলাম আমি।

—"আপনার মত কি এ বিষয়ে ? নির্লিপ্ত স্বরে প্রশ্ন করলেও মিস্ স্পেনসারের কালো চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন এক বিষাদের গভীরতা—কেমন এক অনিদৃশ্য রহস্যময়তা।

—"চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এ বিষয়ে আসা খুবই শক্ত। আমাদের জ্ঞান এতই সীমিত যে এ ব্যাপারে অনুমান ছাড়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় অন্য কিছু করা।"

—"ঠিকই বলেছেন। অনুমানের ফলে আসতে পারে কৌতূহল। হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলজনক।"

একটু থেমে মিস্ স্পেনসার বললেন, "যেমন ধরুন ঐ কলঙ্ক চিহ্ন। তা কি সব সময়েই থাকত ? না কি বিশেষ বিশেষ পরিবেশে অথবা অবস্থায় চিহ্নগুলি ফুটে উঠত।

"পারব না বলতে। আমি কোন দিন ভাবি নি এ সম্পর্কে। সত্যি কথা বলতে কি—আমার কাছে একেবারে নতুন এ ধরনের চিন্তা ভাবনাই।"

—"কলঙ্ক চিহ্ন সব সময় থাকুক কি না থাকুক কেইনের তাতে কি ?" শোনা গেল বিষণ্ণ সুর মিস্ স্পেনসারের কণ্ঠে। "কেইন নিজে তো জানত কি প্রচণ্ড অন্যায়—কি মহাপাপ সে করেছে, কৃতকর্মের জন্য অনুতাপে ভরে গিয়েছিল তার মন। পাপ স্খালনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল সে আকুলভাবে। কিন্তু কেইন জানত যে জীবনের শেষ দিন—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, ঈশ্বরের ক্রোধের প্রতীক স্বরূপ ঐ নিদারুণ কলঙ্ক-চিহ্ন তাকে বহন করতে হবে নিজের শরীরে উঃ কি দুর্ভাগ্য ! কি শাস্তি !"

—মানসিক দারুণ যন্ত্রণায় হাত কচলাতে লাগলেন মিস্ স্পেনসার।

—"কিন্তু কেইন মহাপাপ করেছিল। সে তার নিজের ভাইকে হত্যা করেছিল।" কেইনের মত একজন নৃশংস হত্যাকারীর উপর মিস্ স্পেন-সারের সহানুভূতি দেখে আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেইনের শাস্তি পাওয়াই উচিত। হ্যাঁ সে যে মহাপাপ করেছিল সে জন্য ও রকম শাস্তিই ছিল তার প্রাপ্য। ঈশ্বর তাকে ঠিক শাস্তিই দিয়েছেন। কেইনের উপর আমার কোন সহানুভূতি নেই।"

—"ওরকম কথা বলবেন না," যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে মিস স্পেনসার বললেন। তাঁর কথাগুলো আর্তনাদের মত শোনাল।

তাঁর চোখের দিকে চোখ পড়তেই আমার সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল!

কি দেখলাম তার চোখে? জানি না, গুছিয়ে বলতে পারব না। মিস্ স্পেনসার দেখলেন আমার ভাবান্তর। মুহূর্তের মধ্যে আবার ফিরে এল তাঁর আগেকার শান্ত ভাব। ক্ষণিকের জন্য একটা মুখোশ যেন খুলে পড়েছিল।

"হিংসা ছিল মানুষের প্রথম অপরাধের মূলে। পরবর্তীকালে এই হিংসা প্রবৃত্তিই আত্মপ্রকাশ করেছে মানুষের বিভিন্ন অপরাধের মধ্য দিয়ে। হিংসা হল মহা অমঙ্গল। মানুষের উপর এ হল শয়তানের প্রভাবের ফল। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে নষ্ট করে দিতে চায় শয়তান। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে সে প্রলুব্ধ করে নানাভাবে," থামলেন মিস্ স্পেনসার।

"খুবই খারাপ ব্যাপারটা। মানুষ তার ভালবাসার পাত্রপাত্রীকে খুন করবে আর হিংসাকে দেখাবে তুচ্ছ অজুহাত হিসেবে…এরকম কথা ভাবতেই তো খারাপ লাগে" বললাম আমি।

—"একজন মানুষ তার ভালবাসার পাত্রকেও খুন করতে পারে—একথাটা কি আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না?"

—"না, আমি বিশ্বাস করি না একথা।"

—"কেন?" ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন মিস্ স্পেনসার।

—"কারণ কখনও হত্যা করতে পারে না ভালবাসা। অসৎ প্রবৃত্তিকে মানুষের অশুভ কামনা জাগিয়ে তোলে। মানুষ অপরাধ করে অন্ধ আবেগের তাড়নায়। ভালবাসা শেখায় আত্মত্যাগ। হিংসা নিয়ে আসে দুঃখ—বেদনা আর ভালবাসা? যে মানুষ ভালবাসে যে প্রিয়জনের সুখের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে নিঃশেষে—সম্পূর্ণভাবে। ভালবাসা সব সময়ই সুখী করতে চায় প্রেমের পাত্রকে।"

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্ স্পেনসার, স্পেনসার, ধীরে ধীরে তারপর বললেন।

"প্রবল প্রলোভনের শক্তি যে কি প্রচণ্ড তা আপনি জানেন না। প্রলোভনের শিকার হয়ে মানুষ যে কত খারাপ কাজ করতে পারে, তা আপনি

জানেন না। আপনার ধারণারও বাইরে মানুষ যে কত নীচে নামতে পারে। মিসেস হোপ, আপনি খুব ভাল মানুষ...খুব সরল। আপনি এলে আমি খুব আনন্দ পাই, সত্যি বলছি।"

ওখানেই শেষ হল সেদিনকার মত কথাবার্তা।

কয়েকদিন পরে মিস্ স্পেনসারের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে খানসামা লুই আমার কাছে এল। মিস্ স্পেনসার জানতে চেয়েছেন সেদিন আমি তাঁর সঙ্গে গাড়ী করে বেড়াতে যেতে পারব কি না? তাছাড়া দুপুরের খাওয়াটা তার ওখানেই সেরে নিতে আমার কোন অসুবিধা আছে কিনা সে কথাও জানতে চেয়েছেন মিস্ স্পেনসার।

খেতে বা বেড়াতে যেতে যে আমার কোন অসুবিধা নেই লুই-এর মারফৎ জানালাম।

মিস্ স্পেনসারের গাড়ী এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ির সামনে বেলা প্রায় বারটার সময়।

তৈরী হয়েই ছিলাম। বেরিয়ে পড়লাম গাড়ীটা আসতেই।

দুপুরের খাওয়া সেরে গাড়ী করে বেরোলাম। খানসামা লুই যথা-রীতি সঙ্গেই রইল।

আমরা ঘণ্টা দুই ঘুরলাম। তারপর ফিরবার পালা। আমরা ফির-ছিলাম বড় রাস্তা ধরে। বাড়ি এখনও আধ মাইল দূরে, একটা টুপির দোকানের সামনে এসে পড়েছি আমরা। এ দোকানে মেয়েদের নানা রকমের টুপি পাওয়া যায়, একটা ফটো তুলবার স্টুডিও এ দোকানটার পাশে।

মিস্ স্পেনসার গাড়ী থামবার নির্দেশ দিলেন। গাড়িটা থামল টুপির দোকানের সামনে। ভাবলাম ভদ্রমহিলা হয়ত টুপি কিনবেন।

—"এখানে নয়, ফটো তুলব, স্টুডিওর সামনে চল," মিস্ স্পেনসার বললেন অস্বাভাবিক দৃঢ় স্বরে।

স্টুডিওর সামনে গাড়ি থামল।

খানসামা লুই নামল দরজা খুলবার জন্য। কিন্তু দরজা না খুলে হাতলে হাত রেখে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখে অবাক হলাম।

লুই বলল "মাদাম" ঐ একটা শব্দের মধ্যেই যেন ঝরে পড়ল একরাশ মিনতি। ফুটে উঠল নিষেধের রেখা তার মুখে।

মিস্ স্পেনসারের দুটি চোখ যেন বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল। "দরজা খোল" তিনি হুকুম দিলেন।

আদেশ অমান্য করা অসম্ভব সেই শীতল অথচ দৃঢ়কণ্ঠের।

নেমে পড়লাম গাড়ী থেকে। শুনতে পেলাম লুই-এর দীর্ঘনিঃশ্বাস। সে আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। ওর ভাব দেখে মনে হল লুই যেন কিছু বলতে চায় আমাকে। কিন্তু সে কথা বলবার সাহস নেই ওর। এর অর্থ কি? বুঝতে পারলাম না কিছুই।

গাড়ী থেমেছে স্মিথের স্টুডিওর সামনে। শহরতলীতে স্মিথের খুব নাম ডাক হলো ভাল ফটোগ্রাফার হিসেবে। আমি আর আমার স্বামী এখান থেকে কয়েকবার ফটো তুলিয়েছি। স্মিথ ছবি তুলেছে খুব যত্ন করে। ছবিও খুব সুন্দর হয়েছে।

আমাদের ঢুকতে দেখে কাউণ্টার থেকে একটি অল্পবয়সী মেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ

—"ছবি তুলবেন?"

—মিস্ স্পেনসার বললেন, "হ্যাঁ"।

—"আপনাদের কি আসবার কথা ছিল?"

—"হ্যাঁ, আসবার কথা ছিল দু'টোর সময়।"

মিস্ স্পেনসার তাঁর নাম বললেন।

—"আসুন, আপনারা ভিতরে আসুন" মেয়েটি আমাদের নিয়ে গেল ভিতরের একখানা ঘরে—ছবি তুলবার জায়গায়।

'ডাক চেম্বার' থেকে একটু পরেই স্মিথ বেরিয়ে এল। একটু হেসে বলল, আমাকে দেখে—"এই যে মিসেস হোপ, কি রকম 'পোজ-'এ ছবি তুলবেন?"

—"আমি নয়, আমার বান্ধবী, ছবি তুলবেন" জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন মিস্ স্পেনসার। তাঁর দিকে আঙুল তুলে দেখালাম।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই মিস্ স্পেনসার আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে ফটোগ্রাফার স্মিথ চমকে উঠল।

হ্যাঁ চমকাবারই কথা। অদ্ভুত পরিবর্তন ভদ্রমহিলার মুখে। মাত্র দশ মিনিট আগে আমি কি এই মহিলার সঙ্গেই গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা করছিলাম? চোখ দুটো বসে গিয়েছে মিস্ স্পেনসারের। মুখখানা

পাণ্ডুর, সেখানে যেন এক বিন্দু রক্ত নেই। তাঁর সুন্দর গোল মুখখানা কেমন যেন লম্বাটে হয়ে গিয়েছে। অসহনীয় যন্ত্রণায় নির্ভুল ইঙ্গিত তাঁর মুখের রেখায় ফুটে উঠেছে। অমানুষিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন ভদ্রমহিলা।

—"আপনি অসুস্থ···আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।" আমি চীৎকার করে বললাম, "একটু জল···তাড়াতাড়ি একটু জল আনুন কেউ।"

—"না, জলের প্রয়োজন নেই," মিস্ স্পেনসার অদ্ভুত গলায় বললেন, তারপর আসনে বসে স্মিথকে ইঙ্গিত করলেন ছবি তুলবার জন্য।

স্মিথ তাড়াতাড়ি কালো পর্দা-ঘেরা কোণায় দিয়ে ঢুকল। পরে আমার মনে হয়েছিল স্মিথ মিস্ স্পেনসারের বসার ভঙ্গী ঠিক করে দেয়নি, এমন কি একটা কথাও বলে নি এ সম্পর্কে!

—"এখন ছবি তুলে কি হবে? কি দরকার?" মিস্ স্পেনসারের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে তাঁর বরফের মত ঠাণ্ডা হাত দু'খানা ঘষতে ঘষতে বললাম, "আপনি অসুস্থ। এখন আপনার শরীরের অবস্থা ফটো তুলবার উপযুক্ত নয়। ছবিতে উঠবে না আপনার আসল চেহারা। মৃত মানুষের ছবির মত মনে হবে।"

মিস স্পেনসারের গলা চিঁড়ে বেরিয়ে এল এক অমানুষিক দুঃসহ আর্তনাদ। পৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণা যেন ধরা পড়ল ঐ তীব্র তীক্ষ্ন আর্তনাদের মধ্যে। তাঁর ডান হাতখানা চেপে ধরল চেয়ারের হাতল, দাঁতে দাঁত আটকে গেল। মিস্ স্পেনসারের কপালে ফুটে উঠল বড় বড় ঘামের ফোঁটা। একটা প্রচণ্ড ভয় যেন আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে তাঁকে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তিনি যুঝে চলেছেন সেই মহাভয়ের সঙ্গে।

আমার দারুণ ভয় হল ভদ্রমহিলার এরকম অবস্থা দেখে। কাঁপতে লাগলাম আমি।

—"আসুন চলে আসুন আপনি," আমি চীৎকার করে উঠলাম ভদ্রমহিলাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করতে করতে।

বাধা দিলেন মিস্ স্পেনসার। ভাঙা গলায় ফ্যাস ফ্যাস করে তিনি বললেন ঃ -'আমি জানব···আমাকে জানতেই হবে আপনি আমার কাছে থাকুন···কাছে থাকুন আমার···একটু সাহায্য করুন আমাকে···"

পাশে বসলাম মিস্ স্পেনসারের। দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেললাম। ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকাবার সাহস আমি হারিয়ে

ফেলেছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি যেন কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি একটা বিয়োগান্তক নাটকে। কিসের জন্য ভয় তা না জানায় আমার আতঙ্ক যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল।

কেটে যাচ্ছে সময়। কারো জন্য সময় বসে থাকে না, কালো কাপড়ে ঘেরা জায়গাটার মধ্যে ফটোগ্রাফার স্মিথের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বসে রইলাম অভিভূতের মত।

চমকে উঠলাম হঠাৎ স্মিথের কণ্ঠস্বরে। স্মিথ বলছে,—"খুবই দুঃখিত ম্যাডাম, আপনার ফটো তোলা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

একটা কথাও বললেন না মিস্ স্পেনসার। চেয়ার থেকে উঠে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মুখে নিদারুণ হতাশার ছাপ। খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল ভদ্রমহিলাকে।

বাড়ি ফিরবার পথে কোন কথা হল না আমাদের দু'জনের মধ্যে। আমাদের বাড়ির গেটের সামনে গাড়ী পেঁছিলে তিনি এই প্রথম আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো। তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, "বিদায় মিসেস হোপ···চিরবিদায়।"

জলে ভরে এসেছিল আমার দু'চোখ। গলার ভিতর থেকে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল। মিস স্পেনসারের কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। কান্নাভরা গলায় তাঁকে জিজ্ঞেসও করতে পারলাম না কোন কথা, ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে আমাকে খুলে বলবেন তাঁর সব কথা।

সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী ফিরলেন, স্টুডিওতে যা ঘটেছিল তা তাঁকে সবিস্তারে খুলে বললাম। বাদ দিলাম না একটি কথাও। আমার স্বামী হালকাভাবে নিলেন ব্যাপারটাকে। বললেন, "এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এ হল স্নায়ুর দোষ, খেয়ালী মনের উৎকৃষ্ট কল্পনা-বিলাসও বলা যেতে পারে এক।"

প্রতিবাদের সুরে আমি বললাম, "কক্ষণো না, তুমি যদি মিস স্পেনসারের পরিবর্তিত ভয়ংকর মুখখানা দেখতে তাহলে কিছুতেই এরকম কথা বলতে পারতে না।"

আমার কথা শেষ হতে না হতেই পরিচারিকা এসে বলল, "ফটোগ্রাফার মিঃ স্মিথ এসেছেন, তিনি গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

আমি বললাম, "এখানেই নিয়ে এস ওঁকে।"

মিঃ স্মিথ ঘরে আসলে আমার স্বামী বললেন, "এই যে মিঃ স্মিথ আপনার স্টুডিওতে আজকে নাকি কি সব রহস্যময় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছেন আমার স্ত্রী।"

—"তাতে অবাক হব না কারণ আমি নিজেও ঘাবড়ে গিয়েছি। মিসেস হোপের সঙ্গে যে মহিলা আজকে আমার স্টুডিওতে গিয়েছিলেন তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমি। ভদ্রমহিলা যদি মিসেস হোপের বান্ধবী হন, তবে একথা বলতে আমি বাধ্য হব যে ভদ্রমহিলা ঠিক স্বাভাবিক নন। কোন একটা অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ব্যাপার জড়িয়ে আছে ওঁর জীবনের সঙ্গে। হয়ত ব্যাপারটা অলৌকিক...অপ্রাকৃত।"

"এরকম ধারণার কারণ?"

—"ছবি তোলা সম্ভব হয়নি ভদ্রমহিলার।"

—"শুধু এই কারণেই আপনার এরকম ধারণা হল?" আমার স্বামী প্রশ্ন করলেন অবজ্ঞার সুরে।

—"না, শুধু আজকের ব্যাপারে নয়। মিস স্পেনসারকে আমি আগেও দেখেছি। পাঁচ বছর আগে আমি একটা বিখ্যাত কোম্পানীর ফটোগ্রাফার ছিলাম। উনি ফটো তুলবার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। আমি ওঁর ফটো তুলতে পারি নি অনেক চেষ্টা করেও। ভদ্রমহিলার ছবি তোলা যে অসম্ভব সেকথা তখন ওঁকে জানিয়েও দিয়েছিলাম।

"অসম্ভব কেন?" প্রশ্ন করলেন আমার স্বামী।

—"কারণ অসংখ্য দাগে ভরা প্রত্যেকটা নেগেটিভ। ভদ্রমহিলা জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন, কাজেই তাঁর মুখটা আমি প্রথমে দেখতে পাই নি। কিন্তু উনি যখন ঘুরে আমার দিকে তাকালেন তখন দেখলাম একখানা শঙ্কা-বিহ্বল মুখ। দেখেই ওঁকে চিনতে পারলাম। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম ফটো তুলবার জন্য, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা।"

—"কেন? কি হল?" প্রশ্ন করলাম আমি। আমার গলা থরথর করে কাঁপছিল উত্তেজনায়।

সেই ফল একই রকম। তবু আপনাদের দেখাবার জন্য আমি দু'খানা 'নেগেটিভ' প্রিণ্ট-ও করেছি। ফল কি হয়েছে দেখুন। আপনিই আগে, দেখুন মিঃ হোপ।"

ব্যাগের ভিতর থেকে দু'খানা ফটো বের করে মিঃ স্মিথ আমার স্বামীর হাতে দিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে আমার স্বামীর মুখের চেহারা পালটে গেল ফটো দেখে। প্রচণ্ড কৌতূহল আর উৎকণ্ঠায় আমি যেন ফেটে পড়ছিলাম। আমার আর তর সইছিল না আমিও ফটোগুলির দিকে তাকালাম।

"হায় ঈশ্বর! একি দৃশ্য দেখলাম! আমার সমস্ত শরীরটা দারুণ আতংকে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সমস্ত ছবি দাগে ভরে গিয়েছে। প্রতিটি দাগে মুখের ছাপ একটি করে। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই পরিষ্কার মুখের ছাপ···নিখুঁত ছাপ!

আর সে ছাপ মৃত মানুষের মুখের!

শিউরে উঠলাম দারুণ আতংকে। দুলে উঠল আমার চারপাশ। অন্ধকার! অন্ধকার! পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার আমার চারপাশে! চারপাশ থেকে অন্ধকারের মহাসমুদ্রে যেন আমাকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসছে।

আর কিছু আমার মনে নেই। আমি বোধ হয় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম ঘরের মেঝেতে।

পরদিন আমাকে ওবাড়ি থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলেন আমার স্বামী।

যখন ফিরলাম পনের দিন পরে তখন সামনের বাড়িটা খালি। মিস স্পেনসার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন, আমার দেখা হয় নি তার সঙ্গে আর। হয়ত দেখা হবেও না ভবিষ্যতে ভদ্রমহিলা যতবড় অপরাধই করে থাকুন না কেন, আমি জানি তিনি অনেক শাস্তি পেয়েছেন···তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে অনেক যন্ত্রণা। দুঃসহ সে যন্ত্রণা। তিনি যে মহাপাপ করেছেন তার জন্য তাঁর মনে অহরহ অনুতাপহচ্ছে···হচ্ছে অনুশোচনাও। তাঁর মুক্তি নেই এ দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে কোনদিনই মুক্তি নেই।

সমবেদনা বোধ করি মিস স্পেনসারের জন্য, আমার সমস্ত মন দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে জানাই আমার অনুকম্পা, আর প্রার্থনা করি পরম পুরুষের কাছে তার আত্মার শান্তির জন্য।

প্রেতাত্মার চক্র

আগাথা ক্রিস্টি

রাউল সীন নদীর উপরের সেতু পার হল। খুশিতে ভরা মনটা, সে নিজের মনেই গানের কলি ভাজছিল। ফরাসী যুবক রাউল বয়সে তরুণ। বেশ সুন্দর ওকে দেখতে। সুন্দর মুখে ছোট সাইজের কালো গোঁফটি চমৎকার মানিয়েছে। তার চাকরীটাও ভালো। রাউল একজন ইঞ্জিনীয়ার।

সতেরো নম্বর বাড়িতে ঢুকল কারদোন এল রাউল। পরিচারিকা নিয়মমাফিক 'সুপ্রভাত' জানাল বটে, কিন্তু জানাল অত্যন্ত বেজার মুখে। রাউল সেটা বোধ হয় লক্ষ্যই করল না। সুপ্রভাত জানাল সে হাসি মুখেই।

রাউল গন্তব্যস্থল চারতলার একটি ফ্ল্যাট। সে খুশি মনেই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল। ফ্ল্যাটের সামনে এসে পড়ল একটু পরে, কলিং বেল-এর সুইচ টিপে দরজা খুলবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। গলায় আবার গানের সুরটা এসে গেল, আপন মনেই একটি কলি গুনগুন করে গাইতে লাগল সে। আজ সকালে মনের মধ্যে যেন খুশির জোয়ার এসে

গিয়েছে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলল—খুলে দিল একজন বৃদ্ধা ফরাসীমহিলা। রাউলকে দেখে তার বলিরেখাঙ্কিত মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—মহিলা হাসিভরা মুখে বলল, "সুপ্রভাত, মঁশিয়ে"।

—"সুপ্রভাত, এলিস" হাসি মুখে রাউল উত্তর দিল।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করল এলিস, তারপর রাউলের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি "বৈঠকখানায় একটু বসুন, আমি খবর দিচ্ছি মাদামকে! একটু পরেই তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে।"

—"মাদাম কি ব্যস্ত আছেন? তিনি কি করছেন?

—"তিনি একটু বিশ্রাম করছেন," উত্তর দিল এলিস।

—"বিশ্রাম করছেন! এখন? প্রশ্ন করল রাউল একটু অবাক হয়েই, "কেন শরীর কি খারাপ হয়েছে মাদামের?"

"খারাপ হবে না তো কি?" এলিস একটু মুখঝামটা দিয়েই কথাটা বলল।

এলিস ছোট বৈঠকখানার দরজা খুলে দিল তারপর রাউল সোফায় বসতেই আগের কথার জের টেনে বলল, "মাদামের শরীর তো খারাপ হবেই, কারো শরীর কি ভাল থাকে এরকম বারবার চক্রে বসতে হলে! আমরা কাজ করছি ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমি তো বলব আমরা ...আমরা শয়তানের সঙ্গে কাজ-কারবার করছি। দেখছেন না, মাদাম দিন দিন কেমন রোগা আর ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছেন, ওঁর শরীরটা রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। আজকাল আবার সুরু হয়েছে মাথাধরা, মাথার যন্ত্রণায় অনেক সময়ই তো বিছানায় শুয়ে থাকেন।

"কেন রাগ করছ এলিস?" ওর কাঁধে হাত দিয়ে মিষ্টি গলায় রাউল বলল, "তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না, এর মধ্যে কোন ব্যাপারই নেই শয়তানের। অনর্থক টানাটানি করছ কেন শয়তান বেচারাকে নিয়ে?"

রাউলের কথায় আশ্বস্ত হতে পারল না এলিস। আপন মনে নীচু গলায় সে বলতে লাগল, "এসব শয়তানী কাণ্ড-কারখানা আমার মোটেই পছন্দ হয় না, মাদামের শরীরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন—দেখুন দিনের পর দিন কি হাল হচ্ছে। ইহজগতের মানুষ আমরা। পরলোকের আত্মাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি আমাদের? আমাদের এটুকু

জানলেই হল যে ভাল আত্মারা স্বর্গে যান আর খারাপ আত্মাদের যেতে হয় নরকে। পাপীরা তাদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি পায় নরকে।

—"তোমার চিন্তা-ভাবনা দেখছি পরলোক সম্পর্কে একেবারে জটিলতা মুক্ত। এ সম্পর্কে তোমার হিসেব-নিকেশ দেখছি খুবই সহজ।"

—"আপনাদের বিয়ের পরে আর প্রেতাত্মা নিয়ে এসব চক্র-টক্র করবেন না তো, মঁশিয়ে?" এলিস প্রশ্ন করল, তার কন্ঠস্বরে অনুরোধের সুর।

— আরে না না," এলিসের দিকে তাকিয়ে রাউল হাসল।

—"সত্যি বলছেন?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি খুব ভালবাস মাদামকে, তাই না এলিস?"

—"হ্যাঁ" অকপটে স্বীকার করল বৃদ্ধা।

—"তোমাকে খুব বিশ্বাস করেন মাদামও।"

—"আমারও তা-ই মনে হয়।"

—"তোমার কোন চিন্তা নেই এলিস, একবার হয়ে যাক বিয়েটা, তারপর একেবারে তুলে দেব, এসব প্রেতাত্মা আর পরলোকের কারবার। আমার স্ত্রীকে আর এসব অপ্রাকৃত ব্যাপার নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে দেব না। এ নিয়ে কোন ঝামেলায়ই পড়তে হবে না তাঁকে।"

এলিসের বলিরেখায় ভরা মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ব্যগ্র-ভাবে সে বলল—

—"সত্যি? সত্যি এটা ঠিক করে ফেলেছেন মঁশিয়ে?"

—"হ্যাঁ," গম্ভীরভাবে রাউল সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্নেহময়ী এলিস, বৃদ্ধা পরিচারিকা সত্যি সত্যিই তরুণী মাদামকে ভালবাসে।

অনেকটা স্বগত ভাষণের মত চাপা গলায় রাউল বলতে লাগল, "সত্যি, সিমোনের মধ্যে একটা অদ্ভুত—আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে। আর সে অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রয়োগও করেছে বারবার। কিন্তু আর নয়। এবার এ ব্যাপারে ইতি টানা উচিত। আমি সিমোনকে ভালবাসি। আমি কি আর ওর ঐ অবস্থা লক্ষ্য করি নি? তুমি মাদামকে ভালবাস এলিস, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তোমার মাদাম যে দিন দিন রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছেন তা আমার নজর এড়ায়নি। আমি সবই জানি। জানি, একজন 'মিডিয়াম'-এর দেহ এবং মনের উপর কি প্রচণ্ড চাপ পড়ে।

সেই দারুণ স্নায়বিক চাপ সহ্য করা খুবই শক্ত। কিন্তু এলিস, একটা কথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। কথাটা হল এই যে তোমার মাদাম প্যারিস শহরের সবচেয়ে শক্তিশালী 'মিডিয়াম'। কিন্তু না, কেবল প্যারিস শহর বলছি কেন, সারা ফরাসী দেশে ক্ষমতার দিক দিয়ে মাদামের সমতুল্য মিডিয়াম আর নেই। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না এলিস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক তোমার মাদামের কাছে আসে। তাঁদের ধারণা এ মিডিয়ামের কাছে কোন ভণ্ডামী বা জালিয়াতি নেই। এখানে এলে তাঁরা ঠকবেন না।

—"মাদামের কাছে ঠকবে?" এলিস তপ্তস্বরে বলল, আমি খুব কমই দেখেছি "আমার মাদামের মত সৎ মেয়ে। উনি শত চেষ্টা করলেও কাউকে ঠকাতে পারবেন না—এমনকি একটা হাবাগোবা বাচ্চাও ঠকবে না তাঁর কাছে।"

—"ঠিকই বলছ তুমি! এক এক সময় মনে হয় তোমার মাদাম যেন এ পৃথিবীর কেউ নয়, ও যেন নেমে এসেছে স্বর্গের নন্দনকানন থেকে। মর্তলোকে নিয়ে এসেছে স্বর্গলোকের অমৃত বার্তা।

এলিস খুশিভরা মুখে তাকিয়ে রইল রাউলের দিকে।—"আচ্ছা এলিস তোমার মাদামকে তো আর মিডিয়ামের কাজ করতে হবে না; এরপর তো তিনি মনের সুখে ঘর-কন্না করবেন। এ খবর শুনে তুমি নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছো?"

এলিস হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। রাউল ভেবেছিল খবরটা শুনে বৃদ্ধা খুবই খুশি হবে। কিন্তু ও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল কেন?

—"কি ব্যাপার এলিস?"

—"একটা কথা ভাবছি," এলিস বলল গম্ভীর মুখে।

—"কি কথা?"

—"মঁশিয়ে, আপনি তো বলছেন মাদাম প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কাজ-কারবার ছেড়ে দেবেন, কিন্তু প্রশ্ন হল প্রেতাত্মারা যদি মাদামকে ছেড়ে না দেয়?"

—"তার অর্থ?"

—"প্রেতাত্মারা যদি না ছাড়ে?"

—"কি বলতে চাইছ তুমি?" একটু অসহিষ্ণু স্বরেই রাউল প্রশ্ন

করল।

—"ব্যাপারটা কি জানেন মঁশিয়ে পরলোকের বাসিন্দাদের নিয়ে বেশী কারবার করলে অনেক সময় তারা আর মিডিয়ামকে ছাড়তে চায় না। আমার ভয় তো সেখানে?

—"আমার তো ধারণা ছিল যে তোমার মধ্যে কোন কুসংস্কার নেই," রাউল বলল।

—"অহেতুক কুসংস্কার আমার মধ্যে নেই মঁশিয়ে, তবে..."

—"তবে কি? তোমার বক্তব্যটা গুছিয়ে বল।"

—"আমি যা বলতে চাই, তা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না মঁশিয়ে। আগে ভাবতাম মিডিয়ামরা হল ধূর্ত এবং প্রতারক। প্রিয়জনের বিয়োগে ব্যথাতুর মানুষদের তারা নানা কৌশলে ঠকায়। কিন্তু মাদামকে দেখে বুঝেছি যে আমার ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। আমার মাদাম সহজ-সরল মানুষ, উনি অত্যন্ত সৎ।"

—"সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই," রাউল বলল।

চাপা গলায় শঙ্কা-বিহ্বল গলায় এলিস বলল, "এখানে যা ঘটে তার মধ্যে কোন কৌশল বা চাতুরী নেই। যা দেখা যায় সত্যি, সত্যিই ঘটে। আর...আর সে জন্যই আমার ভয় হয়...খুব ভয় হয়। মঁশিয়ে, এসব কাজ করা মোটেই উচিত নয়। এ জগৎ আর পর জগতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন প্রকৃতির বিধান নয়। আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করছি—কাজ করছি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অস্বাভাবিক কাজের জন্য একদিন চরম মূল্য দিতেই হবে।

এলিসের দু কাঁধে হাত রেখে রাউল তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল। বলল ঃ

"স্থির হও এলিস, কেন ঘাবড়ে যাচ্ছ? শোন, তোমাকে একটা সুসংবাদ দেই। আজকেই আমাদের শেষ প্রেত-বৈঠক। এরপর আর পরলোক বা ভূত-প্রেত নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না।"

—"একটা বৈঠক আছে আজকেও আবার?" আতংকভরা গলায় প্রশ্ন করল এলিস।

—"হ্যাঁ, এর শেষ বৈঠক এটাই।"

এলিস যে অসন্তুষ্ট হয়েছে, ওর মুখের ভাবে তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

মাথা নেড়ে ও বলল, "কিন্তু মাদাম বোধহয় আজ চক্রে বসতে পারবেন না।"

"কেন ?" স্পষ্ট অসন্তোষের সুর রাউলের কণ্ঠে।

—"মাদাম অসুস্থ, মাথার যন্ত্রণায় তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। আজ চক্রে বসলে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

—"কিন্তু আমরা যে কথা দিয়েছি। শুধু তা-ই নয় আগাম টাকা পর্যন্ত নিয়েছি।"

—"তাতে কি হয়েছে, মিডিয়াম অসুস্থ জানিয়ে দিন। তিনি চক্রে আজ বসতে পারবেন না।"

ওদের কথার মাঝখানে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল এক সুন্দরী নারী, দীর্ঘকায়া, গৌরবর্ণা, ক্ষীণদেহে কমনীয়তা আর লাবণ্যের অভাব নেই, মেয়েটির মুখখানা মহাশিল্পী বতিচেলির আঁকা ম্যাডোনার ছবির মত। উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাউলের মুখ। এলিস তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিবেচনা-বোধ আছে বৃদ্ধার।

—"সিমোন!" আবেগ রাউলের কণ্ঠে।

—"রাউল, প্রিয়তম।"

নিজের দু'হাত বাড়িয়ে রাউল সিমোনের দীর্ঘ শুভ্র হাত দু'খানি ধরল। তারপর দু'বার আদর করল সেই সুন্দর হাত দু'খানিতে। সুন্দরী নারী আবেগভরে মৃদুস্বরে বলতে লাগল রাউল, প্রিয়...প্রিয়তম!"

রাউল আবার ওর সাদা হাত দু'খানিতে তার ঠোঁটের স্পর্শ করল। তারপর ব্যগ্রভাবে তার দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, "সিমোন, তোমার চেহারাটা বড্ড ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, এলিস বলল, তোমার নাকি মাথায় যন্ত্রণা, বললো তুমি বিশ্রাম করছ। তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে ? তুমি কি অসুস্থ ?"

—"না না ঠিক অসুস্থ নই," সিমোন বলল দ্বিধাভরা গলায়।

সিমোনের হাত ধরে সোফার দিকে এগোল রাউল। ওকে সোফায় বসাল। নিজে বসল ওর পাশে, তারপর জিজ্ঞেস করল,

"বল কি হয়েছে তোমার ?"

সিমোনের মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। অস্পষ্টভাবে সে বলল,

—"না না সে কথা শুনলে তুমি আমাকে বোকা মনে করবে।"

—"আমি ? আমি বোকা মনে করব তোমাকে ? কিছুতেই নয়... কখনই নয়। একথা কি করে তুমি ভাবলে সিমোন ?"

রাউলের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল সিমোন, কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে রইল, মেঝের কার্পেটের দিকে ওর দৃষ্টি। তারপর নীচু গলায় দ্রুত বলে ফেলল।

—"ভয় পেয়েছি আমি বড্ড ভয় পেয়েছি, রাউল।"

অপেক্ষা করল রাউল কয়েক মুহূর্ত। ভাবল সিমোন হয়ত আরো কিছু বলবে। কিন্তু যখন দেখল মেয়েটি আর কিছু বলছে না তখন তাকে কিছুটা সাহস আর উৎসাহ দেবার জন্য বলল,

—"ভয়! কিসের জন্য ভয় ? ভয় কাকে ?"

—"জানি না, তবে ভয় পেয়েছি।"

—"কিন্তু কেন ?" বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে রাউল তাকাল সিমোনের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গেই রাউলের প্রশ্নের উত্তর এল। সিমোন বলল তার দিকে তাকিয়ে।

—"জানি তুমি অবাক হবে। কিন্তু আমি যে ভয় পেয়েছি তার মধ্যে এক বিন্দু মিথ্যে নেই। কিসের ভয়...কেন ভয়...কাকে ভয় এসব আমি কিছু জানি না, সব সময়ে এক অজানা আতংকে আমার মনের আকাশকে ছেয়ে ফেলেছে কালো মেঘের মত! মনে হয় একটা ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে আমার জীবনে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, তার উপর এই অজানা আতংক, রাউল, বোধহয় পাগল হয়ে যাব আমি।"

সিমোন শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। নরম হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে রাউল বলল, "না ডার্লিং, কেন এভাবে হাল ছাড়ছ ? এমন করে ভেঙে পড়লে তো চলবে না, তা আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কি হয়েছে। তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। অতি পরিশ্রমের ফলেই এসেছে এই ক্লান্তি। মিডিয়ামের জীবনে এরকম ক্লান্তি আসতেই পারে। তোমার এখন যা দরকার তা হল বিশ্রাম—পরিপূর্ণ বিশ্রাম। আর সেই সঙ্গে চাই মানসিক শান্তি।"

সিমোনের মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল। রাউলের দিকে কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, "তুমি ঠিক কথাই বলেছ রাউল। পরিপূর্ণ

বিশ্রাম আর শান্তি এখন আমার দরকার।

চোখ বুজে রাউলের বাহুমূলে মাথা রাখল সিমোন। নিজের দেহটাকে এলিয়ে দিল রাউলের হাতের উপর।

—"আমি তোমার উপর এমনি করে নির্ভর করতে চাই, একটুখানি সুখ! আমার চাহিদাটা খুব বেশী নয় রাউল" সিমোন বলল অস্ফুটস্বরে।

তাকে আরও কাছে টেনে নিল রাউল, তখনও বন্ধ সিমোনের চোখ দুটি। তার বুক থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘ নিঃশ্বাস। মৃদু কণ্ঠে সে বলল, "রাউল, প্রিয়তম, তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরলে আমি সব কথা ভুলে যাই। ভুলে যাই কি ধরনের জীবন আমাকে কাটাতে হচ্ছে। মিডিয়ামের জীবন বড় দুর্বিষহ—বড় ভয়ংকর। কিন্তু তোমার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়লে এ শঙ্কাতুর জীবনের কথাও আমি ভুলে যাই। তখন নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমার মনে আর কোন সংশয় থাকে না। তুমি তো অনেকটাই জান রাউল, কিন্তু তাহলেও বলব তুমি জানো না মিডিয়ামের জীবনের সবকিছু।"

রাউলের মনে হল তার আলিঙ্গনে বাঁধা সিমোনের শরীরটা যেন ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠেছে, তার সুন্দর দেহ-লতাটিকে একটা আড়ষ্টতা যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

চোখ খুলল সিমোন। সামনের দিকে তাকিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে আপন মনেই সে বলতে লাগল,

'অন্ধকার ঘর ছোট একখানা। আমি বসে থাকি তার মধ্যে। অপেক্ষা করি। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার আমার চারপাশে। বড় ভয়ঙ্কর এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে কেবল শূন্যতা আর শূন্যতা। স্বেচ্ছায় নিজেকে ছেড়ে দিই এই অন্ধকার রাজ্যে। আমার চারপাশে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আরো ঘন হয়ে ওঠে। সেই অন্ধকারে অপেক্ষা করতে করতে আমার চেতনার উপরও ধীরে ধীরে নেমে আসে অন্ধকার। অচেতন হয়ে পড়ি আমি! তারপর যা ঘটে আমি তার কিছুই জানতে পারি না। আমার কোন অনুভূতি পর্যন্ত থাকে না। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে অনেক যন্ত্রণার মধ্যে ফিরে আসে আমার চেতনা, মনে হয় দীর্ঘ ঘুমের পর আমি যেন জেগে উঠলাম, তারপর এক অপরিসীম ক্লান্তিতে

আমার সমস্ত দেহ-মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

—"জানি ডার্লিং, আমি জানি," রাউল বলল নরম গলায়।

—"আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না, সে যে কি ভয়ঙ্কর ক্লান্তি" নিস্তেজ গলায় সিমোন বলল, সিমোনের শরীরটা যেন আরো এলিয়ে পড়ল একথা বলতে বলতে।

—"তোমার তুলনা নেই সিমোন," নিজের দু'হাত দিয়ে সিমোনের হাতদুটো চেপে ধরে রাউল বলল, "তুমি অন্যন্যা! তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়াম এ ব্যাপারে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য তোমার শ্রেষ্ঠতা।"

একটু হেসে মাথা নাড়ল সিমোন নেতিবাচকভঙ্গীতে!

"তুমি মাথা নাড়লে কি হবে, আমি সত্যি কথাই বলছি। এই দেখ..." পকেট থেকে দুখানা চিঠি বার করে রাউল বলল, "এই যে, এই চিঠিখানা এসেছে অধ্যাপক ঘোষের কাছ থেকে আর এই চিঠিখানা লিখেছেন ডক্টর জেনির দু'জনে একই অনুরোধ করেছেন।"

—"কি অনুরোধ?" সিমোন জিজ্ঞেস করল ভীরু গলায়।

—"দু'জনেই অনুরোধ করেছেন মাঝে মাঝে তুমি যেন মিডিয়াম হিসেবে তাদের প্রেত-চক্রে অংশগ্রহণ করো।"

"না—না—না মোটেই না।" সোফা ছেড়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল সিমোন, "কক্ষনো করব না ও কাজ! একটা সীমা আছে সবকিছুরই। এবার এ কাজে ইতি টানব। তুমি...তুমি নিজেও তো আমায় কথা দিয়েছ রাউল।

অবাক হয়ে সিমোনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাউল। সিমোন কাঁদছে ভয়ে, উত্তেজনায়। কোণঠাসা প্রাণীর মত ওকে দেখাচ্ছে। সোফা থেকে উঠে ওর হাত ধরল, যেন সাহস দিতে চাইল ওকে। তারপর আশ্বস্ত করবার সুরে বলল, হ্যাঁ, ও সব প্রেত-চক্রের ব্যাপার-স্যাপার তো শেষই হয়ে গিয়েছে। তোমাকে নিয়ে আমার খুব অহংকার সিমোন, তাই দেখলাম চিঠি দু'খানা।"

সন্দেহের দৃষ্টিতে রাউলের দিকে তাকাল সিমোন, "তা হলে এটাই ধরে নিচ্ছি যে তুমি আর কখনও আমাকে প্রেত-চক্রে বসতে বলবে না।"

—"না না," রাউল আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বলল, "তবে···"

—"তবে কি ?" রাউলকে তার বক্তব্য শেষ করতে না দিয়েই সিমোন প্রশ্ন করল।

"মানে···এসব বিখ্যাত লোকদের জন্য তুমি যদি স্বেচ্ছায় মাঝে মাঝে বসতে রাজী হও তবে।"

—"না না মোটেই না। আমি আর কখনও প্রেত-চক্রে বসব না," উত্তেজিতভাবে বাধা দিল সিমোন, "বিপদ আছে প্রেত-চক্রে বসার মধ্যে। আমি বলছি যে বিপদ বড় ভয়ঙ্কর।"

দু'হাতে নিজের কপাল টিপে ধরল সিমোন, দাঁড়াল গিয়ে জানালার কাছে। রাউলের দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, "আর কখনও আমাকে প্রেত-চক্রে বসতে বলবে না কথা দাও।"

রাউল ওর দিকে এগিয়ে গেল। সিমোনের দু'কাঁধের উপর নিজের হাত দুখানা রেখে কোমল কণ্ঠে বলল, "সিমোন, ডার্লিং কথা দিচ্ছি আজ রাতের পর আর কোনদিন তোমাকে প্রেত-চক্রে বসতে বলব না।"

সিমোন চমকে উঠল। রাউল পরিষ্কার বুঝতে পারল ওর চমকানি।

—"আজ !" ভীরু গলায় সিমোন বলল, "হ্যাঁ, আজকেই তো মাদাম একস্-এর আসবার কথা। আমি তো তাঁর কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।"

রাউল ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, "মাদাম একস্-এর আসবার সময় হয়ে গিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে এখন তিনি এসে যেতে পারেন। কিন্তু সিমোন, তোমার শরীর যদি সুস্থ না থাকে..."

রাউলের কথা যেন শুনতেই পেল না সিমোন। সে তখন নিজের চিন্তাতেই ডুবে গিয়েছে।

"মাদাম একস্ ? সত্যি বলছি রাউল উনি বড় অদ্ভুত মহিলা। আমার ভয় হয় ওঁকে দেখলে। বড় ভয় হয়।"

"সিমোন !"

ভর্ৎসনার সুর বেজে উঠল রাউলের গলায়। সিমোন সে সুরটা ধরতে পারল। রাউলের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, "জানি রাউল, তুমি

অন্য ফরাসীদের মত নও। মা হল অত্যন্ত পবিত্র তোমার কাছে! সন্তান-হারা শোকাকুলা মা সম্পর্কে এরকম ধারণা পোষণ করা যে উচিত নয় তা আমি ভাল করেই জানি। এটা আমাদের নির্বুদ্ধিতা, নিষ্ঠুরতাও বলতে পার। কিন্তু রাউল আমি তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না··· ভদ্রমহিলা এত মোটা···ওঁর গায়ের রঙটা কেমন অদ্ভুত রকমের তামাটে। তার উপর আবার মহিলার হাত দু'খানা···হাত দুটো লক্ষ্য করে দেখেছ? কি বিরাট···কি বলিষ্ঠ হাত দু'খানা! ঠিক যেন পুরুষের হাত। উঃ কি ভয়ানক।"

সিমোন কেঁপে উঠল। চোখ বুজল। কাঁধের উপর থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিল রাউল তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, "তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না সিমোন।

—"কেন?"

—"আচ্ছা তুমি তো একটি মেয়ে আর একজন মেয়ের প্রতি তোমার সহানুভূতি এবং সমবেদনা থাকা উচিত। ভদ্রমহিলা সদ্য সন্তানহারা হয়েছেন। ওঁর একমাত্র সন্তান ঐ মেয়েটিই ছিল। সন্তানহারা শোকাকুলা মায়ের উপর তোমার দয়া হয় না? হওয়া তো উচিত।"

অস্থির হয়ে উঠল সিমোন, অস্থিরভাবেই অঙ্গভঙ্গী করে সে বলল, তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না রাউল। মনের এ আতঙ্ককর অনুভূতি কারো চাওয়া না চাওয়ার উপর নির্ভর করে না। মাদাম একস্‌কে যখন প্রথম দেখলাম তখনই এ আতংকের অনুভূতি আমার মনকে ছেয়ে ফেলল।"

—"কোন বাস্তব ভিত্তি নেই তোমার ধারণার," রাউল বোঝাবার চেষ্টা করল।

অস্থিরভাবে নিজের হাত দু'খানা ছড়িয়ে দিল সিমোন, উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল, "তোমাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না রাউল। তুমি বুঝতেই চাইছ না, আমি আঁতকে উঠি মাদাম একস্‌-কে দেখলে। দারুণ ভয়ে আমার মনটা কুঁকড়ে যায়! তোমার বোধহয় মনে আছে তাঁর হয়ে প্রেত-চক্রে বসতে আমি ইতস্ততঃ করছিলাম—রাজী হয়েছিলাম অনেক পরে। আমার ধারণা হয়েছিল, তার জন্য আমার ভয়ঙ্কর কোন অমঙ্গল হবে। যেমন করেই হোক তিনি জীবনে মহাবিপদকে আহ্বান করে আনছেন।"

রাউল বলল কাঁধ ঝাঁকিয়ে, "আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হয়েছিল। মাদাম একস্-এর জন্য তুমি যে ক'টা প্রেত-চক্রে বসেছ তার সবক'টিই খুব সফল হয়েছে। খুব সহজেই তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল ছোট্ট অ্যামেলির বিদেহী আত্মা। প্রয়াতা অ্যামেলির দেহধারণ-গুলো হয়েছিল অতি চমৎকার। অধ্যাপক রোষ শেষ বৈঠকের সময় যদি উপস্থিত থাকতেন তবে খুব ভাল হত।"

—"দেহ ধারণের কথা বলছ", গলার স্বর নামিয়ে সিমোন বলল, "ব্যাপারটা একটু ভাল করে বলতো রাউল। তুমি তো জান, আমি যখন আবিষ্ট অবস্থায় থাকি তখন বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকি। এই রূপ ধারণের ব্যাপারগুলো কি সত্যি হয়?"

—"হ্যাঁ।"

—"সুন্দর হয় খুব?" সিমোন আবার জিজ্ঞেস করল।

বিপুল উৎসাহে ঘাড় নাড়ল রাউল। বলল, "প্রথম দিকের কয়েকটা প্রেত-চক্রে অ্যামেলিয়াকে দেখা যাচ্ছিল একটা অস্পষ্ট কুয়াশার বৃত্তের মধ্যে। তাকে দেখা যাচ্ছিল না ঠিক পরিষ্কারভাবে। কিন্তু তা একেবারে অকল্পনীয়, শেষ বারে যা হল।

—"কি হলো শেষ বারে?" সিমোনের স্বরে একই সঙ্গে উৎকণ্ঠা আর কৌতূহল।

ধীর গলায় রাউল বলল, "শেষ বারে অ্যামেলি একেবারে রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে এসেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল শিশুটি যেন সত্যিই জীবন্ত! আমি তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করে দেখেছিলাম। কিন্তু দেখলাম তাতে তোমার খুব কষ্ট হয়। মাদাম একস্-ও অ্যামেলিকে স্পর্শ করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে স্পর্শ করতে দেই নি কারণ আমার মনে হয়েছিল যে প্রয়াত সন্তানকে স্পর্শ করবার সুযোগ পেলে সন্তানহারা জননীর ধৈর্যের বাঁধ হয়ত ভেঙে যেতে পারে। তার ফলে নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ত তিনি তোমার কোন মারাত্মক ক্ষতি করে ফেলতে পারেন।

জানলার দিকে মুখ ফেরালো সিমোন। কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, নিস্তেজ গলায়।

যখন জ্ঞান হলো তখন আমি বড় ক্লান্ত। দেহ-মনে তখন আমি

খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি। কিন্তু রাউল, এসব কাজ কি ঠিক হচ্ছে? আমরা কোন অন্যায় কাজ করছি না তো? এলিস কি বলে তা জান?"

"—কি বলে?"

"—ও বলে আমরা নাকি শয়তানের সঙ্গে কাজ কারবার করছি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।"

সিমোন হাসল। কিন্তু কেন যে হাসল তা সে নিজেই বলতে পারে না।

"আমি কি বিশ্বাস করি জানো?" গম্ভীরভাবে রাউল বলল, "অজানাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার মধ্যে সব সময়েই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কাজের পিছনের উদ্দেশ্যটা যদি ভাল হয় তবে বিজ্ঞানের স্বার্থে এটুকু বিপদের ঝুঁকি নেওয়াটা আমি সঙ্গত বলে মনে করি। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—বিজ্ঞানের স্বার্থে বহু লোক জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রাণ দিয়েছে। এটা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। এক যুগের মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অনুপ্রাণিত করে গিয়েছে পরের যুগের মানুষদের। তুমি যে প্রেত-চক্রে বসছ, তা বিজ্ঞানের জন্যই বসছ। তোমার প্রচুর অবদান রয়েছে। জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবার কাজে দীর্ঘদিন একাজ করবার ফলে আজ তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ, এবার তোমাকে কাজের ইতি টানা হবে। আজকেই তোমার শেষ প্রেত-চক্র। এরপর থেকে সুরু হবে তোমার নূতন জীবন।"

রাউলের দিকে তাকাল সিমোন। একটুখানি হাসল, স্নেহের হাসি বলেই মনে হল তার, এতক্ষণে তার উত্তেজনা বোধহয় কেটে গিয়েছে। ফিরে এসেছে আগেকার স্বাভাবিক স্থিরতা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিস্তেজ গলায় সে বলল, "মাদাম একস্-এর আসবার সময় পার হয়ে গিয়েছে। উনি তো দেরী করেন না। আজকে হয়ত আর আসবেনই না উনি।"

—"আমার কিন্তু মনে হয় উনি ঠিকই এসে যাবেন। তোমার ঘড়িটা বোধহয় ঠিক সময় দিচ্ছে না, হয়ত সঠিক সময় থেকে এগিয়ে রয়েছে।"

ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ছোটখাট জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে সিমোন বলল।

কে এই "মাদাম একস্? কি তাঁর সত্যিকারের পরিচয়? এলেন তিনি

কোথা থেকে ? তিনি কোন্ দেশের—কোন জাতের ? তাঁর আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব বলতে কে আছে ?—এর একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারব না আমরা। আসলে কিছুই জানি না আমরা তাঁর সম্বন্ধে। 'মাদাম একস্' তাঁর আসল নাম হতে পারে না। তিনি এসেছেন ছদ্ম পরিচয়ে আমাদের কাছে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "এর মধ্যে আর অবাক হবার কি আছে ? অনেক লোকই মিডিয়ামের কাছে আসল পরিচয় গোপন করেই আসে। এটা করা হয় সাবধানতার জন্যই।"

"—বোধহয় তাই", নিরুত্তাপ গলায় সিমোন বলল। ওর হাতে ছিল একটা ছোট চীনে মাটির ফুলদানী। হঠাৎ সেটা পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সিমোন চমকে সেদিকে ফিরে তাকাল। তারপর রাউলের দিকে ফিরে বলল, "দেখেছো আমার মধ্যে আর আমি নেই ! আচ্ছা রাউল আমি যদি মাদাম একস্‌কে একথা বলি যে, আজ প্রেত-চক্রে বসা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তবে তা কি খুব কাপুরুষতার কাজ হবে ?"

রাউলের মুখে ফুটে উঠল একই সঙ্গে বিস্ময় এবং বেদনাবোধ। সিমোনের মুখখানা লাল হয়ে উঠল তা দেখে।

ধীর গলায় রাউল বলল, "তুমি কিন্তু কথা দিয়াছিলে সিমোন।"

পিছিয়ে গেল সিমোন। তার পিঠ দেওয়াল স্পর্শ করল। আর্তকণ্ঠে সে বলল, "আমাকে মুক্তি দাও রাউল একাজ থেকে।" আমি আর পারছি না...সত্যিই পারছি না...আমি খুব ক্লান্ত।"

রাউলের চোখে ফুটে উঠল নরম ভর্ৎসনার দৃষ্টি। সিমোন আবার গুটিয়ে গেল সে দৃষ্টির সামনে।

রাউল বলতে লাগল, "টাকার জন্য আমি মোটেই ভাবছি না, সিমোন। অবশ্য এই শেষ প্রেত-চক্রের জন্য মাদাম একস্ যে টাকাটা দিতে চাইছেন তার অঙ্কটা বিরাট···।"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সিমোন বলল, "সবকিছু কি টাকা দিয়ে কেনা যায় রাউল ?"

—"নিশ্চয়ই যায় না। আমি একমত এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে। কিন্তু সিমোন, একটা কথা ভেবে দেখ।"

—"কি কথা ?"

—"মনে কর তুমি সত্যিই অসুস্থ নও। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কোন ধনী মহিলার অনুরোধে প্রেত-চক্রে-বসা বা না-বসাটা সম্পূর্ণভাবে তোমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। ভেবে দেখ, মাদাম একস্ একজন মা। এই মা সদ্য সদ্য তাঁর একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছেন। তিনি যদি শেষবারের মত তাঁর সন্তানকে দেখতে চান, তুমি তাঁকে দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে? তুমি এটুকু দয়া দেখাবে না সন্তান-হারা মাকে?"

গভীর হতাশায় সিমোন নিজের হাত দু'খানা ছুঁড়তে লাগল। ও যে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে তা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না।

একটু আত্মস্থ হয়ে নিস্তেজ গলায় ও বললো, "তোমার কথায় বড় কষ্ট পাচ্ছি রাউল। হয়ত তুমি যা বলছ তা-ই ঠিক। তোমার কথামতই কাজ করব আমি। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি কেন এবার বুঝেছি। আমার ভয়ের কারণ হল ছোট্ট একটি শব্দ—আর সে শব্দটি হল 'মা'।"

—"কি বলছ সিমোন!"

—"ঠিকই বলছি। জানো রাউল, প্রকৃতির রাজ্যে কিছু আদমি মৌলিক প্রবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। অবশ্য সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাতৃত্ব—মায়ের প্রবৃত্তি কিন্তু আগের মতই রয়েছে। এ নষ্ট হয়ে যায় নি। এর রূপও পাল্টায় নি। এ ব্যাপারে পশু আর মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার কোন তুলনা নেই পৃথিবীতে। এ ভালবাসাকে আইনের বাঁধনে বাঁধা যায় না। এ ভালোবাসা নির্ভয়ে যে কোন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াতে পারে। এই অন্ধ ভালবাসা নিজের পথে দাঁড়ানো যে কোন বাধাকে নির্মমভাবে—নৃশংসভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে। আমার ভয় এই প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন মৌলিক প্রবৃত্তিটিকে।"

একটানা কতক্ষণ কথা বলে সিমোন হাঁপাতে লাগল। উত্তেজনায় ও ক্লান্তিতে ও কাঁপছে। রাউলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ও। তারপর বলল, "আজ আমি নিতান্ত নির্বোধের মত কথা বলছি—আচরণ করছি, তাই না রাউল?"

সস্নেহে সিমোনের হাত দু'খানি ধরে রাউল বলল, "বুঝতে পেরেছি, দেহ-মনে তুমি খুব ক্লান্ত। যাও, যতক্ষণ মাদাম একস্ না আসেন, একটু বিশ্রাম কর ততক্ষণ। একটু শুয়ে থাক শোবার ঘরে গিয়ে।"

"বেশ", রাউলের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সিমোন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাউল চিন্তায় ডুবে গেল। তারপর বসবার ঘরের দরজা খুলে চলে এল পাশের হলঘরে। ছোট হলঘরটা পার হয়ে এবার সে এল পাশের আর একখানা ঘরে। এ ঘরখানাও আগের ঘরখানারই মত। ঘরের এক প্রান্তে রয়েছে একখানা ছোট ঘর, ঘর না বলে তাকে কুঠুরী বলাই ভাল। কুঠুরীর মধ্যে রয়েছে একখানা বড় হাতলওয়ালা বিরাট 'ইজিচেয়ার'। কালো ভেলভেটের ভারী পর্দাগুলো এমনভাবে সাজান রয়েছে যে ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে এই ছোট ঘরখানাকে ঢেকে ফেলে দেওয়া যায়। আবার প্রয়োজন হলে পর্দার আবরণ সহজেই সরিয়ে ফেলে ছোট কুঠুরী-খানাকে লোক-চক্ষুর সামনে আনা যায়।

ঘর সাজাচ্ছিল এলিস। কুঠুরীর সামনে দু'খানা চেয়ার আর একখানা গোল টেবিল। টেবিলের উপরে একটা খঞ্জনী রয়েছে একটা শিঙে, কয়েকখানা কাগজ আর পেন্সিল।

রাউলকে দেখে এলিস বলল, "মঁশিয়ে, এই কিন্তু শেষ প্রেত-চক্র। আজকের ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে রেহাই পাই।"

'তীব্র তীক্ষ্ণস্বরে কলিংবেল'-টা বেজে উঠল।

—"যাও, দেখ গিয়ে কে এসেছে। মনে হয় মাদাম একস্‌ই এসেছেন।"

"—ঐ মহিলা তো গীর্জায় গিয়ে সন্তানের আত্মার মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করতে পারেন।" এলিস গম্ভীর গলায় অনুযোগের সুরে বলল।

'কলিংবেল'টা আবার যেন আর্তনাদ করে উঠল।

—"যাও, দেখ গিয়ে কে এসেছেন," রাউল বলল আদেশের সুরে।

গজ্‌গজ্‌ করতে করতে এলিস চলে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এল। তার সঙ্গে একজন মহিলা। মহিলার দিকে তাকিয়ে এলিস বলল ঃ

"আপনি একটু বসুন মাদাম। আমার মাদামকে খবর দিচ্ছি যে আপনি এসেছেন।"

মাদাম একস্‌-এর সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য রাউল এগিয়ে গেল। সিমোন ঠিকই বলেছে। ভদ্রমহিলার বিরাট চেহারা। যেমন লম্বা তেমনি মোটা। ওঁর গায়ের রঙ অদ্ভুত রকমের তামাটে। হাত দু'খানা সত্যিই

পুরুষালি। ওঁর পরনে ফরাসী দেশের কালো পোশাক। অত্যন্ত গম্ভীর মহিলার কণ্ঠস্বরও।

"আমার বোধ হয় আসতে একটু দেরী হয়ে গেল", গম্‌গমে গলায় মাদাম একস্‌ বললেন।

হাসি মুখে রাউল বলল, হ্যাঁ, দেরী হল। তবে বেশী নয়, মাত্র কয়েক মিনিট।"

—"মাদাম সিমোন কোথায়?"

—"মাদাম সিমোনের শরীরটা সুস্থ নয়। তিনি শুয়ে আছেন", রাউল উত্তর দিল।

করমর্দনের পর ভদ্রমহিলা হাত সরিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি শক্তভাবে রাউলের হাতটা চেপে ধরলেন। গম্ভীর অথচ তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "ও তাই বুঝি, তা মাদাম সিমোন আজ প্রেত-চক্রে বসতে পারবেন তো?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বসবেন", রাউল দ্রুত উত্তর দিল।

মহিলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর মুখের কালো আবরণটার বাঁধন খুলতে খুলতে একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন।

আপন মনে নীচু গলায় তিনি বলতে লাগলেন, "মঁশিয়ে রাউল, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না এরকম প্রেত-চক্র আমার মনে কত আনন্দের সৃষ্টি করে। অবাক হয়ে যাই আমি। অ্যামেলী আমার একমাত্র সন্তান। সে আমার কাছে নেই আর। কিন্তু মাদাম সিমোন প্রেত-চক্রে বসলে আমি আমার ছোট্ট বাচ্চাকে দেখতে পাই·····কথা বলতে পারি তার সঙ্গে···হয়ত সম্ভব হলে তাকে আমি স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারি।"

দ্রুত কণ্ঠে রাউল বলল, "না মাদাম একস্‌, স্পর্শ করবার চেষ্টা মোটেই করবেন না। আমার স্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া আপনি কোন কিছুই করতে পারবেন না। করলে সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে।"

—"বিপদ হবে আমার?"

—"না মাদাম, বিপদের সম্ভাবনা মিডিয়ামের। প্রেত-চক্রে বিদেহী আত্মার দেহধারণের সময় যা ঘটে বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছে। খুঁটিনাটি বা জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমি সহজভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছি। আপনি মন দিয়ে শুনুন আমার কথাগুলো।"

—"বলুন," মাদাম একস্-এর স্বর গম্‌গম্ করে উঠল।

—"কোন বিদ্রোহী আত্মা যদি স্থূলদেহ ধারণ করতে চায় তবে মিডিয়ামের দেহ থেকে তাকে দেহ ধারণের উপাদান গ্রহণ করতে হয়। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই যে প্রেত-চক্রের সময় মিডিয়ামের সূক্ষ্ম ধোঁয়ার মত বাষ্প বেরোয় মুখ থেকে। এই বাষ্পই ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে প্রেতাত্মার নিখুঁত দেহের সৃষ্টি করে। মিডিয়ামের দেহ থেকে যে সূক্ষ্ম বাষ্প বেরিয়ে আসে তাকে বলে 'এক্টোপ্লাজম্'। যাঁরা প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন তারা বলেন যে এই 'এক্টোপ্লাজম্', মিডিয়ামেরই দেহের অতিসূক্ষ্ম বস্তুকণা। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওজনের সাহায্যে এ জিনিসটা প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ দেহধারী প্রেতাত্মাকে স্পর্শ করলেই মিডিয়ামের দেহে অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। মিডিয়ামের ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারে রূপধারী প্রেতাত্মাকে স্পর্শ করলে। এক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়।

মাদাম একস্ শুনছিলেন রাউলের কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

রাউল আবার বলতে লাগল, "মিডিয়ামের গুরুত্ব কোথায় তা হলেই বুঝতে পারছেন মাদাম। বিদেহী আত্মা দেহধারণই করতে পারে না মিডিয়ামের সাহায্য ছাড়া। মিডিয়াম হল সংযোগের সেতু ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে। যে কোন লোক মিডিয়াম হতে পারে না। কারণ সবার মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণগুলো নেই মিডিয়াম হবার জন্য। এ দুর্লভ ক্ষমতার স্ফুরণ হয় দু' একজনের মধ্যেই।

—"আশ্চর্য! আচ্ছা মঁশিয়ে রাউল, এমন দিন কি আসবে না যখন এই দেহধারণের ব্যাপারটা উন্নতির এমন স্তরে পেঁছিবে যে দেহধারী আত্মা মিডিয়ামের দেহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবে?"

—মাদাম, "এ যে সাংঘাতিক কল্পনা।"

—"সাংঘাতিক! অসম্ভব তো নয়?"

—"সম্পূর্ণ অসম্ভব। বলা যায় এটা একেবারে অসম্ভব অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়েছে তার ভিত্তিতে।"

"কিন্তু আজকের কথাই তো শেষ কথা নয়, আজকে যা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে তা তো সম্ভব হয়ে উঠতে পারে ?"

রাউলকে দিতে হল না এটুকু প্রশ্নের উত্তর। ঘরে ঢুকল সিমোন। ওকে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বিবর্ণ দেখাচ্ছে। তা হলে ও যে অনেকটা সামলে উঠেছে তা বেশ বোঝা যায়।

সিমোন মাদাম একস্-এর সঙ্গে করমর্দন করল। কিন্তু এই হাত মেলাবার সময় সে যে শিউরে উঠল তা লক্ষ্য করল রাউল।

—"শুনে দুঃখিত হলাম যে, আপনার শরীর নাকি ভাল নেই," মাদাম একস্ বললেন।

—"ঠিক আছে ও নিয়ে ভাববেন না।"

—"প্রেত-চক্রে বসতে পারবেন তো আজ ?" প্রশ্ন করলেন মাদাম একস্।

—"নিশ্চয়ই পারব," সিমোন বলল একটু রুক্ষস্বরেই। ওর স্বরের রুক্ষতায় রাউল তো বটেই, মাদাম একস্ পর্যন্ত যেন চমকে উঠলেন।

"তাহলে কাজ সুরু করা যাক," একথা বলে সিমোন ঢুকে পড়ল ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে। বড় হাতলওয়ালা ইজিচেয়ারখানায় বসল গিয়ে।

আচমকা এক অজানা আতংকের তুহিন-শীতল স্রোত যেন বয়ে গেল। রাউলের মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে। সে বলল আবেগের সঙ্গে।

"আজকে তোমার শরীরটা ভালো নেই সিমোন। আজ প্রেত-চক্র বন্ধ থাক। আশা করি মাদাম একস্ কিছু মনে করবেন না।"

—"একি কথা মঁশিয়ে!" ক্রুদ্ধস্বরে মাদাম একস্ বললেন।

—"ঠিকই বলছি আমি," রাউলও দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "অসুস্থ শরীর নিয়ে আজকে চক্রে না বসাই ভাল।"

—"কিন্তু মঁশিয়ে, মাদাম সিমোন তো আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে আজ আমার জন্য শেষবারের মত উনি প্রেত-চক্রে বসবেন," মাদাম একস্-এর কণ্ঠ থেকে একই সঙ্গে ক্রোধ আর ঘৃণা ঝরে পড়ল।

—"ঠিক, আমি কথা দিয়েছি। আর সে কথার খেলাপও আমি করব না," ঠাণ্ডা গলায় সিমোন বলল।

—"এই তো চাই," কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে মাদাম একস্ বললেন। রাউলের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ধীরকণ্ঠে সিমোন বলল, "ভয় পাচ্ছ কেন রাউল ? ভয় পেয়ো না। আমি তো শেষবারের মত প্রেত-চক্রে বসছি।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এই আমার শেষবারের মত কষ্ট পাওয়া। আর··· আর কখনও এই অসহ্য কষ্ট পেতে হবে না আমাকে। এই শেষ····· এই শেষ।"

সিমোনের ইঙ্গিতে রাউল কুঠরির কালো ভারী পর্দাটা টেনে দিল। তারপর জানালার পর্দাগুলো টেনে দিতেই আধো আলো আধো ছায়ার পরিবেশ সৃষ্টি হল ছোট ঘরখানার মধ্যে। মাদাম একস্‌কে একখানা চেয়ারে বসবার ইঙ্গিত করে রাউল অন্য চেয়ারখানায় বসল। মাদাম একস্‌ একটু ইতস্ততঃ করে বলেই ফেললেন কথাটা।

"আমাকে মাপ করবেন মঁশিয়ে, আমি আপনার বা মাদাম সিমোনের সততাকে অবিশ্বাস করছি না। জানি আপনারা দুজনেই অত্যন্ত সৎ। আর এই প্রেত-চক্রের মধ্যেও কোন জালিয়াতী বা কারচুপি নেই। কিন্তু তবুও আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে হতে চাই জার এই জিনিসটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।"

একথা বলে নিজের হাত-ব্যাগ থেকে একটা সরু অথচ শক্ত দড়ি বের করলেন মাদাম একস্‌।

—"মাদাম," রাউল চীৎকার করে উঠল, "এতো অপমান···ভীষণ অপমান!"

—"না, এ হল নিছক সাবধানতা," অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় মাদাম একস্‌ বললেন।

—"না না এ হল অপমান··মারাত্মক অপমান···আপনি আমাদের দু'জনকেই অপমান করেছেন," উত্তেজিতভাবে রাউল চীৎকার করে উঠল।

"মঁশিয়ে রাউল, আপনার আপত্তির কারণ তো আমি বুঝতে পারছি না," বিদ্রূপের সুরে মাদাম একস্‌ বললেন, "আপনাদের চক্রে যদি কোন জালিয়াতি বা কারচুপি না থাকে তাহলে আপত্তি করছেন কেন? আপনাদের মধ্যে যদি কোন ছলনা না থাকে তবে ভয় পাওয়ার তো কোন কারণ নেই।"

দারুণ ঘৃণায় রাউলের মুখ বিকৃত হল। তারপর একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল তার মুখে! মাদাম একস্‌-এর দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপভরা স্বরে সে বলতে লাগল—

—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মাদাম একস্‌, এ ব্যাপারে

আমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। ভয় পাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই এখানে। বেশ তো, যদি আমার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধলে খুশি হতে পারেন, তবে বাঁধুন।"

রাউল ভেবেছিল এই বিদ্রূপের পর মাদাম একস্ আর বাঁধা-বাঁধির মধ্যে যাবেন না। কিন্তু তার ভাবনাটা যে একেবারেই ভুল তা বোঝা গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

মাদাম একস্ অবিচলিত স্বরে বললেন, "ধন্যবাদ মঁশিয়ে", তারপর দড়িটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন রাউলের দিকে।

আচম্বিতে পর্দার পিছন থেকে সিমোনের তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'না না রাউল, মাদাম একস্-এর অপমানকর প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হয়ো না।"

ব্যঙ্গের হাসি হেসে মাদাম একস্ বললেন, "মাদাম সিমোন, আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি।"

—"হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমি ভয় পেয়েছি।"

রাউল চীৎকার করে উঠল, "কি বলছ সিমোন? মাদাম একস্ ভাবছেন আমরা তাঁকে ঠকাতে যাচ্ছি। আমরা জালিয়াত—জোচ্চোর।"

—"আমাকে তো সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে হবে", গম্ভীর কণ্ঠে মাদাম একস্ বললেন।

কাজ সুরু করলেন মাদাম একস্। রাউলকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধলেন খুব শক্ত করে।

—"কেমন এবার খুশি হয়েছেন?"

মাদাম একস্ কোন উত্তর দিলেন না। তিনি যেন রাউলের উপহাস গায়েই মাখলেন না। তিনি ঘরের দেওয়ালগুলি ভাল করে পরীক্ষা করলেন। হলঘরে যাবার দরজাটায় তালা লাগিয়ে চাবিটা খুলে নিলেন। চাবিটা তিনি রাখলেন নিজের কাছেই। তারপর এগিয়ে এসে বসলেন চেয়ারে।

—"হ্যাঁ, এবার আমি তৈরী। প্রেত-চক্র সুরু হোক", যেরকম অদ্ভুত সুরে তিনি কথাগুলো বললেন তা লিখে বোঝান যায় না।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। পর্দার পিছোনে সিমোনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের

শব্দ ক্রমেই ভারী হয়ে উঠতে লাগল। একসময় সে শব্দ প্রবল হয়ে উঠল। তারপর সে শব্দ থেমে গেল। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। তারপর শোনা গেল একটা চাপা গোঁ-গোঁ আওয়াজ। একটু পরে তা-ও থেমে গেল। আবার নিস্তব্ধতা, আচমকা খঞ্জনীটার ঝন-ঝন আওয়াজে নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে শিঙে পড়ে গেল ঘরের মেঝেতে। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন ওটাকে ছুঁড়ে ফেলল। খল খল করে কে যেন হেসে উঠল, মহাবিদ্রূপের হাসি। কুঠরির ভারী পর্দাটা একটু সরে গেল। দেখা গেল মিডিয়াম সিমোনকে। মিডিয়াম চেতনা হারিয়েছে, তার মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর।

হঠাৎ মাদাম একস্ জোরে শ্বাস টানলেন। মিডিয়াম সিমোনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে হাল্কা কুয়াশা। মনে হচ্ছে যেন একটা সরু ফিতে বের হয়ে আসছে সিমোনের ঈষৎ উন্মুক্ত মুখ থেকে।

কুয়াশা ক্রমেই ঘন হতে লাগল। মিডিয়ামের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুকণা, কণাগুলো অতিসূক্ষ্ম। কণাগুলির মধ্যে একটা আলোড়ন উঠেছে। সূক্ষ্মকণাগুলো জমাট বাঁধছে.... ঘণীভূত হচ্ছে। আকার নিচ্ছে। সে আকার একটি শিশুর...একটি বাচ্চা মেয়ের।

"অ্যামেলী...আমার ছোট্ট অ্যামেলী...আমার বাচ্চা আসছে আমার সামনে।" মাদাম একস্ বলে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ফিসফিসে হলেও তীক্ষ্ম।

অস্পষ্ট মূর্তিটা ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। প্রায় অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাউল। এমন নিখুঁত দেহধারণ এর আগে কখনই দেখা যায় নি।

সত্যিকারের রক্ত-মাংসে গড়া একটি জীবন্ত শিশু যেন এসে দাঁড়িয়েছে ঐ ছোট্ট কুঠরিখানার প্রবেশ পথে।

—"মা...মামণি," শিশুর মত কচি গলার ডাক শোনা গেল।

—"আমার মেয়ে...আমার অ্যামেলীসোনা..." চীৎকার করে বলতে বলতে উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে অর্ধেকটা উঠে পড়লেন মাদাম একস্।

—"সাবধান মাদাম, অত উত্তেজিত হবেন না," রাউল চেঁচিয়ে উঠে সতর্ক করলো। দু'খানি ছোট হাত সামনে বাড়িয়ে ছোট্ট অ্যামেলী

আবার ডাকল, "মা...মামণি... ।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ ।"

মাদামের গলা থেকে এক অজানা অদ্ভুত স্বর বেরিয়ে এল । তিনি আবার উত্তেজিতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ।

ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল রাউল, "একি করছেন মাদাম ? বসুন, বসে পড়ুন, নইলে মিডিয়ামের... ।" রাউলের কথায় কান না দিয়ে মাদাম একস্ তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, "আমার একমাত্র সন্তান অ্যামেলী... ওকে আমি বুকে নেব..."

পাগলের মত সামনের দিকে এক পা এগিয়ে গেলেন মাদাম একস্ ।

—"ঈশ্বরের দিব্যি ! নিজেকে সংযত করুন মাদাম । নিজের চেয়ারে বসুন ! বসে পড়ুন এক্ষুনি ।"

রাউল সত্যি খুব ভয় পেয়েছে ।

—"আমার বাচ্চা ! আমি ওকে ধরবই । আমি ওকে কোলে নেবই । কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না ।"

—"সাবধান মাদাম ! আমি আদেশ করছি, আপনি বসে পড়ুন । আর একটি পা-ও এগোবেন না ।"

বন্ধনের মধ্যে রাউলের শরীরটা ছটফট করতে লাগল । বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল । কিন্তু বৃথা চেষ্টা । মাদাম একস্ তাঁর কাজটি বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন করেছেন ।

আসন্ন বিপদের চিন্তায় রাউলের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল । আর্তকণ্ঠে সে চীৎকার করে উঠল, "ঈশ্বরের দিব্যি ! দয়া করে বসে পড়ুন...বসে পড়ুন দয়া করে । মিডিয়ামের কথাটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন...দয়া করে তার কথাটা মনে রাখুন ।"

মাদাম একস্ যেন শুনতেই পেলেন না রাউলের কথা । তিনি যেন একেবারে পাল্টে গিয়েছেন । এক অদ্ভুত আনন্দ আর উন্মাদনার ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখমণ্ডলে । বাচ্চা মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছিল পর্দার ফাঁকে । মাদাম একস্ হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন ।

সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়াম সিমোনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল এক তীব্র আর্তনাদ । অসহ্য যন্ত্রণায় যেন কষ্ট পাচ্ছে মিডিয়াম ।

—"হা ভগবান ! একি সাংঘাতিক ব্যাপার ! এ যে সহ্য করা যায় না

মিডিয়াম যে...”

রুক্ষ গলায় হেসে উঠে মাদাম একস্ বললেন, ‘মঁশিয়ে রাউল, আপনার মিডিয়ামের জন্য আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমি কেবল আমার হারানো মেয়েকে ফিরে পেতে চাই।

—“আপনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন মাদাম। ঐ শিশু এ জগতের নয়। ওকে আর স্পর্শ করবেন না।”

—“স্পর্শ করব না মানে? ওকে যে আমার চাই। আমার দেহের মধ্যে ও তিল তিল করে গড়ে উঠেছে। আমার কাছ থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছিল বাছা। কিন্তু মৃতের রাজ্য থেকে আমার অ্যামেলীসোনা আবার ফিরে এসেছে আমারই কাছে। ও তো মরে যায় নি ও বেঁচে আছে। আমার সোনা আমার কোলে আয়।”

রাউল আবার চীৎকার করে উঠতে গেল! কিন্তু অপরিসীম আতংকে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। একটি শব্দও বেরোল না তার মুখ থেকে।

মাদাম একস্ ভয়ংকর হয়ে উঠেছেন। পৃথিবীর সমস্ত নির্দয়তা, নির্মমতা, আদিম অসভ্যতা যেন মূর্তিমতি হয়ে উঠেছে তাঁর মধ্যে। অন্যের কথা ভাববার মত মানসিকতা আর তাঁর মধ্যে নেই। নিজের অন্ধ আবেগেই তিনি মত্ত।

শিশু অ্যামেলীর দু ঠোঁট ফাঁক হলো। তৃতীয়বারের মতো শোনা গেল কচি গলার ডাক, “মা...মামণি!”

—“ও আমার সোনা....ও আমার মণি কে বলে তুই মরে গিয়েছিস! ...আয় আয় আমার কোলে আয়...আমার ভাঙা বুকখানাকে জুড়ে দে....”

উন্মাদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন মাদাম একস্ পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে এল অসহ্য যন্ত্রণার এক দীর্ঘায়িত আর্তনাদ।

রাউল চীৎকার করে উঠল। “সিমোন...সিমোন।” অবাক দৃষ্টিতে রাউল দেখল শিশুটিকে কোলে নিয়ে মাদাম একস্ দ্রুত তার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। শব্দ শোনা গেল তালা খুলবার। কিছুপরে শোনা গেল সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ। মাদাম একস্ দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে

নীচে নেমে গেলেন।

পর্দার ওপাশ থেকে তখনও আর্তনাদ ভেসে আসছে। অসহ্য যন্ত্রণা ছাড়া এরকম আর্তনাদ কেউ করে না। রাউল তাঁর জীবনে কোনদিন শোনে নি। ক্রমে মিলিয়ে গেল আর্তনাদ। শোনা গেল একটা বিশ্রী-বিভৎস ঘড় ঘড় শব্দ। তারপর ধপাস করে একটা শব্দ শোনা গেল। শব্দটা দেহপতনের।

রাউল উন্মাদের মত দেহের বাঁধন খুলবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তার উন্মত্ত চেষ্টার কাছে মাদাম একস্-এর কঠিন বাঁধনও হার স্বীকার করতে বাধ্য হল। রাউল অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল। সে মুক্ত হল শক্ত বাঁধন থেকে।

রাউল উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই এলিস ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকে চীৎকার করে উঠল, "মাদাম....মাদাম! গলা চিঁরে, "সিমোন!" রাউলের ডাকটা বেরিয়ে এল।

কালো পর্দাটার দিকে দু'জন ছুটে গেল। সরিয়ে দিল পর্দাটা একটানে। চমকে গিয়ে তক্ষুণি পিছিয়ে এল রাউল। "হায় ভগবান! রক্ত এত রক্ত! উদ্‌ভ্রান্তভাবে সে বলে উঠল, জায়গাটা যে লালে লাল হয়ে গিয়েছে।"

রাউলের পাশে এলিসের রুক্ষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে স্বর ভয়ে বিস্ময়ে এবং উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে।

"তা হলে আমার মাদামকে জীবনটাই দিতে হল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু মঁশিয়ে রাউল সত্যি করে বলুন কি হয়েছে? কি করে মাদাম এতটুকুন হয়ে গেলেন। তাঁর দেহটা যে ছোট হয়ে গিয়েছে—অর্ধেকেরও বেশী ছোট হয়ে গিয়েছে। এ হল কি করে? কি কাণ্ড হচ্ছিল এখানে। বলুন... বলুন বলুন মঁশিয়ে।"

"জানি না! উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠল রাউল, "আমি জানি না।...আমি কিছু জানি না। একি হল। এ কি করলাম আমি...হায় ভগবান! মৃত্যুপুরীর বাসিন্দাকে জীবনলোকে নিয়ে এসে সিমোন নিজেই যে মৃত্যুপুরীতে চলে গেল! এলিস আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। জানি না আমি...সিমোন...সিমোন!...কিছু জানি না!

———

কঙ্কাল

মপাসাঁ

আমার প্রণয়িনী বাড়ীতে আসে একদিন বৃষ্টি ভিজে।

তারপরই তার সর্দি লেগে কাশি হয়। বেঘোরে জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে।

ডাক্তার নিয়ে আসি। ডাক্তার পরীক্ষা করে ওকে ওষুধ দেয়। কিন্তু কিছুতেই ভালো হয় না। সে আমাকে ছেড়ে চলে যায় একদিন।

আমাদের দুজনের মধ্যে এমন একটা মিলমিশ ভাব ছিল যে, আমরা থাকতে পারতাম না একে অন্যকে ছেড়ে।

সেই জন্যই, আমার মনে খুবই আঘাত হানে। এই নিদারুণ ঘটনায় ওর পারলৌকিক কাজকর্ম শেষ করে আমি বেরিয়ে পড়ি দেশান্তরে। অনেকদিন অনেক দেশ ঘুরে সবে বাড়ীতে ফিরে এসেছি গতকাল।

নিজের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের নানান স্মৃতি। নিজেকে আয়ত্বের মধ্যে আমি যেন রাখতে পাচ্ছি না।

অনেক সময় মনে হয় জানালা দিয়ে বাড়ীর নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ি। রেহাই পাই জীবনের সব জ্বালা থেকে।

এক সময় অসহ্য হয়ে আমি আমার মাথার টুপিটা তুলে নিই। বাড়ী থেকে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবি।

কিন্তু আমি থমকে দাঁড়াই হল-ঘরের সামনে এসে। হল-ঘরের একদিকে একটা প্রমাণ সাইজের আয়না আছে! ও যখন বাইরে কোথাও যেত, তখন এই আয়নাটায় নিজেকে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো।

আয়নার সামনে এসে আমি যে কি রকম হয়ে যাই। আয়নার ভেতরে ভেতরে আমি আমার প্রিয় প্রণয়িনীকে দেখতে পাই। ঠিক যেমন আগে দেখতে পেতাম।

সবটাই আমার কাছে অসহ্য লাগে। আমি অতিকষ্টে হলঘর থেকে বার হই! প্রায় এক রকম দৌড়ে আমার প্রণয়িনীর দেহটা যে কবরখানায় কবর দেওয়া হয়েছে, সে কবরখানায় যাই।

আমার প্রণয়িনীর কবরটা বের করতে বেশী সময় লাগে না। কবরের ওপরে একটা সাদা ক্রুশচিহ্ন ও কয়েকটা কথা লেখা আছে। লেখাগুলো হল "ও আমাকে ভালবেসেছিল। আমার কাছ থেকে ভালবাসা পেয়েও ছিল। অকালে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।"

সমাধি বেদীর ওপরে আমি বসে পড়ি। যখন মনে হয়, এতদিনে হয়ত তার দেহখানা প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। আমি নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারি না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি।

এভাবে কতক্ষণ যে আমি কবরের বেদীর ওপরে বসে কেঁদেছি, তা আমার মনে পড়ে না।

হঠাৎ এক সময় মনে পড়ে দিনের আলো কমে এসেছে। অন্ধকার পৃথিবীর ওপরে অধিকার বিস্তার করতে ব্যগ্র।

আমার মন চায় না সে সময় আমার প্রণয়িনীর কবর থেকে চলে যেতে। সারারাত এখানে বসে চোখের জলে কবরের বেদীটা ভিজিয়ে দিতে মন চায়।

কিন্তু সমস্যা হল, সন্ধ্যের পর আমাকে কবরখানায় থাকতে দেবে না কবরখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি।

আমার মন আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এতবেশী কঠিন হল যে, আমি ছলে বলে কবরখানায় রাত কাটাবার কথা ঠিক করে ফেলি।

আমার প্রণয়িনীর কবর থেকে উঠে দাঁড়াই। কবরখানার রাস্তা দিয়ে অন্যান্য কবর দেখতে এগোই।

এক সময় কবরখানার শেষ প্রান্তে এসে পড়ি। এখানকার কবরগুলো প্রাচীন। এতদিনে মৃত ব্যক্তির সামান্যতম অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। এখন এখানে অযত্নে গোলাপের ও বিশাল কালো সাইপ্রাসের জঙ্গল। কবরের ওপরকার ক্রুশ চিহ্নটা কালের করাল আক্রমণে প্রায় ক্ষয়ে গেছে। আগামী-দিনে হয়ত নূতন মৃতদেহ এই পুরাতনের অস্তিত্ব মুছে দেবে। নূতনের জয়যাত্রা শুরু হবে।

আমি আর সময় নষ্ট করি না। সবুজ গাছের ঝোপের মধ্যে হামা-গুড়ি দিয়ে ঢুকি। জাহাজ ডুবির পর ভাসমান জাহাজের যাত্রীরা যেমন এক টুকরো কাঠ পেলে তা ধরে নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা করে, ঠিক সেরকম করে আমিও একটা মোটা গাছকে প্রাণপণে জড়িয়ে তার সঙ্গে মিশে যেতে চেষ্টা করি।

ধীরে ধীরে অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। চারিদিক অন্ধকার চাদরের আড়ালে ঢেকে পড়ে। আমি আমার আত্মগোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে আসি। দুপাশের কবরের মাঝখানের পথ ধরে পায়চারি করি।

অনেকক্ষণ ধরে কবরখানায় একলা ঘুরে বেড়াই। কিন্তু কখনই আমার প্রিয় প্রণয়িনীর কবরটা বের করতে পারি না।

অন্ধকারে অন্ধের মত দুহাত সামনে বাড়িয়ে কবরের মধ্যে এগোই। কবরের ওপরে রাখা ক্রুশ ইত্যাদিতে আমার হাতে, পায়ে, বুকে, এমন কি মাথায় পর্যন্ত আঘাত পাই। তবুও আমি আমার প্রণয়নীর কবর বের করতে পারি না।

তবুও আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকে না অন্ধের মত কবরের ওপরকার খোদাই করা ফলকের অক্ষরের ওপর হাত বুলিয়ে ফলকে কি লেখা আছে পড়তে চেষ্টা করি।

স্বভাবতঃই সকলের বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, সে রাতটা আমার কাছে কতই না ভয়ঙ্কর?

আকাশে চাঁদ না থাকায় ক্রমে সবটাই আমার কাছে অন্ধকার হয়ে

এল। আমি মনে মনে বেশ ভয় পেলাম। দুদিকে সারি সারি কবরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যে করব তা ভেবে পাই না।

এক সময় একটা কবরের বেদীর ওপরে বসে পড়ি। কেননা, ক্লান্তি আমাকে গ্রাস করতে চাইছে। আমি আর হাঁটতে পাচ্ছি না। আঘাতপ্রাপ্ত হাতে বেশ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।

চারিদিক এত নিঃস্তব্ধ যে আমি আমার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনের ধ্বনি শুনতে পাই।

হঠাৎ এক সময় কবরখানায়, আমার খুব কাছে একটা শব্দ হয়। শব্দটা যে কিসের তা আমি বুঝতে পারি না। এ রকম শব্দ যে আগে কোনদিন শুনেছি তা মনে করতে পারি না।

একবার মনে হয়, এই শব্দটা হয়ত অন্য কোথাও হয়েছে। ভীত-সন্ত্রস্ত মনে, মনে হচ্ছে যে, শব্দটা কবরখানায় হচ্ছে।

তবুও আতঙ্ক দৃষ্টি নিয়ে কবরখানার চারিদিকে তাকাই। দেখতে দেখতে আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসে। শরীর প্রায় মৃত মানুষের মত ঠাণ্ডা হয়। চিৎকার করে কারও সাহায্য পেতে চাই। কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে অব্যক্ত শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হয় না। আমি মনে প্রাণে মৃত্যুর জন্য তৈরী হতে থাকি।

কতক্ষণ যে এভাবে কবরের ওপর বসেছিলাম, তার খেয়াল আমার নেই।

হঠাৎ এক সময় আমার মনে হয় যে, আমি যে কবরের ওপরকার মার্বেল পাথরের বেদীর ওপরে বসেছিলাম, সে পাথরটা আস্তে আস্তে নড়ছে। কেউ যেন ওটাকে ওপরে তোলার চেষ্টা করছে।

এ অবস্থায় আমার অজান্তে আমি এক লাফ দিয়ে পাশের কবরের বেদীর ওপরে গিয়ে পড়লাম। ছেড়ে আসা পাথরটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করি।

এবার আমি স্পষ্ট দেখতে পাই যে, সেই মার্বেল পাথরটা আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠছে!

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটি উলঙ্গ কঙ্কালকে দেহটাকে নীচু করে পাথরটাকে ওপরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে দেখি।

সেই কবরের ক্রুশ চিহ্নে লেখা আছে, "এখানে যে ভদ্রলোক শুয়ে

আছেন তার নাম জ্যাক আলিভ্যাঁ। তিনি মাত্র একান্ন বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি নিজের পরিবারের প্রত্যেককে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন! তিনি দয়ালু ও সম্মানীত ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বরের অশেষ করুণায় তিনি মুক্তিলাভ করেছেন।"

কঙ্কালটি কবরের ওপরকার ফলকটিতে খোদাই করা লেখাগুলো পড়ে রাস্তা থেকে ছুঁচলো একটা পাথরের টুকরো নেয়। অশেষ ধৈর্য্য সহকারে ফলকের ওপরকার লেখাগুলো তুলে ফেলতে চেষ্টা করে। এক সময় খোদাই করা লেখাগুলো পাথরের ফলকের উপর থেকে মুছে যায়।

এবার কঙ্কালটি ছোট ছেলেদের মত চক্‌মকি পাথরে আলো সৃষ্টি করে ফলকের ওপরে লেখে। "এখানে প্রকৃত বিশ্রাম করছেন জ্যাক অলিভ্যাঁ। তিনি একান্ন বছর বয়সে মারা যান। পিতার সম্পত্তির মালিকানার জন্য তিনি তাঁর পিতাকে হত্যা করেন। নিজের পতিব্রতা স্ত্রীকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দিয়েছেন। সন্তানদের কষ্ট দিতে ছাড়েন নি। এ ছাড়াও প্রতিবেশীদের প্রতারণা করেছেন। সুযোগ পেলেই তিনি করতেন। শেষে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে তিনি মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হন।"

এরপর কঙ্কালটা নিজের কবরের ফলকের সামনে দাঁড়ায়। নিজের লেখা বেশ মনোযোগ সহকারে পড়ে।

তার পরেই পেছন ফিরে অন্যান্য কবরগুলো দেখি।

দেখি সব কবরের ওপরের বেদী খোলা। প্রত্যেকটি কবর থেকে মৃতদেহগুলো বেরিয়ে পড়েছে। তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা যা লিখেছিল, তা মুছে ফেলে। তার পরিবর্তে প্রকৃত সত্য কথা লেখে।

তাকিয়ে দেখি প্রতিটি ফলকে, তার প্রতিবেশীদের কষ্ট দিয়েছে প্রায় প্রত্যেকটি মৃতদেহই। অসাধু ও ভণ্ড। তারা যা করেনি এমন কোন কাজ নেই।

এসব দেখে আমার মনে হয় আমার প্রণয়িনীও নিশ্চয়ই তার জন্য কিছু লিখেছে।

এরপর ভয়ডর দূর হয় আমার মন থেকে। আমি মৃতদেহের পাশ

কাটিয়ে আমার প্রণয়িনীর কবর খুঁজতে শুরু করি।.....

এক সময় আমি দেখতে পাই কাপড়ে মুখ ঢাকা আমার প্রণয়িনীকে। মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকলেও আমি পেছন থেকে আমার প্রণয়িনীকে চিনতে পারি। খুব দ্রুত পায়ে আমি আমার প্রণয়িনীর কবরের ওপরকার ফলকের দিকে ছুটি।

কে যেন মুছে ফেলেছে সে ফলকে আগে যা লেখা ছিল। সেখানে আমার প্রণয়িনীর হাতের লেখার মত কে যেন লিখেছে, "একদিন মুষলধারে বৃষ্টিতে আমি বাড়ী থেকে বেরোই নিজের প্রেমিককে প্রতারণা করার জন্য। যার ফলে প্রচণ্ড সর্দির প্রকোপে আমার মৃত্যু হয়।"

আমি মনে করতে পারি না তার পরের ঘটনা।

কবরখানার কর্মচারী পরের দিন আমাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখতে পায় আমার প্রণয়িনীর কবরখানার ওপরে।

———

ভুতুড়ে মাঠ

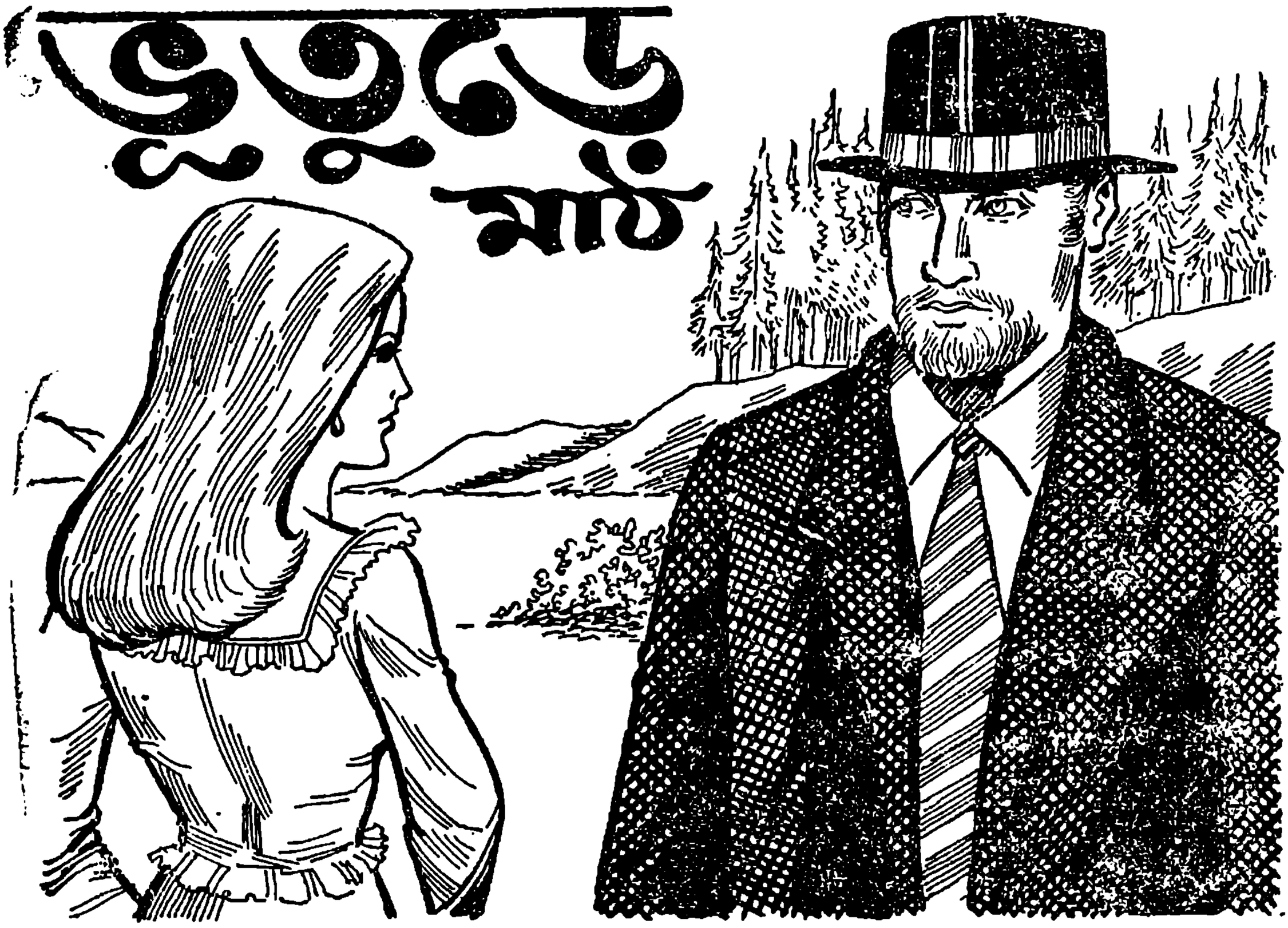

ড্যানিয়েল ডিফো

এই লন্‌চেস্টন শহরে এই বছরের গোড়ার দিকে একটা রোগ দেখা দিল আর তাতে মারা গেল আমার কয়েকটি ছাত্র। এই রোগে যারা মারা গেল তাদের মধ্যে একজন হল ট্রেহাস্‌-এর এডোয়ার্ড ইলিয়ট, জন ইলিয়ট এস্কোয়ারের বড় ছেলে। ছেলেটির বয়স বছর ষোল, কিন্তু অসাধারণ ক্ষমতা ও বুদ্ধির অধিকারী। ১৭৬৫-র ২০শে জুন তারিখে বিশেষ অনুরোধে আমিই পৌরহিত্য করলাম তার অন্ত্যেষ্টিকার্যে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই যুবকটির সম্পর্কে কিছু প্রশংসার কথা আমি বললাম ; উদ্দেশ্য, যারা তাকে জানত তাদের কাছে তার স্মৃতি যাতে প্রিয়তর হয় এবং যে-সব ছাত্র তার সঙ্গে স্কুলে আসত আর তারপরেও যারা স্কুলে আসবে, তাদের সকলের কাছেই সে যেন দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকে। গীর্জার একজন প্রবীণ ভদ্রলোক খুবই অভিভূত হয়েছিলেন আমার কথাগুলি শুনে। বক্তৃতায় ভার্জিলের যে উক্তিটি আমি ব্যবহার করেছিলাম তাকে বার বার সেটি আবৃত্তি করতে শোনা গেল সেদিন সন্ধ্যায়।

"Et peur ipse fuit cantari dignus"

এই ছাত্রটির ব্যাপারে গম্ভীর ভদ্রলোকটির এতটা অভিভূত হবার কারণ সম্পর্কে তিনি তাঁর নিজের একটি ছেলে সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। একই বয়সী ছেলেটি, কয়েক মাসের বড় ; মিঃ ইলিয়টের চরিত্রের যে বিবরণ আমি দিয়েছি তার ছেলেটিও তার অযোগ্য নয়। তাকে নিয়ে এখন বাবা-মার সব আশা-ভরসা একেবারেই নষ্ট হতে বসেছে একটা বিচিত্র দুর্ঘটনার ফলে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলে আমি গির্জার বাইরে আসামাত্রই এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমাকে ডাকলেন ; এবং অস্বাভাবিক আগ্রহাতিশয্যের সঙ্গে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর করে সেই রাতেই আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন। আর মিঃ ইলিয়ট যদি মাঝখানে পড়ে না বলতেন যে সারাটাদিন আমি তার সঙ্গে কাটাব বলে কথা দিয়েছি এবং কোনমতেই তিনি সে কথার নড়চড় হতে দেবেন না, তাহলে হয়তো সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির হাত থেকে আমি কিছুতেই রেহাই পেতাম না।

এর ফলে তখনকার মত ছাড়া পেলাম বটে, বাধ্য হয়ে আমাকে কথা দিতে হল যে তার বাড়িতে গিয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করব পরবর্তী সোমবারে। তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন তখনকার মত, কিন্তু সোমবার আসার আগেই তিনি নতুন করে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলেন, সম্ভব হলে আমি যেন রবিবারেই সেখানে যাই। সেটা আমার পক্ষে সুবিধা হবে না এবং আমার নিজের লোকজনের প্রতি আমার কর্তব্যের দিক থেকেও সেটা অসুবিধাজনক—এই কথা বলে তার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাকেও ঠেকিয়ে দিলাম।

কিন্তু ভদ্রলোক সেখানেই থামলেন না ; একটা চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন, আমি যেন বন্ধ না করি কোন কারণেই সোমবারে যাওয়াটা এবং এমনভাবে কাজকর্মের ব্যবস্থা করে যাই যাতে অন্তত দু' তিনটে দিন তার সঙ্গে কাটাতে পারি। বিনা কারণে এত আগ্রহ এবং যাওয়ার জন্য এত তাড়ার বহর দেখে সত্যি আমি বিস্মিত হলাম ; মনে সন্দেহ দেখা দিল যে এত অতি-ভদ্রতার অন্তরালে নিশ্চয় কোন অভিসন্ধি আছে। কারণ এই ভদ্রলোক বা তার পরিবারের সঙ্গে আমার কোনরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল না ;

এমন কি সাধারণ পরিচয়টুকুও নয় ; হঠাৎ কোথা থেকে এই বন্ধুত্বের উচ্ছ্বাস গজিয়ে উঠল তাও ভেবে পেলাম না।

কথামত সোমবার সেখানে গেলাম এবং আমন্ত্রণ যেরকম উচ্ছ্বাসপূর্ণ ছিল অভ্যর্থনাও পেলাম তদনুরূপ প্রচুর ও পরিপূর্ণ। সেখানে একজন প্রতিবেশী পাদরির সঙ্গেও দেখা হল। তিনি হঠাৎ এসে পড়ার ভান করলেও পরবর্তী ঘটনা থেকে আমার অন্যরূপ ধারণাই হল। ডিনারের পরে ভদ্রলোকটি আমাকে বাগান দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে বেড়াতে বেড়াতেই তিনি আমার কাছে এই পুরো ব্যাপারটির প্রথম রহস্যটি উদ্ঘাটন করলেন।

প্রথমে তিনি সাধারণ পরিবারের দুর্ভাগ্যের বিবরণ দিয়ে শুরু করলেন, তারপরে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছোট ছেলের কথা উল্লেখ করলেন। ওকে নিয়ে সকলের কত আশা ছিল, ছেলেটি কত ফূর্তিবাজ ছিল ; কিন্তু ইদানীং কেমন যেন মন-মরা আর আধভোলা হয়ে পড়েছে। তখন থেকেই কেমন যেন কান্নাকাটি করে, যুক্তি-বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলছে ; কারণ, সে নিজেই বলেছে, তাকে নাকি ভূতে পেয়েছে ; সে জোর দিয়েই বলে যে, একটা বিশেষ পথ দিয়ে যতবার সে স্কুলে যায় ততবারই এখান থেকে আধ মাইল দূরের একটা বিশেষ মাঠে তার সঙ্গে একটা ভূতের দেখা হয়।

আমাদের কথার মাঝখানেই বুড়ো ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী এসে হাজির হলেন। পাদরিটিও সামনের কুঞ্জবনটি দেখিয়ে আগেকার কথাই বলতে শুরু করলেন, আর তারাও তার বক্তব্যকে সমর্থন করে বিস্তারিতভাবে আরও অনেকক্ষণ ধরে সব কথাই আমাকে শোনালেন। অবশেষে তারা তিনজনই এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য ও পরামর্শ চাইলেন।

তাদের বক্তব্য সম্পর্কে হঠাৎই কোনরকম মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না ; শুধু এইটুকু বললাম যে ছেলেটি তাদের যা বলেছে সেটা অদ্ভুত হলেও অবিশ্বাস্য নয়, আর এবিষয়ে এক্ষণি আমি কিছু ভাবতে বা বলতে পারছি না ; কিন্তু ছেলেটি যদি আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে এবং আমার পরামর্শ শোনে তাহলে পরদিন তাদের আমার মতামত জানাতে পারব বলে আশা করি।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম, এই দম্পতিটি আমার জন্য যে জালটি পেতে রেখেছিল আমি তার মধ্যেই পা দিয়ে ফেলেছি ; বৃদ্ধা

মহিলাটি তার অধৈর্যকে মোটেই চেপে রাখতে পারলেন না, তখনই ছেলেকে ডেকে আবার প্রস্তাব করে বসলেন। বাধ্য হয়েই সে প্রস্তাব মেনে নিয়ে সম্মতি জানালাম, আর মহিলাটিও আমাদের ফেলে নিকটবর্তী একটি বাগানে গিয়ে নিজেই ছেলেকে সঙ্গে করে এনে আমার হাতে তুলে দিলেন।

তিনজনের বক্তব্যের একটাই মূল সুর: তারা আমাকে বোঝাতে চাইলেন, হয় ছেলেটি আলস্যপরায়ণ এবং যে কোন ছুতো করে স্কুল পালাতে চায়, অথবা কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছে, কিন্তু সেটা স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছে অথবা বাবার উপর চাপ দিয়ে কিছু টাকা ও নতুন জামাকাপড় বাগাবার তালে আছে, যাতে লণ্ডনে তার যে দাদা থাকে তার কাছে পাড়ি জমাতে পারে; তাই তারা আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন আসল ব্যাপারটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি এবং তদনুযায়ী ছেলেটিকে এসব করা থেকে নিবৃত্ত করি, সৎপরামর্শ দেই, বা তিরস্কার করি, মোট কথা, যেভাবেই হোক তার মাথা থেকে এই ভূত-প্রেতের চিন্তাটা যেন দূর করে দিই।

অচিরেই যুবকটির সঙ্গে একটি গোপন বৈঠকে বসে গেলাম। প্রথমেই সে যাতে আমার প্রতি বিরূপ না হয় সে বিষয়ে সতর্ক হলাম, মিষ্টি কথায় মন ভিজিয়ে তার মনের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করলাম, কারণ আমার সন্দেহ ছিল যে সে হয়তো আমাকে বিশ্বাস করবে না, বা মুখই খুলবে না। কিন্তু প্রথম পর্বটা পার হয়ে আসল কাজের কথা শুরু করার আগেই বুঝে ফেললাম যে তার মনের মধ্যে ঢুকতে কোনরকম কৌশল অবলম্বনের দরকারই হবে না; কারণ বেশ অনুগতভাবেই সে খোলাখুলিই বলল যে সে তার পুঁথিপত্রই ভালবাসে এবং একটি ভাল ছাত্র হওয়া ছাড়া আর কিছুই চায় না; তার মা যাই বলুক, কোন মেয়েছেলের প্রতিই তার কোন টান নেই; বাবা মার কাছে তার শুধু একটাই অনুরোধ 'হায়ারভ্রুম কোয়ার্টলস্'-এর মাঠে যে স্ত্রীলোকটি তাকে বিরক্ত করছে তার সম্পর্কে বার বার সে যা বলছে সেকথা তারা বিশ্বাস করুক। অনেক চোখের জলে ভেসে সে একেবারে খোলাখুলিই আমাকে বলল যে, তার বন্ধুরা তার প্রতি নিষ্ঠুর ও অন্যায় ব্যবহার করছে; তারা তার কথা বিশ্বাস করে না, তার প্রতি কোন সহানুভূতি দেখায় না; যে কেউ আমার সঙ্গে একবার

ব্যাপারটা যে সত্য সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে।

সে ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে আমি তার প্রতি সহানুভূতিশীল, তার কথাগুলি মন দিয়ে শুনছি, আর সে তাই বলতে লাগল ঃ

"যে স্ত্রীলোকটি আমাকে দেখা দেয় সে এখানে আমার বাবার প্রতিবেশী ছিল ; মারা গেছে আট বছর আগে ; নাম ডরথি ডিংলে ; এইরকম উঁচু, এইরকম বয়স, আর এই রকম গায়ের রং। সে কখনও আমার সঙ্গে কথা বলে না, তাড়াতাড়ি আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, সব সময়ই ফুটপাথটা আমাকে ছেড়ে দেয়, এবং মাঠটা পার হবার মধ্যে সাধারণত দু'বার কি তিনবার আমাকে দেখা দেয়।

'ব্যাপারটা নজরে এল এইভাবে মাস দুই চলার পরে ; মুখের আদলটা মনে থাকলেও তার নামটা তখন মনে পড়েনি ; কাজেই এই নিয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়ে ধরে নিয়েছিলাম যে এই স্ত্রীলোকটি হয় তো কাছাকাছি কোথাও থাকে, আর তাকে এই পথ দিয়ে চলাফেরা করতে হয় মাঝে মাঝেই। আমার মাথায় আসেই নি অন্যরকম কোন কল্পনা। কিন্তু ক্রমে সকালে ও সন্ধ্যায় অনবরত তার সঙ্গে আমার দেখা হতে লাগল। সব সময়ই ঐ একই মাঠে, আর অনেক সময় মাঠটা পাড়ি দেবার পথেই দুই কি তিন বার করে।

"প্রায় এক বছর আগে, এই স্ত্রীলোকটির প্রতি প্রথম আমার নজর পড়ল, তখনই আমার সন্দেহ হল, বিশ্বাস হল যে এটা একটা ভূত ; কিন্তু তাতে ভয় পাবার ছেলে আমি নই ; ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন নিজের মনের মধ্যেই চেপে রাখলাম, ভাবলাম অনেক। অনেক সময় তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনও জবাব পাই নি। তারপর আমি পথটাই বদলে ফেললাম ; স্কুলে যেতে লাগলাম আণ্ডার হর্স রোড ধরে ; আর তখন সেও আমাকে দেখা দিত কোয়ারি পার্ক ও নার্সারির মাঝখানের সরু গলিটাতে। সেটা তো আরও খারাপ ব্যাপার।

"শেষ পর্যন্ত আমার ভয় করতে লাগল ; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম অনবরত, হয় এর হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও, আর না হয় তো ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও। মূর্তিটা সব সময় আমার মনের মধ্যে ছুটে বেড়ায় রাতে ও দিনে, নিদ্রায় ও জাগরণে। ধর্মগ্রন্থের এই জায়গাটা আমি বার বার আবৃত্তি করি 'স্বপ্নে তুমি আমাকে ভয় দেখাও আর অপচ্ছায়া দেখিয়ে সন্ত্রস্ত কর।' 'সকালে তুমি বলবে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন যদি সকাল হত ;

কারণ মনের ভয় থেকেই তোমার ভয়ের জন্ম, আর চোখের দৃষ্টির জন্যই তুমি সব কিছু দেখতে পাও।'

ধর্মগ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশগুলিকে তার অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগ করার ব্যাপারে ছেলেটির সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমি খুব খুশি হলাম; তাকে আরও সব কথা বলতে বললাম।

সে বলতে লাগল ঃ "ধীরে ধীরে আমি এতদূর মনমরা হয়ে পড়লাম যে সে বাড়ির সকলেরই চোখে পড়ল; তারপর নানা প্রশ্নের জবাবে আমার ভাই উইলিয়ামকে ব্যাপারটা বললাম। গোপনে সে বাবা ও মাকে কথাটা জানাল, আর তারাও কথাটা নিজেদের মধ্যেই চেপে রাখল কিছু দিন পর্যন্ত।

"একটি মাত্র ফল হল এই জানাজানির; তারা কখনও আমাকে দেখে হাসে, কখনও বকে, কিন্তু সব সময় স্কুলে যাবার হুকুম করে এবং এই সব আবোল-তাবোল ধারণা মাথা থেকে দূর করতে বলে। ফলে আমি প্রায়ই স্কুলে যেতাম, আর সব সময়ই পথে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা হত।"

বাগানে বসে এই কথা এবং একই রকমের আরও অনেক কথা হল প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে। অবশেষে আমি প্রস্তাব করলাম, কোনরকম গোপন না করেই পরদিন সকালে ছটা নাগাদ আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে সেই জায়গাটায় যাব। কথাটা বলতেই সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল; বলল, "সত্যি যাবেন স্যার? সত্যি তো স্যার? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এখন আশা হচ্ছে আমি স্বস্তি পাব।"

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা বাড়ির ভিতর গেলাম।

ভদ্রলোক, তার স্ত্রী ও মিঃ শ্যাম ঘটনাটা জানবার জন্য এতই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে তারা বৈঠকখানা থেকে হলঘরে বেরিয়ে এলেন। ছেলেকে বেশ উৎফুল্ল দেখে বৃদ্ধ লোকটিই প্রথম প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করলেন। "আসুন মিঃ রুভল কথা বলবেন ওর সঙ্গে; আশাকরি এবার তার সুবুদ্ধি হবে। ছেলেটা অলস। ছেলেটা অলস।"

একথা শুনে ছেলেটি তার নিচে যাবার সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল কোন জবাব না দিয়েই ; আমিও এই বলে তিনটি অপেক্ষমান প্রাণীর কৌতূহলকে নিবৃত্ত করলাম যে আমি কথা দিয়েছি চুপ করে থাকব, আর সে কথা রাখতে আমি কৃতসংকল্প ; যথাসময়ে তাঁরা সব কিছুই জানতে পারবেন। বর্তমানে তাঁরা যেন আমার কথার উপর ভরসা রাখেন, আমি সাধ্যমত তাঁদের সেবা করতে চেষ্টা করব। তাদের ছেলের যাতে ভাল হয়। চুপ করে গেলেন এককথায় তারা ; সন্তুষ্ট হলেন একথা বলতে পারব না।

পরদিন সকাল পাঁচটার আগেই শ্রীমান আমার ঘরে এসে হাজির। বেশ চটপটে ভাব। আমিও উঠে তার সঙ্গে চললাম। যে মাঠে সে আমাকে নিয়ে গেল আমার অনুমান সেটা বিশ একর, চারিদিকে খোলা, সব বাড়ি ঘর প্রায় তিন ফার্লং দূরে। মাঠে ঢুকে এক-তৃতীয়াংশ যাবার আগেই স্ত্রী-রূপধারী সেই ছায়ামূর্তি—আকস্মিক আবির্ভাব ও প্রস্থান সমেত হুবহু শ্রীমানের দেওয়া বর্ণনারই অনুরূপ—এসে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম আমিও। যদিও মনে মনে স্থির করেই গিয়েছিলাম যে তার সঙ্গে কথা বলব, পিছন ফিরে তাকাবার শক্তি বা সাহস কোনটাই আমার হল না ; তবু আমার ছাত্র তথা পথপ্রদর্শকের সামনে কোনরকম ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করলাম না। তাকে শুধু জানালাম, তার কথার সত্যতায় আমি সন্তুষ্ট। আমরা মাঠটা শেষ পর্যন্ত গেলাম, আবার ফিরে এলাম, কিন্তু ভূতটি একবারের বেশী আমাদের দেখা দিল না। ছেলেটির মধ্যে বিস্ময়মিশ্রিত একধরনের সাহসিকতা লক্ষ্য করলাম ; তার সাহসের কারণ অবশ্যই আমার উপস্থিতি এবং তার কথার সত্যতার প্রমাণ, আর বিস্ময়ের কারণ ছায়ামূর্তির আবির্ভাব।

এককথায় আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম। আমি কিছুটা বিচলিত, আর ছেলেটি উত্তেজিত। আমরা ফেরামাত্রই কৌতূহলী ভদ্রমহিলাটি আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সুযোগমত তাকে বললাম, আমার মতে তার ছেলের অভিযোগ উপেক্ষা করা বা অবিশ্বাস করার মত নয় ; তবু এ ব্যাপারে আমার মতামত এখনও স্থির করতে পারি নি।

সতর্ক করে দিলাম তাকে, কথাটা যেন প্রচার না হয় ; তাহলে যে বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত হতে পারি নি তা নিয়ে গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে যাবে।

ঠিক সেই সময় আমার এমন কাজ পড়ে গেল যাতে আর অপেক্ষা করতে পারলাম না, লণ্ডনে যাত্রা করলাম সেই সন্ধ্যায়ই, তবে কথা দিয়ে গেলাম যে পরের সপ্তাহে আবার তাদের সঙ্গে দেখা করব। তবু আটকা পড়ে গেলাম একটা বিশেষ কারণে ; সেই সপ্তাহেই আমার স্ত্রী এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এল। যাই হোক, আমার মন থেকে গেল না সেই অভিযানের নেশাটা। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করলাম, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটা হেস্তনেস্ত করার সংকল্প নিয়ে তিন সপ্তাহ পরে আবার সেখানে ফিরে গেলাম।

পরদিন ১৬৬৫-র ২৭শে জুলাই তারিখ সকালে আমি একাই সেই ভুতুরে মাঠে হাজির হলাম এবং সারা মাঠ হেঁটেও কারও দেখা পেলাম না। ফিরে এসে অন্য একটা পথ ধরলাম। এবার কিন্তু প্রেতমূর্তিটা দেখা দিল, আগের বার ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সেটাকে যেখানে দেখেছিলাম অনেকটা সেই জায়গাতেই। মনে হল, এবার সেটা আগেকার চাইতে দ্রুতগতিতে আমার ডান পাশে প্রায় দশ ফুট দূর দিয়ে চলে গেল ; তাই আগে থেকে মনস্থির করে এলেও আমি কথা বলার মত সময়ই পেলাম না।

সেদিন সন্ধ্যায় বাবা-মা, ছেলে ও আমি নিজে আমার শোবার ঘরে সমবেত হবার পরে আমি প্রস্তাব করলাম যে পরদিন সকালে আমরা সকলে একসঙ্গে সেখানে যাব, এবং এতে যে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই সে বিষয়ে কিছু কথাবার্তার পরে সেটাই স্থির হল। সকাল হলে পাছে চাকরবাকররা ভয় পেয়ে যায় তাই একটা গমের ক্ষেত দেখতে যাবার অছিলায় তারা তিনজনে বেরিয়ে গেল, আর আমি একটা ঘোড়া আনিয়ে অন্য পথ ধরে একটা কম্পাস নিয়ে গেলাম এবং তাদের সঙ্গে মিলিত হলাম পূর্ব নির্দিষ্ট সিঁড়িটার কাছে!

সেখান থেকে চারজন ধীরে ধীরে কোয়ার্টিল্‌স্‌-এর দিকে হাঁটতে লাগলাম এবং মাঠ পার হবার আগেই ভূতের দেখা পেলাম। সিঁড়ির উপর

দিয়ে সেটা ঠিক আমাদের সামনে এসে হাজির হল, আর তারপরেই এত দ্রুত চলতে শুরু করল যে আমরা ছ' সাত পা যেতে না যেতেই সেটা আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে তার দিকে ছুটতে লাগলাম ; দেখলাম যে সিঁড়ি দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম সেটার উপর দিয়ে সে চলে গেল ; ব্যস, আর কিছুই দেখতে পেলাম না। এক জায়গায় আমি একটা বেড়ার উপর উঠলাম আর সে আর একটার উপর, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না ; আমি জোর দিয়ে বলতে পারি—ইংলণ্ডের দ্রুততম ঘোড়াও এত অল্প সময়ের মধ্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে পারত না। তার একদিনকার আবির্ভাব সম্পর্কে দুটো জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম। (১) যে শিকারী কুকুরটা আমাদের অগোচরে আমাদের অনুসরণ করছিল সেটা কিন্তু প্রেতমূর্তিটাকে চলে যেতে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে করতে পালিয়ে গিয়েছিল ; তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে প্রেতমূর্তিটা আমাদের ভয় অথবা কল্পনার সৃষ্টি নয়। (২) প্রেতমূর্তিটার চলন পা ফেলে ফেলে একটার পর একটা ধাপে ধাপে নয় অনেকটা ভেসে চলার মত, ঠিক যেভাবে ছেলেমেয়েরা বরফের উপর দিয়ে চলে। প্রাচীন-কালের লেখকরা প্রেতাত্মাদের চলার যে বিবরণ দিয়েছেন ঠিক তার মত।

কিন্তু আমার কথায়ই ফিরে যাই। নিজেদের চোখে এই সব দেখে বৃদ্ধ দম্পতি ছেলের কথায় যেমন বিশ্বাস করল তেমনিই খুব ভয়ও পেল ; কারণ এই ডরোথি ডিংলেকে তার জীবিতকালে তারা চিনত, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিল, আর অবিকল তার মূর্তিই দেখতে পেল এখন এই প্রেত-মূর্তির মধ্যে। আমি সাধ্যমত তাদের উৎসাহ দিলাম, কিন্তু তারা অগ্রসর হতে চাইল না। যাই হোক, আমি স্থির করলাম শেষ পর্যন্ত দেখব, এবং এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর যে সব আইনসম্মত পন্থা আবিষ্কার করেছেন, আর পণ্ডিত লোকেরা যাকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন তারই সাহায্য নেব।

পরদিন বৃহস্পতিবার। আমি একাই গেলাম খুব ভোরে উঠে। আধ-ঘণ্টা ধরে হাঁটলাম কোয়ার্টিল্‌স-এর ঠিক পাশের মাঠটাতে মনে মনে প্রার্থনা

করতে করতে। আমি সিঁড়ি বেয়ে সেই ভুতুড়ে মাঠে পা ফেললাম পাঁচটার পরেই। আর ত্রিশ বা চল্লিশ পা যেতে না যেতেই পরের সিঁড়িতে ভূতটা দেখা দিল। এসব ক্ষেত্রে যেরকম করতে হয় সেইভাবে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করে তাকে ডাকলাম, ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সেটাও এবং আমি যখন কাছে গেলাম তখন আর সেটা নড়লে না। আবার কথা বললাম, সে জবাব দিল, কিন্তু স্পষ্ট শোনাও গেল না তার কথা, গেল না বোঝাও। আমি মোটেই ভয় পেলাম না, চালিয়ে গেলাম কথা, আর শেষ পর্যন্ত কথা বলল সেও, আমি খুশি হলাম। কিন্তু শেষ করা গেল না তখন সব কাজটা; সেদিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পরে সেই একই জায়গায় সেটা আবার আমার সঙ্গে দেখা করল, আর সেটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল দু'পক্ষেরই কিছু কথাবার্তার পরে। সেই থেকে আর কোনদিন সে দেখা দেয়নি, বা ক্ষতি করেনি কোন মানুষের! আমার সকালবেলাকার আলোচনাটা প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরে চলেছিল।

আর তাই আমি জানি, এরা সত্য; ততটা নিশ্চিত ভাবেই জানি চোখ ও কান এতটা নিশ্চয়তা দিতে পারে; আর যতদিন না আমি বুঝব যে আমার ইন্দ্রিয়গুলি আমাকে প্রতারিত করে, আর খ্রীস্টধর্মের প্রতি আমার অবিচল বিশ্বাস থেকে আমি বিচ্যুত না হব, ততদিন জোরের সঙ্গেই আমি বলব যে সে সবই সত্য, এখানে যা কিছু লেখা হল।

———

এলগারনন ব্ল্যাকউড

রাত তখন এগারটা। এ সময়ে বেশ নির্জন লণ্ডনের এডিনবার্গ শহরের রাস্তাগুলো। বিশেষ লোক চলাচল করে না পথে। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ম্যারিয়ট। এক হোস্টেল বাড়ির চারতলায় থাকে। তার মত কিছু ছাত্র এবং সাধারণ খেটে খাওয়া লোকও এই হোস্টেলে থাকে।

একমনে সে পড়া মুখস্থ করে চলেছে দরজায় খিল দিয়ে। বেশ কয়েকবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় শেষ সুযোগ এটাই তার। তাদের অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল নয়। তাঁরা টাকা পয়সা খরচ করতে পারবেন না। সেইজন্যে সে এবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে—পাশ তাকে করতে হবে নয়তো মরতে হবে।

তার কিছু বন্ধু ও পরিচিত লোক ছিল। রাতে তার পড়ার কোন ব্যাঘাত ঘটাবে না তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল। সে ভীষণ পড়ছে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে। যে সময় এবং টাকা নষ্ট হয়েছে সেটা সে উশুল

করতে চায়।

সে একটু বিস্মিত হল হঠাৎ এত রাতে দরজায় বেল বাজার আওয়াজ শুনে। ভাবল কোন লোক এসেছে। কখনও কখনও কোন বাসিন্দা বেলটা চাপ দিয়ে নিঃশব্দে নিজের কাজে চলে যায়। কিন্তু ম্যারিয়ট সে ধরনের ছিল না। সারারাত মনটা তার খুঁতখুঁত করবে লোকটি কে এবং কি চায় সে যদি না জানতে পারে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার আসার উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে তাকে বিদায় করতে হবে।

বাড়িওয়ালি প্রতিদিন ঠিক রাত দশটার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোতে যায়। এরপর সে না শোনার ভান করে। দরজায় কোন বেল বাজলে। উপায়ান্তর না দেখে ম্যারিয়ট দরজা খুলে দেবার জন্যে পড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি। একটা করে গ্যাসের আলো ঝুলছে প্রত্যেক তলায়। তার মৃদু আলো জায়গাটাকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার বেল বাজল। মনে রাগ ও বিরক্তি নিয়ে এসে দরজা খুলে বলল, সবাই জানে আমি এখন পরীক্ষার পড়া তৈরী করছি। কেন তারা আমাকে বিরক্ত করে এই অসময়ে এসে ?

হাতে বই নিয়ে দরজা খুলে ম্যারিয়ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাবছে যে কোন মুহূর্তে আগন্তুকের আবির্ভাব হবে। জুতোর শব্দটা এত কাছে এবং এত জোরে যে মনে হচ্ছে পা দুটো যেন আগে আগে আসছে। যাই হোক না কেন এই অসময়ে তার কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর উপযুক্ত আপ্যায়নের জন্যে সে তৈরী হয়ে আছে কিন্তু লোকটির দেখা নেই! তার নাকের ডগায় পায়ের শব্দটা অথচ দেখা যাচ্ছে না কাউকে।

হঠাৎ ভয়ে তার শরীর শিরশিরিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়টা আবার কেটেও গেল। ভাবল, চীৎকার করে অদৃশ্য আগন্তুককে ডাকবে না, দরজা বন্ধ করে তার পড়ায় ফিরে যাবে। একটা খসখস শব্দ হল সেই সময়ে, দেখা গেল আগন্তুককে।

লোকটি বয়সে তরুণ, বেঁটেখাটো মোটা চেহারা। মুখটা খড়ির মত সাদা, উজ্জ্বল চোখ দুটোর তলায় কালো দাগ। যদিও তার একমুখ দাড়ি এবং চুলগুলো আলুথালু তবু তার পোশাকের পরিপাট্য দেখে ভদ্রলোক বলে মনে হয়। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার তার মাথায় কোন

টুপি নেই এমন কি হাতেও নেই। সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টি হয়ে চলেছে সমানে, তার হাতে ছাতাও নেই, গায়ে ওভার কোটও নেই।

তাকে দেখে ম্যারিয়টের মনে নানা প্রশ্ন উঁকি মারতে লাগল। তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, কে আপনি? আপনার আগমন কি প্রয়োজনেই? কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোবার আগেই লোকটি মাথাটা একটু ঘোরালো। ম্যারিয়ট মুহূর্তে তাকে চিনতে পারল গ্যাসের আলো তার মুখে পড়তেই।

ফিল্ড তুমি বেঁচে আছ? ভয়ে ম্যারিয়টের শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হল।

ম্যারিয়ট ও ফিল্ডের সঙ্গে একই স্কুলে পড়েছিল। সে যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল অবশেষে সেই দুঃখময় পরিণতি ঘটেছে। তার বাবা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে পরে একবারই মাত্র দেখা হয়েছিল। তার বাড়ির কাছেই ফিল্ড থাকত তাই তার বোনেদের মারফত সব খবরই ম্যারিয়ট পেত। ফিল্ড অসংযত জীবনযাপন করত, মদ্যপান, আফিম ইত্যাদির নেশায় সে একেবারে জাহান্নামে গিয়েছিল।

ভেতরে এস। সব রাগ দূর হয়ে গেছে ম্যারিয়টের। কিন্তু গণ্ডগোল হয়েছে মনে হচ্ছে। এস ভেতরে। আমাকে সব বল, হয়ত আমি কোন সাহায্য—। আর কি বলবে সে ভেবে পেল না তোতলাতে লাগল। জীবনের যে অন্ধকার দিক আছে, তার যে ভয়াবহতা, আছে, সেটা এমন এক জগৎ যা ম্যারিয়টের জানা ক্ষুদ্র বইয়ের গণ্ডি ও স্বপ্নের অনেক দূরে। কিন্তু তার হৃদয় আছে।

ম্যারিয়ট তাকে নিয়ে হলের দিকে এগোতে লাগল সদর দরজা বন্ধ করে! সে লক্ষ্য করল ফিল্ড অনেকটা সংযমী কিন্তু সে যে পরিশ্রান্ত তার টলায়মান পা দুটো তার স্বাক্ষর দিচেছ। পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না বোধহয় ম্যারিয়ট, কিন্তু তার মুখে তীব্র ক্ষুধার জ্বালা সে অনুভব করতে পারছে।

ম্যারিয়ট উৎফুল্ল ও সমবেদনার সুরে বলল, এস আমার সঙ্গে। তোমাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। আমি কিছু খেতে যাচিছলাম এই মাত্র, তুমি ঠিক সময়ে এসেছ।

কোন উত্তর পাওয়া গেল না অন্যজনের কাছ থেকে। সে এতই দুর্বল

ভাবে হাঁটছে যে ম্যারিয়ট তার হাতটা ধরে নিয়ে চলল। এই প্রথম সে লক্ষ্য করল জামা কাপড় তার গায়ে খুব ঢিলেঢালা। কঙ্কালসার তার চেহারাটা। তাকে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যারিয়টের মূর্চ্ছা প্রবণতা ও ভীতির উত্তেজনা উদ্রেক করল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। পরক্ষণেই সে নিজেকে সান্ত্বনা দিল, তার বন্ধু ফিল্ডের দুঃখজনক অবস্থা তাকে আঘাত করেছিল বলেই তার মনের এমন অবস্থা ঘটেছিল।

তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল। এই হলঘরটা—খুব অন্ধকার। আমি বারবার অভিযোগ জানাই। কিন্তু বুড়িটা আর কিছুই করে না কথা দেওয়া ছাড়া! তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসাল। ম্যারিয়ট আশ্চর্য হচ্ছে এই ভেবে যে কোথা থেকে ফিল্ড আসছে আর কি করেই বা সে তার ঠিকানা জানল। অন্ততঃ সাত বছর আগে তারা দিন কাটিয়েছিল সেই স্কুলে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে।

আমাকে মাফ কর এক মিনিটের জন্যে, আমি আবার ঠিক করি। সেই সঙ্গে তুমি কথা বলতে বিরক্ত হয়ো না। সোফায় বিশ্রাম নাও তুমি বড্ড ক্লান্ত। পরে আমাকে সব বলো, আমরা দুজনে পরিকল্পনা করব।

ফিল্ড সোফার ধারে বসে কোন কথা না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ম্যারিয়ট আলমারী থেকে বাদামী রঙের পাউরুটি, কেক এবং একটা বড় পাত্রে কমলালেবুর আচার বার করে আনল। এডিনবার্গের ছাত্রেরা সবসময় এগুলো মজুত রাখে। আলমারীর দরজার কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তার চোখ দুটো ভীষণ চকচক করছে। ম্যারিয়ট ভাবল এটা কোন ওষুধের জের। ওঁর অবস্থা খুবই খারাপ অতএব তার কাছ থেকে শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। তাছাড়া কথা বলার পক্ষে সে এখন বড়ই ক্লান্ত। সুতরাং ভদ্রতার দিক দিয়ে—এবং আরো একটা দিকে—সেটা যে ঠিক কি তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারল না—তাকে বিশ্রাম দেওয়াই উচিত। সে স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বালাল কোকো তৈরী করবার জন্যে। জল যখন ফুটছে এখন খাবার টেবিলটা সোফার কাছে টেনে নিয়ে এল যাতে ফিল্ডের চেয়ারে উঠে গিয়ে বসতে কষ্ট না হয়।

এস, ভুরি-ভোজন করা যাক এখন, তারপর গল্প করা যাবে পাইপ টানতে টানতে। পরীক্ষার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছি, বুঝলে। এই সময় আমি কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকি। একজন বন্ধুকে কাছে পেয়ে খুব

আনন্দ হচ্ছে।

চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল তার অতিথি তারই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। ম্যারিয়টের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা শিহরণ খেলে গেল। বসে থাকা লোকটির মুখ মৃতের মত সাদা এবং ব্যথা ও মানসিক কষ্টের এক ভীতিভাব তার মুখে ফুটে উঠেছে।

হা ভগবান! ম্যারিয়ট লাফিয়ে উঠল। ভুলে গেছি আমি একেবারে কোথায় যেন পানীয় রেখেছি। আমি কি গাধা! এমন কাজের মধ্যেও আমি ছুঁইনি।

আলমারী থেকে পানীয়ের বোতল ও গেলাস বার করে আনল। গেলাসে পানীয় ঢেলে ফিল্ডকে দিল। সে জল না মিশিয়ে সেটা এক ঢোঁকে শেষ করে ফেলল। ম্যারিয়ট দেখল তার কোটটা ধুলোয় ভর্তি, কাঁধে মাকড়সার জাল আটকে রয়েছে। একেবারে খটখটে শুকনো। বৃষ্টিঝরা রাতে ফিল্ড এসেছে—টুপি, ছাতা, ওভারকোট কিছুই নেই—অথচ শুকনো, এমনকি ধুলো ভর্তি! তাহলে সে ঢাকা অবস্থায় ছিল! এসবের কি মানে? সে কি লুকিয়ে ছিল এই বাড়িতেই?

বড় অদ্ভুত ব্যাপার এটা! তবু কিছু জিজ্ঞেস করেনি সে। সে ঠিক করেছে তার খাওয়া ও ঘুম না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না। খাদ্য এবং ঘুম—এখন ওর প্রয়োজন এ দুটোই। সে সন্তুষ্ট ঠিক লক্ষণ ধরতে পেরে। সে একটু সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত কোন চাপ দেওয়া ভাল হবে না।

খেতে লাগল তারা দুজনে। একাই কথা বলে যাচ্ছে ম্যারিয়ট। তার নিজের সম্বন্ধে, তার পরীক্ষার ব্যাপারে, বুড়ি বাড়িওয়ালির কথা। এক-নাগাড়ে বলে চলেছে যাতে কিছু বলতে না হয় তার অতিথিকে। ম্যারি-য়টের খাবার কোন ইচ্ছে নেই, হাতে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। অথচ লোকটি গোগ্রাসে গিলছে। এক ক্ষুধার্ত লোকের এইভাবে ঠাণ্ডা, বাসি খাবার খাওয়ার আগ্রহ দেখে অনভিজ্ঞ ছাত্র ম্যারিয়টের সামনে না খেতে পাওয়ার এক বিস্ময়কর রহস্য উদঘাটিত হল। আশ্চর্য হয়ে দেখছে আর ভাবছে খাবার আটকে যাচ্ছে না তো লোকটার গলায়।

কিন্তু ফিল্ড যেমন ক্ষুধার্ত তেমনি নিদ্রালু। মাঝে মাঝে তার মাথা সামনের দিকে ঝুলে পড়ছে, মুখের খাবার চিবোন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ম্যারিয়ট বারবার তাকে ঝাঁকানি দিয়ে জাগিয়ে তুলছে। একটা জোরালো আবেগ দুর্বলতাকে বশে আনতে পারে কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা মেটানো এবং নিদ্রা দূর করার এই যে সংগ্রাম এটা তার কাছে অদ্ভুত লাগল। সে এক-দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিস্ময়মিশ্রিত ভয়ে। সে শুনেছে ক্ষুধার্তকে সামনে বসিয়ে খাওয়ানোর মধ্যে আনন্দ আছে কিন্তু তার নিজের সে অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। ফিল্ড পশুর মত গরগর করে খাবার মুখে পুরে সরু গলা দিয়ে গিলে ফেলল। পড়ার কথা ভুলে গেল ম্যারিয়ট! তার যেন কিছু আটকে আছে বোধ হল নিজেরই গলায়।

তার শেষ কেকটা গলাধঃকরণ করার পর হঠাৎ বোকার মত ম্যারিয়ট বলল, আমার আর কিছু নেই তোমাকে দেবার মত।

তখনও কোন কথা বলল না ফিল্ড। তার নিজের জায়গায় প্রায় ঘুমিয়ে পড়ার মত অবস্থা। সে চোখ তুলে দেখল একবার ক্লান্ত ও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে।

এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার নচেৎ তোমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে। আমাকে পরীক্ষার পড়া করতে হবে সারারাত জেগে। তুমি স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পার আমার বিছানায়। ব্রেকফাস্ট সারব কাল একটু বেলাতে, আর—আর দেখি কি করা যায়—পরিকল্পনা করব—তুমি জান আমি এ ব্যাপারে ওস্তাদ। ঘরের পরিবেশ হাল্কা করার জন্য ম্যারিয়ট কথাগুলি বলল।

মৃত্যুর নীরবতা পালন করে চলেছে ফিল্ড। তার মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ভেবে ম্যারিয়ট তাকে তার ছোট শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ফিল্ড জমিদারের ছেলে, তাদের বাড়ি প্রাসাদতুল্য। এই ছোট সামান্য ঘরটা তার কাছে নেহাতই পুতুলঘর।

ক্লান্ত অতিথি কোন ধন্যবাদ বা ভদ্রতার ভান করে তার বন্ধুর হাতে ভর দিয়ে পা টেনে ঘরে ঢুকল। তাকে বিছানার উপর শুইয়ে দিল গায়ের পোশাক শুদ্ধ।

কিছুক্ষণ ম্যারিয়ট তাকে দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে। তারপর তাকে যেন এমন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে পড়তে না হয় তার জন্যে ভগবানের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানাল! পরমুহূর্তে তার চিন্তা হল এই অনাহূত অতিথিকে নিয়ে কাল সে কি করবে। কিন্তু বেশিক্ষণ এ

ভাবনা তাকে উতলা করে তুলতে পারল না কারণ তার পরীক্ষার ব্যাপারটা তার মন কেড়ে নিল।

সেই বই নিয়ে বসল দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে। মেটিরিয়া মেডিকার যেখান থেকে নোট করতে করতে বেল শুনে উঠে গেছল সেখানে আবার মনোনিবেশ করল। কিন্তু তার পাঠে সে মনোযোগ দিতে পারল না বেশ খানিকক্ষণ। কেবল তার চিন্তা সেই মূর্তিটায় ঘুরপাক খাচ্ছে—বিছানায় শুয়ে রয়েছে সাদা-ফ্যাকাসে মুখ, অদ্ভুত জ্বলন্ত চোখ, ক্ষুধার্ত ও মলিন বেশ, পোশাক ও জুতো পরে।

তার মনে পড়ল সেই ফেলে আসা স্কুল জীবনের কথা। তারা চিরন্তন বন্ধুত্বের শপথ নিয়েছিল তাদের দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হবার আগে। কি ভয়াবহ দুর্দশা! কেমন করে তার উপর একজন মানুষের ভালবাসা জন্মাতে পারে?

কিন্তু তাদের দুজনের একটা শপথ ম্যারিয়ট একেবারে ভুলে গেছে। ঠিক এই মুহূর্তে সেই স্মৃতি তার মনের মণি কোঠার অনেক দূরে।

ম্যারিয়ট আধখোলা দরজা দিয়ে শোবার ঘর থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষের গভীর নিদ্রা তাকেও প্রায় বিছানায় আকর্ষণ করছিল।

ম্যারিয়ট চিন্তা করল, এটা দরকার তার, আর হয়ত এই ঘুম তার এসেছে ঠিক সময়েই!

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে তখন বাইরে সোঁ সোঁ শব্দে; অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে জানালার সার্সিতে ও রাস্তায়। আবার ম্যারিয়ট পড়ায় মনোনিবেশের চেষ্টা করল কিন্তু বইয়ের মধ্যে সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে পাশের ঘরের লোকটির ভারী ও গভীর নিঃশ্বাস।

ঘণ্টা দুয়েক পর সে বই বদল করল তার নিঃশ্বাস তখনও কানে আসছে। ধীরে ধীরে দরজার কাছে গিয়ে সে একবার ঘরের চারদিক দেখল।

ঘরের অন্ধকারে সে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। হয়ত আলোয় এতক্ষণ বসে থেকে তার চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে। কিছুই সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না—কালো ঢেলার মত আসবাবপত্রগুলো, দেওয়ালে ড্রয়ারের আলমারীটা একটা কালো বস্তু, ঘরের মাঝখানে সাদা

বাথটবটা যেন একটা সাদা প্রলেপ।

তারপর তার বিছানাটা দৃষ্টিপথে এল ধীরে ধীরে। সে দেখল তার উপর একটা ঘুমন্ত দেহের রেখা ক্রমে ক্রমে আকার নিল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুতভাবে সে বাড়তে লাগল। একটা পরিষ্কার আকৃতি পরিগ্রহণ করল—সাদা শুজনির উপর একটা লম্বা কালো মূর্তি।

সে না হেসে পারল না। ফিল্ড একটুও নড়েনি। কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখে ম্যারিয়ট আবার তার বইয়ের কাছে ফিরে এল।

একঘেয়ে বৃষ্টি আর বাতাস বয়ে চলেছে। কোন শব্দ নেই গাড়ির, পাথরের উপর দিয়ে দু চাকার গাড়ি চলার ঠনঠন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, দুধের গাড়ি চলারও সময় এখন নয়। ম্যারিয়ট স্থিরভাবে ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে পড়া করতে লাগল। মাঝে মাঝে ঘুম তাড়াবার জন্যে একটা কাপে চুমুক দিচ্ছে। তারই ফাঁকে ফিল্ডের গভীর নিঃশ্বাস তার কানে আসছে।

প্রবল বেগে ঝড় বইছে বাইরে কিন্তু বাড়ির মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। টেবিল ল্যাম্পের আলো সমস্ত টেবিলে ছড়িয়ে পড়েছে অথচ ঘরের সবটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। শোবার ঘরটা সে যেখানে বসে আছে ঠিক তার উল্টো দিকে, তার কাজে ব্যাঘাত ঘটাবার মত কিছুই নেই, তবে মাঝে মাঝে ঝড়ের ঝাপটা জানালার ওপর পড়ছে আর তার হাতে সামান্য একটু ব্যথা অনুভব করছে।

এই ব্যাপারটা যে কি করে হল সে বুঝতে পারছে না, কখনও টনটন করে উঠছে। এটা বিরক্ত করে তুলছে তাকে। সে মনে করবার চেষ্টা করছে কেমন করে, কখন এবং কোথায় তার হাতে ধাক্কা লেগেছিল কিন্তু কিছুই ভেবে পাচ্ছে না!

অবশেষে তার চোখের সামনে বইয়ের পাতার রঙ হলদে থেকে ধূসর বর্ণে বদলে গেল এবং নিচে রাস্তায় চাকার শব্দ কানে এল। তখন ভোর চারটে। ম্যারিয়ট চেয়ারে হেলান দিয়ে বিরাট হাঁ করে হাই তুলল। জানালার পর্দাগুলো সে সরিয়ে দিল। বাইরের সবকিছুই কুয়াশায় ঢাকা তখন ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। আর একবার হাই তুলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। ব্রেকফাস্টের আগে শোফায় শুয়ে বাকি চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবার জন্যে প্রস্তুত হল। কিন্তু তখনও পাশের ঘরে গভীর

নিঃশ্বাস ফেলছে। পায়ে ভর দিয়ে নিঃশব্দে আর একবার তাকে দেখে নিল!

সন্তর্পণে আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ভোরের মৃদু আলোয় বিছানাটা পরিষ্কার দেখতে পেল। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে। একবার চোখটা রগড়ে নিয়ে দেখল। আবার সে চোখ রগড়াল—তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। অবাক বিস্ময়ে তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। বিছানা শূন্য, ঘর শূন্য।

ফিল্ডের প্রথম আবির্ভাবে যে ভয় ম্যারিয়টের মনে জেগে উঠেছিল সেই ভয় হঠাৎ যেন সে আবার অনুভব করতে লাগল। এবার যেন আরো বেশী। সেই সঙ্গে সে সচেতন হয়ে উঠল, তার বাঁ হাতটা দপদপ করছে আরো বেশী ব্যথা বোধ করছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর চিন্তা করার চেষ্টা করছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে।

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মনে শক্তি এনে সাহসের সঙ্গে সে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। দেখল, বিছানার উপর যেখানে ফিল্ড শুয়ে ঘুমিয়েছিল সেখানে দেহের চাপ পড়ে একটা কিছুর ছাপ রয়েছে। বালিশে মাথা রাখার দাগ, নীচের দিকে শুজনির উপর যেখানে বুটজুতো পরা পা রেখেছিল সেখানটা গর্ত হয়ে গেছে। আর সে বিছানার এত কাছে ছিল যে পরিষ্কারভাবে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

সমস্ত শক্তি সংহত করে সে চীৎকার করে তার বন্ধুর নাম ধরে ডাকতে লাগল—ফিল্ড! তুমি আছ! কোথায় তুমি।

কোন সাড়া নেই। বিছানা থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ অব্যাহত রয়েছে! তার নিজের স্বর তার কানে অদ্ভুত লাগছে। আর সে ডাকল না। হাঁটু গেড়ে বসে বিছানার উপরে-নীচে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। শেষে শুজনি তুলে ফেলল, একটার পর একটা চাদর, তোষক তুলে দেখতে লাগল। যদিও দৃশ্যত ফিল্ডকে দেখা যাচ্ছে না তবু সে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে। দেওয়ালের কাছ থেকে খাটটা টেনে নিয়ে এল তবু শব্দটা সেখানেই রয়ে গেল, বিছানার সঙ্গে সেটা স্থানান্তরিত হল না।

এই ক্লান্তির অবস্থায় ম্যারিয়ট খুব সহজে আত্মসংযমী হয়ে উঠতে পারছিল না। সে সমস্ত ঘর খুঁজে দেখল তন্ন তন্ন করে। কোথাও চিহ্ন নেই কারও। ছোট জানালাটা বন্ধ ঘরের উপর দিকে। অবিশ্যি সেটা খোলা থাকলেও একটা বিড়াল যাবার মত চওড়া নয়। ভেতর দিক থেকে বন্ধ বসার ঘরের দরজাটা। সে বেরিয়ে যেতে পারে না সে পথ দিয়ে। অদ্ভুত সব চিন্তা ম্যারিয়টের মনকে অস্থির করে তুলল, সেইসঙ্গে অবাঞ্ছিত অনুভূতি তার মনে জেগে উঠল। সে ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। আবার সে বিছানা উল্টেপাল্টে দেখল। ঘর খুঁজল দুটো এটা যে নিষ্ফল তা সে গোড়া থেকেই জানত,—তবু দেখল আবার সে। ঠাণ্ডা ঘাম ঝরছে তার সারা দেহে। ঘরের কোণে ফিল্ড যেখানে শুয়েছিল সেখান থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ আসা বন্ধ হল না।

অন্য কিছু করার চেষ্টা করল তখন সে। খাটটা যেখানে ছিল সেখানে সরিয়ে রেখে সেই বিছানার উপর সে শুয়ে পড়ল। লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল শোবার সঙ্গে সঙ্গে। বিশ্বাসটা একেবারে তার গালের উপর পড়ছে—দেওয়াল এবং তার মাঝে! একটা বাচ্চা সেই ফাঁক দিয়ে গলে যাওয়ারও জায়গা নেই।

সে সব জানালা খুলে দিল তার বসার ঘরে গিয়ে। ঘরে আলো হাওয়া খেলতে লাগল। ধীরে সুস্থে চিন্তা করার চেষ্টা করল আগাগোড়া সব ব্যাপারটা। সে জানত যারা খুব বেশী পড়াশুনা করে অথচ কম ঘুমোয় তাদের মনে নানা অলীক অবাস্তব চিন্তা জেগে উঠে যন্ত্রণা দেয়। আবার সে শান্তচিত্তে রাতের সব ঘটনাগুলো ভাবতে লাগল—তার মনের অনুভূতি, প্রাণবন্ত ঘটনা, তার মনকে আলোড়িত করা ভাবাবেগ, ভয়ঙ্কর ভোজন পর্ব—এত সব একসঙ্গে মিলে এত সময় ধরে কোন ভৌতিক কাণ্ড ঘটতে পারে না। বারবার তার মূর্চ্ছা প্রবণতা, একবার কি দুবার তার মনে অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার, তারপর তার হাতের ভীষণ যন্ত্রণা—এ সব কিছুই চিন্তা করে কোন কুল পেল না, কোন কারণও খুঁজে পেল না।

এসব খতিয়ে দেখে পরীক্ষা করতে করতে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হঠাৎ তার মনে উদয় হল। সারাক্ষণ ধরে ফিল্ড মুখ দিয়ে একটাও ত শব্দ বার করেনি! তার ভাবনা চিন্তাকে ঠাট্টা করবার জন্যে তখনও ভেতরের ঘর থেকে দীর্ঘ গভীর ও স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে! একটা

অবিশ্বাস্য, অযৌক্তিক ব্যাপার !

ভুতুড়ে চিন্তার জালে জড়িয়ে পাগলের মত মাথায় টুপি ও গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে বাড়ি থেকে সে বেড়িয়ে পড়ল। সকালের বিশুদ্ধ বাতাস, অকুল সমুদ্রের দৃশ্য, ছোট ছোট গাছ-গাছালির বুনো গন্ধ তার মাথার সমস্ত জট ছাড়িয়ে দেবে। বেশ কিছুক্ষণ ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির উপর ঘুরে বেড়িয়ে যখন বুঝতে পারল তার মন থেকে ভয় দূর হয়েছে, খিদেও চনচনে হয়েছে, তখন সে বাড়ি ফিরে এল।

ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল একজন লোক জানালায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিল কিন্তু পরে চিনতে পারল। সে হচ্ছে গ্রীণ, তার বন্ধু—তার সঙ্গে পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

সারারাত খুব পড়েছ, ম্যারিয়ট। সে বলল। ভাবলাম তোমার সঙ্গে নোটগুলো মিলিয়ে নিই আর ব্রেকফাস্টটাও শেষ করি। তাই তোমার কাছে এলাম। তুমি এত সকালে বাইরে গেছলে ?

ম্যারিয়ট জানাল তার মাথাটা ধরেছিল বলে সে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল।

ও। গ্রীণের কণ্ঠে বিস্ময় জেগে উঠল। এই সময় একজন পরিচারিকা ঘরে ঢুকে গরম পরিজ টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। তারপর বেশ জোরের সঙ্গে গ্রীণ বলল, ম্যারিয়ট, তোমার কানে মদ্যপানাসক্ত বন্ধু আছে বলে জানতাম না ত ?

এটা স্পষ্টতই সাময়িক তাই নীরসভাবে জানাল সে নিজেও তা জানে না।

মনে হচ্ছে বিছানায় কেউ আরামে ঘুমিয়ে গেছে, না ? মাথা নেড়ে শোবার ঘরটা দেখিয়ে কৌতূহলী হয়ে ম্যারিয়টের দিকে তাকিয়ে রইল।

দুজন কয়েক সেকেন্ড পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সাগ্রহে ম্যারিয়ট বলল, তাহলে তুমিও শুনছ ? ভগবানকে ধন্যবাদ।

নিশ্চয়ই আমি শুনেছি। দরজা খোলা রয়েছে। আমি যদি তাই

বোঝাতে চাই তার জন্যে দুঃখিত।

না, না, কিছু আমি মনে করি নি। ম্যারিয়ট নিচু স্বরে বলল। আমি একেবারে আতঙ্কমুক্ত। ব্যাপারটা আমাকে বলতে দাও। অবশ্য যদি তুমি শুনে থাক তবে ঠিক আছে। কিন্তু আমি যা বলতে পারি তার থেকে বেশী আমাকে ভীত করে তুলেছিল। আমি ভেবেছিলাম আমার মাথার কোন গোলমাল হয়েছে। তুমি জান এই পরীক্ষার উপর আমার অনেক কিছু নির্ভর করছে। এটা সব সময় শুরু হয় কোন শব্দ, দৃশ্য অথবা অলৌকিক চিন্তার মধ্যে দিয়ে এবং আমি।—

যত সব বাজে! হঠাৎ তার কথার মাঝে গ্রীণ বলল। তুমি কিসের কথা বলছ?

আমার কথা শোন গ্রীণ, যতটা সম্ভব শান্তভাবে ম্যারিয়ট বলল। তখনও সেই নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি যা বলতে চাই তোমাকে বলব কিন্তু কোন বাধা দিও না। তারপর রাতে যা ঘটেছিল সব বলল, এমন কি হাতের ব্যথার কথাও বলতে ভুলল না। বলা শেষ হলে টেবিল থেকে উঠে সে ঘরের ওপাশে গেল। বলল, এখন তুমি পরিষ্কারভাবে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছ, তাই না? সম্মতি জানাল গ্রীণ। বেশ, এস আমার সঙ্গে, আমরা দুজনে ঘরটা খুঁজে দেখব ভাল করে। অন্যজন কিন্তু তার চেয়ার থেকে নড়ল না।

আমি আগেই ওখানে গেছি, নিষ্ক্রিয়ভাবে উত্তর দিল গ্রীণ। আমি শব্দ শুনে ভেবেছিলাম যে তুমি। দরজা খোলা ছিল হাট করে তাই ভেতরে ঢুকেছিলাম।

ম্যারিয়ট কোন মন্তব্য না করে দরজাটা ঠেলে একেবারে খুলে দিল। দরজাটা খুলতেই নিঃশ্বাসের শব্দটা আরো জোর এবং পরিষ্কারভাবে হতে লাগল। কেউ নিশ্চয়ই ওখানে আছে। চাপা স্বরে গ্রীণ বলল।

কেউ ওখানে আছে, কিন্তু কোথায়? ম্যারিয়ট বিস্মিত হয়ে বলল। আবার তার বন্ধুকে তার সঙ্গে ঘরে ঢোকবার জন্যে জেদ করতে লাগল। কিন্তু গ্রীণ সোজাসুজি তা প্রত্যাখ্যান করল। বলল, সে একবার ঘরে

ঢুকে চারদিক খুঁজেছে, কোথাও কিছু দেখতে পায়নি। সে আর ভেতরে যাবে না।

তারা বসার ঘরে ফিরে এল দরজা বন্ধ করে দিয়ে। নানাদিক দিয়ে তারা এ ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল। গ্রীণ তার বন্ধুর খুব কাছে বসে প্রশ্ন করে যেতে লাগল। কিন্তু কোন আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেল না কখনও প্রশ্নে বদলানো যায় না সত্য ঘটনা।

একমাত্র ব্যাপার যার সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হয় তা হচ্ছে আমার হাতের ব্যাথাটা। এই বলে ম্যারিয়ট তার আহত হাতটা বুলোতে বুলোতে মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। এটা সর্বক্ষণ আমায় নারকীয় যন্ত্রণা ও ব্যথা দিয়ে চলেছে। কিছুই মনে করতে পারছি না কখন যে ধাক্কা লেগেছিল।

দেখি, একটু পরীক্ষা করতে দাও তো তোমার হাতটা। হাড়ের বিষয় আমার জ্ঞান আছে, যদিও আমার পরীক্ষকগণ তা মানতে চান না। মনের বোঝা হাল্কা হয়ে যায় একটু মসকরা করলে—তাই ম্যারিয়ট জামার হাতাটা গুটিয়ে ফেলল কোটটা খুলে।

হা ভগবান! রক্ত বেরোচ্ছে! সে চীৎকার করে উঠল। দেখ, দেখ। এটা কি?

একটা সরু লাল দাগ হাতের কব্জির কাছাকাছি। টাটকা রক্তের ফোঁটা। এর উপরে গ্রীণ কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে বেশ খানিকক্ষণ সেটা দেখল। তারপর অবাক দৃষ্টি দিয়ে বন্ধুর মুখ দেখতে লাগল চেয়ারে বসে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, তোমার অজান্তে তুমি নখের আঁচড় কেটেছ!

নেই তো কোন চিহ্ন। এ নিশ্চয়ই অন্য কিছু যা আমার হাত বেদনাময় করে তুলেছে।

ম্যারিয়ট নিশ্চল হয়ে বসে হাতের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। মনে হচ্ছে যেন সবকিছু রহস্যের সমাধান প্রকৃতই হাতের চামড়ার উপর লেখা আছে।

ব্যাপার কি ? একটা আঁচড়ে অদ্ভুত কিছু দেখছি না। গ্রীণ বলল প্রত্যয়হীন স্বরে। এটা হয়ত তোমার জামার আস্তিনের বোতামের দাগ। গতরাতে তোমার উত্তেজনাবশত— ।

কিন্তু ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ম্যারিয়টের ঠোঁট দুটো। কথা বলার সে চেষ্টা করল। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে কপালে। সে অবশেষে তার বন্ধুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল।

মৃদু কম্পিত অনুচ্চ কণ্ঠে সে বলল, দেখছ ঐ লাল দাগটা ? আমি বলতে চাইছি নীচের দিকে যাকে তুমি আঁচড় বলছ ?

গ্রীণ স্বীকার করল কিছু যেন দেখেছে। ম্যারিয়ট রুমাল দিয়ে সেটা মুছে ফেলে আবার তাকে ভাল লক্ষ্য করতে বলল।

হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে একটা পুরোনো ঘায়ের দাগ। একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে সে বলল।

এটা একটা পুরানো ঘা। ফিসফিস করে ম্যারিয়ট বলল। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে। এখন সব কিছু মনে পড়ছে।

সব কিছু কি ? অস্থির হয়ে গ্রীণ জিজ্ঞেস করল চেয়ারে বসে।

চুপ! আস্তে! আমি তোমাকে বলব। এই ক্ষত ফিল্ডেরই কীর্তি! বিস্মিত হয়ে তারা দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল। কোন শব্দ নেই কারোর মুখে।

ঐ ক্ষত ফিল্ড করেছিল! অবশেষে ম্যারিয়ট একটু উঁচু গলায় পুনরাবৃত্তি করল।

ফিল্ড! তুমি বলছ—কাল রাতে ?

না, কাল রাতে নয়—অনেক বছর আগে—স্কুলে একটা ছুরি দিয়ে। এবং আমিও তার হাতে ক্ষত করেছিলাম। ম্যারিয়ট এখন তাড়াতাড়ি কথা বলছে। আমরা ক্ষত দিয়ে রক্তবদল করেছিলাম পরস্পরের। সে একফোঁটা আমার হাতে ফেলেছিল আমিও একফোঁটা তার— ।

'হায় ভগবান, কিসের জন্য ?'

এটা একটা নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধন। আমরা একটা পবিত্র অঙ্গীকার

করেছিলাম, একটা চুক্তি। আমার এখন সব নিখুঁতভাবে মনে পড়ছে। আমরা ভূতুড়ে বই পড়তাম এবং শপথ নিয়েছিলাম যে আগে মরবে সে অন্যকে দেখা দেবে। এবং নিবিড় বন্ধুত্ব আমরা রক্ত দিয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে—আজ থেকে সাত বছর আগে এক ভীষণ গরমের দুপুরবেলায় খেলার মাঠে—এবং একজন শিক্ষক আমাদের ধরে ফেলেন আর ছুরি দুটো কেড়ে নেন—এবং আজ পর্যন্ত আমার আগে এ ব্যাপারটা মনে আসেনি—।

তাহলে তুমি বলতে চাও—। গ্রীণ তোতলাতে লাগল।

কিন্তু ম্যারিয়ট কোন কথা বলল না। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে সোফার উপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। দুহাতে মুখটা ঢেকে রইল।

একটু হতবাক হয়ে পড়ল গ্রীণ নিজেও। সে একা একা সমস্ত ব্যাপারটা আবার চিন্তা করতে লাগল! মাথায় এল একটা ধারণা। সে তাকে সোফা থেকে তুলল ম্যারিয়টের কাছে গিয়ে। যা হোক, কোন বিষয়ের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থাক বা না থাক তার মুখোমুখি হওয়া ভাল। নীরবে মেনে নেওয়া মানে বোকার মত প্রস্থান করা।

আমি বলি কি ম্যারিয়ট, এ ব্যাপারে এত ঘাবড়ে যাওয়া ভাল নয়। তার মানে এটা যদি না হয়, তবে আমরা কি ভাবব তা জানি, তাই না?

তার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে মুখে ম্যারিয়ট বলল, আমার মনে হয় তাই। কিন্তু অন্য কারণে এ আমাকে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত করে তুললে। এবং ঐ আত্মা বেচারা—

সে যাহোক, যদি সব থেকে মন্দটাই সত্যি হয় আর—আর ঐ লোকটা তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে—ব্যস্, সে তার কথা রেখেছে, ব্যাপার মিটে গেল, তাই না?

মাথা নেড়ে সায় দিল ম্যারিয়ট।

একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, গ্রীণ বলতে লাগল, আর তা হচ্ছে, তুমি কি নিশ্চিত যে সে ওভাবে খেয়েছিল—তার মানে প্রকৃতই সে কিছু খেয়েছিল?

ম্যারিয়ট কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকে দেখে জানাল যে সে-বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই। শান্তভাবে সে কথা বলছিল। ছোটখাট কোন আশ্চর্য ব্যাপার মনকে প্রভাবিত করতে পারে না বড় আঘাত পাবার পর।

সে জানাল, আমাদের খাওয়া শেষ হলে আমি নিজের হাতে সেগুলো সরিয়ে রেখেছি। ঐ আলমারীর তৃতীয় তাকে পাত্রগুলো আছে। সেই থেকে ওগুলো কেউ ছোঁয়নি।

ম্যারিয়ট দেখাল চেয়ারে বসেই। গ্রীণ উঠে গিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখল।

ঠিক যা ভেবেছি তাই। যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন, কিছুটা মনের কল্পনা। খাবারগুলো একেবারে ছোঁয়া হয়নি। এদিকে এস, নিজের চোখে দেখ।

তাকটা পরীক্ষা করে দেখল তারা দুজনে। বাদাম রঙের পাউরুটি পড়ে আছে, বাসি কেক, আচার কমলা লেবুর—তেমনি আছে, যেমন রাখা হয়েছিল, হাত দেয়নি একদম। এমন কি ম্যারিয়টের ঢালা গেলাস ভর্তি পানীয় এতটুকু কমেনি।

গ্রীণ বলল তুমি কাউকে খাওয়াও নি। ফিল্ড কোন খাদ্য খায়নি, পানও কিছু করেনি। সে সেখানে আদৌ ছিল না।

কিন্তু নিঃশ্বাস? সে জানতে চাইল চাপা গলায়। তার সারা মুখে হতবুদ্ধির ভাব।

কোন উত্তর দিল না গ্রীণ। শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল সে। তাকে অনুসরণ করল ম্যারিয়টের দৃষ্টি। সে দরজা খুলে কান পেতে কিছু শুনল। দরকার হল না কথা বলার। বাতাসে ভেসে আসতে লাগল গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ। অলীক কল্পনা নয় সেটা কোন। অন্য ঘরে ম্যারিয়ট যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানেও সে শুনতে পাচ্ছে।

দরজা বন্ধ করে ফিরে এল গ্রীণ। এই বলে সে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করল, তার সম্বন্ধে জান, বাড়িতে চিঠি লিখে। এই সময় তোমার পড়া শেষ কর আমার ঘর থেকে। আলাদা আমার বিছানা আছে, অসুবিধে

হবে না তোমার কোন।

বেশ, রাজী আছি; ঐ পরীক্ষার ব্যাপারে কোন অবাস্তবতা নেই। আমাকে পাশ করতেই হবে যা কিছু ঘটুক না কেন।

ম্যারিয়ট তার বোনের কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেয়েছিল। এর এক সপ্তাহ পরে চিঠির কিছু অংশ গ্রীণকে পড়িয়ে শুনিয়েছিল, তার বোন লিখেছিল ঃ

আমার অবাক লাগছে তুমি ফিল্ডের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। কিছু দিন আগে সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছল স্যার জনের। তিনি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। কপর্দকশূন্য অবস্থায়। সে বাড়ি থেকে না পালিয়ে পাতালের ঘরে আশ্রয় নিল। অনাহারে ধীরে ধীরে প্রাণ পরপারের দিকে পাড়ি দেয়।.....তারা চাপা দেবার চেষ্টা করছে এই ঘটনাটা। একথা শুনেছি আমাদের বাড়ির পরিচারিকার কাছে, সে আবার শুনেছে তাদের চাপরাসীর মুখ থেকে, তারা মৃতদেহ দেখতে পায় ১৪ তারিখে। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলেছে বার ঘণ্টা আগে তার মৃত্যু ঘটেছে.....তাকে ভীষণ রোগা দেখাচ্ছিল.....।

গ্রীণ বলল তাহলে সে ১৩ তারিখে মারা গেছে।

মাথা নাড়ল ম্যারিয়ট।

ঠিক ঐ নিশিত রাতে সে দেখা করতে এসেছিল তোমার সঙ্গে।

আবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ম্যারিয়ট.....

———

ভূতুড়ে শিকার

চার্লস ডিকেন্স

আমি বলতে যাচ্ছি যে কাহিনী, তার ভিতর দিয়ে কোন মতবাদ উপস্থিত করা, তার বিরোধিতা করা অথবা তাকে সমর্থন করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি জানি, বার্লিনের পুস্তকবিক্রেতার ইতিহাস ভালভাবে অনুধাবন করেছি, স্যার ডেভিড ব্রুস্টার লিখিত জনৈক পরলোকগত রাজজ্যোতিষীর পত্নীর, ঘটনাটিও আর আমার বন্ধুমহলের মধ্যেই ঘটেছে এরকম অনেক ভৌতিক দর্শনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছি বিস্তারিতভাবে। এই সব সর্বশেষ ঘটনাটি প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার যে এক্ষেত্রে যে মহিলাটি ভূতুড়ে দর্শনের শিকার হয়েছিলেন তিনি কোনদিক থেকেই আমার দূরতম আত্মীয়াও নন।

সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল অনেক বছর আগে ইংলণ্ডের একটি হত্যাকাণ্ড। এরকম কত হত্যাকাণ্ডই তো ঘটে ; একটা হত্যাকাণ্ড আগের হত্যাকাণ্ডটিকে ছাড়িয়ে যায় গুরুত্বের দিক থেকে ; আর পারলে এই বিশেষ নরপশুটির স্মৃতিকে আমি ভুলেই যেতাম, কারণ তার মৃত-

দেহ এখন লিউগেট জেলের কবরেই শুয়ে আছে। তার কোনরকম ব্যক্তিগত পরিচয় আমি দিচ্ছি না ইচ্ছা করেই। হত্যাকাণ্ডটি যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন কিন্তু পরবর্তীকালে এই হত্যার অভিযোগে যে লোকটির বিচার হয়েছিল তার উপর কোনরকম সন্দেহই পড়ে নি। সংবাদপত্রে যেহেতু সে সময় তার উল্লেখমাত্র ছিল না সেইহেতু তখনকার সংবাদপত্র তার কোন বিবরণ প্রকাশিত হওয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু মনে রাখা দরকার এই কথাটা।

সকালবেলাকার প্রাতঃরাশে বসে খবরের কাগজ খুলতেই নজর পড়েছিল হত্যাকাণ্ডটির প্রথম বিবরণের উপর; খুবই আকর্ষণীয় হওয়ায় সেটি পড়লাম বিশেষ মনোযোগ সহকারে। তিনবার না হলে দুবার পড়েছিলাম খুনটি একটি শোবার ঘরে আবিষ্কৃত হয়। সবে নামিয়ে রেখেছি কাগজখানা এমন সময় চকিতে—বিদ্যুৎচমকের মত—বন্যার জলস্রোতের মত—কি যে বলব বুঝতে পারছি না—উপযুক্ত ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না সে অবস্থার বিবরণ দেবার—যেন দেখতে পেলাম সেই শোবার ঘরটা অমার ঘরের ভিতর দিয়ে চলে গেল, অসম্ভব হলেও ঠিক যেন খরস্রোতা নদীর বুকে আঁকা একখানি ছবির মত। যত দ্রুতই সরে যাক না কেন, ছবিটার সব কিছুই আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম; এত স্পষ্ট যে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এটাও পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে বিছানার উপর মৃতদেহটা ছিল।

সেটাও এমন কিছু রোমাণ্টিক পরিবেশ নয় যেখানে এই অদ্ভুত অনুভূতি আমার হয়েছিল—সেণ্ট জেম্‌স্‌ স্ট্রীটের মোড়ের খুব কাছে পিকাডিলির একটা বাসায়। আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন জায়গাটা। আমি তখন শুয়েছিলাম একটা আরাম-কেদারায়; অনুভূতিটা আমাকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে কেদারাটাও তার ফলে খানিকটা সরে গিয়েছিল। জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম নীচে পিকাডিলিতে চলমান সবকিছু দেখে চোখ-দুটোকে একটু তাজা করে নিতে। হেমন্তকালের উজ্জ্বল সকাল; ঝলমলে রাস্তায় খুশির মেলা। জোর বাতাস বইছে। বাইরে তাকাতেই দেখলাম, একঝলক হওয়ায় পার্কের ভিতর থেকে কিছু ঝরাপাতা উড়ে এসে একটা ঘোরানো স্তম্ভ হয়ে উঠল। স্তম্ভটা ভেঙে গেল আর পাতাগুলোও সরে গেল; তখন দেখলাম রাস্তার ওপাশে দুটি লোক পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে যাচ্ছে। একজনের পিছনে আর একজন। সামনের লোকটি মাঝে মাঝেই ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাচ্ছে। দ্বিতীয় লোকটি বিপজ্জনক জঙ্গীতে ডান হাতটা তুলে

প্রায় ত্রিশ পা দূর থেকে তাকে অনুসরণ করছে। প্রথমত, এরকম একটা স্থানে এধরনের অদ্ভুত ও বিপজ্জনকভঙ্গীটাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ; তারপর, আরও আশ্চর্য ব্যাপার যে সেদিকে নজর পড়ছে না কোন লোকেরই। লোক দুটি অন্য সব যাত্রীদের ভিতর দিয়ে এমন অনায়াসে পথ করে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে যেটা ফুটপাতে হাঁটার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না ; যতদূর দেখতে পাচ্ছি, একটি যাত্রীও তাদের পথ ছেড়ে দিচ্ছে না, তাদের স্পর্শ করছে না, বা তাদের দিকে তাকাচ্ছে না। জানালার নীচে দিয়ে যাবার সময় তারা দুজনই চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। দুজনের মুখই এত স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে পরে যে কোন জায়গায় দেখলেই আমি তাদের চিনতে পারব। তাদের মুখে যে উল্লেখযোগ্য কোন লক্ষণ দেখেছিলাম তা কিন্তু নয় ; শুধু সামনের লোকটি অস্বাভাবিক রকমের ঝুঁকে চলেছে, আর পিছনের লোকটির মুখের রং ভেজাল মোমের মত।

আমি অকৃতদার, খানসামা ও তার স্ত্রীকে নিয়েই আমার সংসার। চাকরি করি একটি শাখা ব্যাঙ্কে, আর বিভাগীয় প্রধান হিসাবে আমার কাজের চাপটা আর একটু হাল্কা হলেই আমি খুশি হতাম। আমার একটু বায়ু-পরিবর্তনে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চাকরির খাতিরে হেমন্তকালটা শহরেই আটকে গিয়েছি। আমার ঠিক কোন রোগ হয় নি, তবে ঠিক সুস্থও ছিলাম না। আমার বিখ্যাত ডাক্তারটির মতে আমি "ঈষৎপেটরোগা" তার উপর একঘেয়ে জীবনযাত্রার জন্যই একটা মানসিক অবসন্নতা বোধ করছিলাম। হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা যতই বেশী করে প্রকাশ পাচ্ছিল ততই জনসাধারণের মনোযোগ সেদিকে বেশী করে আকৃষ্ট হচ্ছিল ; আমি কিন্তু সেই সার্বিক উত্তেজনার মধ্যেও যতদূর সম্ভব নিজেকে সে ঘটনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এটা জানতাম যে অভিযুক্ত খুনীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যার রায় পাওয়া গেছে এবং বিচারের জন্য তাকে নিউগেটে চালান দেওয়া হয়েছে। আরও জানতাম যে সাধারণ অসুবিধা এবং আসামীপক্ষের প্রস্তুতির সময়ের অভাবের জন্য কেন্দ্রীয় ফৌজদারি আদালতে মামলার বিচার এক

সেশনের জন্য মুলতুবি রাখা হয়েছে। মুলতুবি মামালার বিচার ঠিক কোন সময় নাগাদ শুরু হবে সেটাও হয়তো আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি সেটা জানতাম না।

আমার বসার ঘর, শোবার ঘর, সাজ-ঘর—সব একই তলায় অবস্থিত। শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে সাজ-ঘরে যাবার অন্য কোন পথ নেই একথা ঠিক, একসময় এই ঘরের একটা দরজা দিয়ে সিঁড়িতে যাওয়া যেত ; কিন্তু বেশ কয়েকবছর হল আমার স্নান-ঘরে নতুন আসবাব বসানোর জন্য সে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সময়ে এবং সেই একই ব্যবস্থা অনুসারে দরজাটাকে পেরেক দিয়ে এঁটে তার উপর চট লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একদিন অনেক রাত শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে চাকরটিকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলাম। আমার মুখটা ছিল সাজ-ঘরে যাবার একমাত্র দরজাটার দিকে, আর সেটা তখন বন্ধই ছিল। চাকরের পিঠটা ছিল সেই দরজার দিকে। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দেখলাম দরজা খুলে গেল, আর একটি লোক ভিতরে তাকিয়ে সাগ্রহে ও রহস্যজনকভাবে ইঙ্গিতে আমাকে ডাকল। পিকাডিলির রাস্তা ধরে যে দুটি লোক হেঁটে গিয়েছিল, এ তাদেরই দ্বিতীয় লোকটি যার মুখের রং ছিল ভেজাল মোমের মত। মূর্তিটি আমাকে ইসারায় ডেকেই পিছিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। শোবার ঘরটা পেরিয়ে যেতে যতটুকু সময় লাগে ঠিক ততটুকু পরেই সাজ-ঘরের দরজাটা খুলে ভিতরে তাকালাম। আগে থেকেই আমার হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি ছিল। সাজঘরে কাউকে দেখতে পাব আমার সেরকম কোন প্রত্যাশা ছিল না, আর কাউকে দেখতে পেলামও না।

যখন বুঝতে পারলাম যে চাকরটি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন তার দিকে ঘুরে বললাম "ডেরিক, তুমি কি বিশ্বাস করবে যে ঠাণ্ডা মাথায় আমি যেন দেখতে পেলাম—"তার বুকের উপর হাতটা রাখতেই সে চমকে উঠে ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল, "হ্যাঁ, প্রভু, হ্যাঁ স্যার! একটি মরা মানুষ আপনাকে ইশারায় ডাকল!"

এই জন ডেরিক বিশ বছরেরও বেশী দিন ধরে আমার কাছে চাকরি করছে ; সে অত্যন্ত বিশ্বাসী ও আমার প্রতি অনুরক্ত, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে আমি তাকে না ছোঁয়া পর্যন্ত এই মূর্তিটাকে দেখার কোন অনুভূতি তার মনে জেগেছিল ; আমি ছোঁয়ামাত্রই সে এমনভাবে

চমকে উঠল যে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমি ছোঁয়ামাত্রই কোন অলৌকিক ভাবে এই অনুভূতি তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

জন ডেরিককে ব্রাণ্ডিটা আনতে বললাম; তাকে এক ড্রাম দিলাম, নিজেও এক ড্রাম খেলাম। সে রাতের ঘটনার আগে কি ঘটেছিল সে কথা ঘুণাক্ষরেও তাকে কিছু বললাম না; ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসে আমার নিশ্চিত ধারণা হল যে পিকাডিলিতে একবার ছাড়া সে মুখ আমি আগে কখনও দেখিনি। দরজা থেকে ইশারায় আমাকে ডাকার সময় তার মুখের চেহারার সঙ্গে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় আমার দিকে তাকানোর সময়কার মুখের চেহারার সঙ্গে তুলনা করে আমার মনে হল যে প্রথম দর্শনেই সে আমার স্মৃতির উপর দাগ কেটেছে, আর দ্বিতীয়বার দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে যাতে তাকে মনে পড়ে যায় সে ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলেছে।

কেন জানি না আমার বিশ্বাস হয়েছিল, মূর্তিটা আর ফিরে আসবে না, তবু রাতটা অস্বস্তিতেই কাটল। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই আমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম; সে ঘুম ভাঙাল জন ডেরিক নিজে এসে; তার হাতে একখানা কাগজ।

মনে হল সেই কাগজখানা নিয়ে দরজার কাছে পত্রবাহক ও আমার চাকরের মধ্যে কিছুটা বাদানুবাদ হয়েছে। ওল্ড বেইলিতে কেন্দ্রীয় ফৌজদারি আদালতে আসন্ন অধিবেশনে আমি যাতে জুরি হিসাবে উপস্থিত থাকি কাগজখানা তারই সমন। আগে কখনও জুরি হবার ডাক আমি পাই নি, আর জন ডেরিক সেটা ভালই জানে। কারণেই হোক আর অকারণেই হোক, তার বিশ্বাস এধরনের জুরিতে সাধারণত যাদের ডাকা হয় তারা গুণের দিক থেকে আমার চাইতে নিম্নশ্রেণীর মানুষ, তাই প্রথমে সে সমনটা নিতে অস্বীকার করেছিল। যে লোক সমন জারি করতে এসেছিল সে ব্যাপারটাকে শান্তভাবেই নিয়েছিল। বলেছিল, আমার জুরিতে উপস্থিত থাকা বা না থাকায় তার কিছু যায় আসে না; সমনটা রইল; সেটা নিয়ে আমি কি করব সে ঝুঁকি আমার, তার নয়।

সে ডাকে সাড়া দেব না অগ্রাহ্য করব, দু' একদিন সেটা স্থির করতে পারলাম না। এ নিয়ে আমার মনে বিশেষ কোন আকর্ষণ-বিকর্ষণ ছিল না। যাই হোক, জীবনযাত্রার একঘেয়েমি ভাবটা কাটাবার জন্যই শেষ পর্যন্ত জুরিতে যাওয়াই স্থির করলাম।

নির্দিষ্ট সকালবেলাটা নভেম্বর মাসের একটা অতি বাজে সকাল ; পিকাডিলি জুড়ে ঘন বাদামী কুয়াশা নেমেছে ; টেম্পল বারের পূর্বদিকটা ঘন কালো হয়ে চেপে বসেছে। আদালত-গৃহের বারান্দা ও সিঁড়ি গ্যাসের আলোয় স্বল্পালোকিত ; আদালত-কক্ষেরও সেই এক অবস্থা। আমার ধারণা, অফিসাররা যখন আমাকে নিয়ে ওল্ড কোর্টে পেঁছে দিল এবং সেখানকার ভিড়টা নিজের চোখে দেখলাম, তার আগে আমি জানতামই না যে সেইদিনই খুনীর বিচার হবে। যথেষ্ট কষ্ট করে আমাকে যখন ওল্ড কোর্টে নিয়ে হাজির করা হল তার আগে আমি জানতাম না আমার হাতের সমন দুটো আদালতের কোনটাতে আমাকে নিয়ে যাবে কিন্তু আমার এই কথাগুলিকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া ঠিক হবে না, কারণ এ ব্যাপারে আমি নিজেই খুব নিশ্চিত নই। অপেক্ষমান জুরিদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় আসন গ্রহণ করলাম এবং কুয়াশার মেঘ ও ভারী বাতাসের ভিতর দিয়ে যতটা ভালভাবে সম্ভব আদালতের চারদিকটা তাকিয়ে দেখলাম। বড় বড় জানালার বাইরে কালো বাষ্প অন্ধকার পর্দার মত ঝুলছে ; রাজপথে ছড়ানো খড় ও কাঠের টুকরোর উপর দিয়ে চাকার চাপা শব্দ ভেসে আসছে ; সমবেত লোকের গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে তার বুক চিরে ভেসে আসছে একটা তীক্ষ্ণ শিস বা উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকির শব্দ। কিছুক্ষণ পরে দুজন জজ এসে তাদের আসনে বসলেন। আদালতের গুনগুনানি হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল। খুনীকে কাঠগড়ায় নিয়ে আসার হুকুম হল। সে হাজির হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি তাকে চিনতে পারলাম··· যে দুটি লোক পিকাডিলির রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়েছিল তাদেরই প্রথম জন।

তখনই যদি আমার নামটা ডাকা হত, তাহলে আমার জবাবটা শোনা যেত কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু আমায় ডাকা হল তালিকার ষষ্ঠ বা অষ্টম জুরি হিসাবে, আর ততক্ষণ আমি কোনরকমে জবাব দিতে পারলাম, "এখানে!" তারপর শুনুন। আমি কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে যেতেই বন্দী হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে ইশারায় তার এটর্নিকে ডাকল ঃ আমার কাজে বাধা দিতে বন্দীর ইচ্ছাটা এতই স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেল যে কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ থাকল ; সেই সময়টা এটর্নি কাঠগড়ায় হাত রেখে তার মক্কেলের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলতে বলতে মাথা নাড়তে লাগল। পরে সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই জেনেছিলাম, বন্দী প্রথমেই সভয়ে তাকে

বলেছিল, 'যেকোন ঝুঁকি নিয়ে এই লোকটিকে বাধা দিন!' কিন্তু যেহেতু তার বক্তব্যের সপক্ষে সে কোন যুক্তি দেখায় নি, এবং নিজেই স্বীকার করেছে যে আমার নাম শোনার আগে সে কোনদিন আমার নামটাও জানত না, তাই তার কথামত কাজ করা হয়নি।

আমাকে জুরির মুখপাত্র নির্বাচিত করা হল। বিচারের দ্বিতীয় দিন দু'ঘণ্টা ধরে সাক্ষ্য গ্রহণের পরে সহযোগী জুরিদের দিকে চোখ পড়তেই তাদের সংখ্যা গুণতে গিয়ে আমি একটা দুর্বোধ্য অসুবিধায় পড়ে গেলাম। পরপর কয়েকবার গুনলাম, কিন্তু একই অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। এককথায়, প্রত্যেকবারই একজন বেশী হয়ে যাচ্ছে।

আমার ঠিক পাশে যে জুরিটি বসেছিলেন তাকে ছুঁয়ে কানে কানে বললাম, "আমরা কজন আছি দয়া করে গুনে দেখুন না।" আমার অনুরোধ শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু মাথা ঘুরিয়ে গুনতে লাগলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "কেন আমরা তো তেরো—কিন্তু না, তা তো হতে পারে না। আমরা বারোজন।" সেদিন আমরা গণনা অনুসারেও একজন একজন করে ঠিকই গুনেছি, কিন্তু একসঙ্গে গুনতে গেলেই একজন বেশী হতে লাগল। অথচ তার কোন হিসাব বা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে এমন একটি মূর্তি ক্রমে গড়ে উঠেছে যে সেটা প্রতিবারেই এসে হাজির হতে লাগল।

জুরিদের বাসা দেওয়া হয়েছিল লণ্ডন ট্যাভার্ণে। একটা বড় ঘরে আলাদা আলাদা টেবিলে আমরা সকলেই ঘুমিয়েছি; আমাদের নিরাপদ রাখার জন্য একজন অফিসার সব সময় আমাদের উপর নজর রাখতেন। অফিসারটি আসল নাম চেপে রাখার কোন কারণ আমি দেখি না। তিনি বুদ্ধিমান, অত্যন্ত বিনয়ী, সেবাপরায়ণ, এবং শহরের একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। তার উপস্থিতি সব সময়ই স্বাগত, সুন্দর দুটি চোখ, ঈর্ষা করার মত কালো গোঁফ, আর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। নাম মিঃ হার্কার।

রাত হলে আমরা যখন বারোটায় বিছানায় শুতে গেলাম, তখন মিঃ হার্কারের বিছানাটা পাতা হল দরজা বরাবর। দ্বিতীয় দিন রাতে শুতে

যাবার ইচ্ছা না হওয়ায় এবং মিঃ হার্কারকে তার বিছানায় বসে থাকতে দেখে আমি গিয়ে তার পাশে বসলাম, নস্যের ডিবেটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। আমার ডিবে থেকে এক টিপ নস্য নেবার সময় মিঃ হার্কারের হাতটা আমার হাতকে স্পর্শ করল ; ঠিক তখনই তিনি যেন একটু শিউরে উঠলেন ; বললেন, "ও কে ?"

মিঃ হার্কারের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ঘরের মধ্যে তাকাতেই আবার সেই প্রত্যাশিত মূর্তিটাকে দেখতে পেলাম—পিকাডিলির রাস্তা ধরে যারা হেঁটে গিয়েছিল তাদেরই দ্বিতীয়জন। উঠে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম ; তারপর থেমে মিঃ হার্কারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে হাসতে হাসতে বললেন, "মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল যে বিছানা না থাকলেও একজন ত্রয়োদশ জুরি এখানে ছিলেন, কিন্তু এখন দেখছি সেটা চাঁদের আলো।"

মিঃ হার্কারকে কোন কথা না বলে তাকে আমার সঙ্গে ঘরের শেষপ্রান্তে হেঁটে যেতে অনুরোধ করলাম ; মূর্তিটা কি করে দেখার ইচ্ছা হল। আমার এগারোজন সহযোগী জুরির বিছানার পাশে বালিশটাকে ঘেঁসে সে কয়েক মিনিট দাঁড়াল। প্রতিবারই বিছানার ডানদিক ধরে গেল এবং পরবর্তী বিছানাটার পায়ের দিক দিয়ে সেটাকে পার হতে লাগল। মাথার ভঙ্গী দেখে মনে হল, প্রতিটি শায়িত মূর্তির দিকে সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আমার বিছানাটা ছিল মিঃ হার্কারের বিছানার সবচাইতে কাছে ; সে কিন্তু আমার দিকে বা আমার বিছানার দিকে দৃষ্টিই দিল না। একটা উঁচু জানালা দিয়ে যেখানে চাঁদের আলো এসে পড়ছে সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেল ; মনে হল যেন বাতাসের সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল।

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের সময় মনে হল, আমি ও মিঃ হার্কার ছাড়া উপস্থিত অন্য সকলেই গত রাতে নিহত লোকটিকেই স্বপ্নে দেখেছে।

এখন আমারও দৃঢ় ধারণা হল যে পিকাডিলি ধরে যাওয়া দ্বিতীয় লোকটিই খুন হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘটনাও একদিন ঘটল, আর এমন ভাবে ঘটল যার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

বিচারের পঞ্চম দিনে সরকার পক্ষের সওয়াল শেষ হবার মুখে নিহত লোকটি একটি ছোট 'টবি' প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা হল। খুনের

খবর জানার পর লোকটি তার শোবার ঘর থেকে উধাও হয়ে যায় এবং খুনীকে যেখানে মাটি খুঁড়তে দেখা যায় সেখানকার একটা গুপ্ত স্থানে মৃতদেহ পাওয়া যায়। সাক্ষী ছবিটাকে সনাক্ত করার পরে সেটাকে আদালতের হাতে তুলে দেওয়া হল এবং সেখান থেকে জুরিদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কালো গাউন-পরা অফিসারটি যখন সেটিকে নিয়ে আমার দিকে আসছিল তখন পিকাডিলির রাস্তার দ্বিতীয় লোকটির মূর্তিটি ভিড়ের ভিতর থেকে উঠে এসে অফিসারের হাত থেকে ছবিটা তুলে নিয়ে সেটা আমার হাতে দিল, আর সেই সঙ্গে নীচু ফাঁকা গলায় বলল,—ছবিটা তখনও আমি দেখিনি, কারণ সেটা ছিল একটা লকেটের মধ্যে,—'তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম, আমার মুখটা তখন এত রক্তশূন্য ছিল না।' আমার পরবর্তী যে জুরিকে আমার ছবিটা দেবার কথা মূর্তিটি তখন আমার ও তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর সেই জুরি ও পরবর্তী জুরির মাঝখানে গেল ; এইভাবে সে ছবিটা আমাদের সকলের হাত ঘুরিয়ে আবার আমাকে এনে দিল। অবশ্য তারা কেউই ব্যাপারটা ধরতে পারল না।

টেবিলে ফিরে এসে, এবং সাধারণত আমরা সকলে যখন বন্ধ ঘরে মিঃ হার্কারের হেপাজতে এসে জমায়েত হতাম। তখন প্রথম থেকেই মামলার দৈনন্দিন বিবরণ নিয়ে প্রচুর আলোচনা করতাম। পঞ্চম দিনে সরকার পক্ষের সওয়াল শেষ হয়ে যাওয়ায় ঘটনার একটা মোটামুটি চেহারা আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠল এবং আমাদের আলোচনা বেশ উত্তেজনাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। আমাদের মধ্যে একজন গির্জার লোক ছিলেন—তার মত আকাট বোকা আমি আর দেখি নি, অতি পরিষ্কার সব প্রমাণ সম্পর্কে ও তিনি অদ্ভুত সব আপত্তি তুলতেন, তার সমর্থক ছিলেন আরও দুজন সাকরেদ পাদরি ; একই জেলা থেকে আগত এই তিন মূর্তি সারাক্ষণ এমন হৈ-চৈ করতেন যে পাঁচশ খুনের দায়ে তাদের বিচার হওয়া উচিত। এই তিন অপদার্থ নির্বোধ যখন মাঝরাত নাগাদ গলা একেবারে সপ্তমে চড়ালেন, এবং আমাদের কেউ কেউ বিছানা পাততে শুরু করলেন, তখন আবার আমি সেই নিহত লোকটিকে দেখতে পেলাম। কঠোর মুখে তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে সে আমাকে ইশারায় ডাকল। তাদের কাছে গিয়ে আলোচনায় যোগ দিতেই সে সঙ্গে সঙ্গে

থেকেই সেই লম্বা ঘরটায় বার বার তার আবির্ভাব ঘটতে লাগল। সহযোগী জুড়িরা যখনই তাদের মাথাগুলি একত্র করে আলোচনায় মেতে ওঠে তখনই তাদের মাঝখানে আমি দেখতে পাই নিহত লোকটির মাথা। যখনই তাদের মতামত তার বিপক্ষে যায়, সে তখনই গম্ভীরভাবে আমাকে ইসারায় ডাকে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বিচারের পঞ্চম দিনে ছোট ছবিটা হাজির করার আগে পর্যন্ত সে মূর্তিটিকে কখনও আদালতে দেখতে পাই নি। আসামীপক্ষের সওয়াল আরম্ভ হতেই তিনটি পরিবর্তন দেখা দিল। প্রথমে তার দুটিকে একসঙ্গে উল্লেখ করব। মূর্তিটি এখন অনবরত আদালতেই দেখা দিচ্ছে, আর সেখানে আমাকে কিছু না বলে যখন যিনি সওয়াল করেন তাকে লক্ষ্য করেই কথা বলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—নিহত লোকটির গলাটা সরাসরি কেটে ফেলা হয়েছিল। বক্তৃতার গোড়াতেই বলা হল যে নিহত লোকটি নিজেই তার গলাটা কেটে থাকতে পারে। সেই মুহূর্তেই মূর্তিটি সেই রকম গলা-কাটা বক্তার হাতের কাছে দাঁড়িয়ে একবার ডান হাতে, একবার বাঁ হাতে শ্বাসনালীটার এ-পাশ ও-পাশ দেখিয়ে বক্তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে এরকম একটা ক্ষত কোন হাত দিয়েই নিজে নিজে সৃষ্টি করা অসম্ভব। আরও একটা দৃষ্টান্ত—জনৈক সাক্ষী যখন বলল যে বন্দীর মত ভাল মানুষ হয় না, তখন মূর্তিটি সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে একটা হাত ও একটা আঙুল বাড়িয়ে বন্দীর কুৎসিত মুখটাকে দেখিয়ে দিল।

তৃতীয় পরিবর্তনটি আমার কাছে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। আমি কোন মতবাদ তৈরী করতে চাইনা ; শুধু সঠিক বিবরণ দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। যদি মূর্তিটা যাদের লক্ষ্য করে ইঙ্গিতে কিছু বলে তারা কেউই দেখতে পায় না, তবু সে যখন তাদের গা ঘেঁসে দাঁড়ায় তখন তাদের মধ্যে একটা বিচলিতভাব ও ত্রাস দেখা দেয়। আমার মনে হয়, আমার অজ্ঞাত কোন নিয়মের বশেই মূর্তিটি অপরের কাছে পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, অথচ স্বয়ং অদৃশ্য থেকে সে নীরবে তাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আসামীপক্ষের সুদক্ষ কৌঁসুলি

যখন আত্মহত্যার সম্ভাবনার কথা তুললেন এবং মূর্তিটি বিজ্ঞ ভদ্রলোকের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ভয়ংকরভাবে করাত চালানোর ভঙ্গীতে নিজের কাটা গলাটা দেখাল, একথা অস্বীকার করা যাবে না যে তখন কেঁসুলি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সুকৌশল আলোচনার সূত্র হারিয়ে ফেললেন, রুমাল দিয়ে কপাল মুছলেন, এবং অত্যন্ত বিবর্ণ হয়ে গেলেন। আরও দুটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে, বিচারের অষ্টম দিনে দুপুরের পরে কয়েক মিনিট বিশ্রাম ও জলযোগের বিরতির পরে জজদের আসার একটু আগেই অন্য জুরিদের নিয়ে আমি আদালতে ফিরে এলাম। চারদিকে তাকিয়ে মনে হল মূর্তিটি সেখানে নেই; কিন্তু গ্যালারির দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম একটি সুদর্শনা নারীর গায়ে ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে নিশ্চিত জানতে চাইছে জজরা তাদের আসন গ্রহণ করেছেন কিনা। সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটি আর্তনাদ করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন, তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। যে শ্রদ্ধেয়, প্রাজ্ঞ ও ধৈর্যশীল জজসাহেব বিচার পরিচালনা করছিলেন তার বেলায়ও তাই ঘটল। বিচার শেষ হয়ে গেলে তিনি কাগজপত্র নিয়ে স্থির হয়ে বসেছেন এমন সময় নিহত লোকটি জজের দরজা দিয়ে ঢুকে লর্ডশিপের ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল, সামনের কাগজে তিনি কি লিখছেন সেটা দেখার জন্য সাগ্রহে তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল। লর্ডশিপের মুখটা কেমন যেন বদলে গেল; তাঁর হাত থেমে গেল; একটা অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল তার দেহে; সে শিহরণ আমি ভাল করেই চিনি; কাঁপা গলায় তিনি বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, কয়েক মুহূর্তের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। এখানকার দূষিত বাতাসে আমার কষ্ট হচ্ছে।" এক গ্লাস জল না খাওয়া পর্যন্ত তিনি সুস্থ হলেন না।

সেদিন অন্তহীন দশদিনের ছটি দিনের একঘেয়েমির মধ্যে আদালতে সেই একই বিচারক ও অন্য লোকজন, কাঠগোড়ায় সেই একই খুনী, টেবিলে সেই একই উকিলের দল, আদালতের ছাদ-ফাটানো সেই একই প্রশ্নোত্তর, জজদের কলমের সেই একই খস্ খস্ আওয়াজ, একই লোক-

জনের আসা যাওয়া, দিনের আলো থাকা সত্ত্বেও একই সময়ে সেই একই আলো জ্বালানো, কুয়াশা পড়লে বড় বড় জানালার বাইরে সেই একই কুয়াশার পর্দা, বৃষ্টি হলে সেই একই ঝিরঝির শব্দ, একই করাতের গুঁড়োর উপর দিনের পর দিন সেই একই তালা খোলার লোক ও বন্দীর পায়ের দাগ, একই ভারী দরজায় সেই একই চাবি লাগানো ও খোলা—সেই ক্লান্তিকর একঘেয়েমির মধ্যে আমার মনে হতে লাগল আমি যেন অনেককাল ধরে জুরিদের মুখপাত্র হয়ে আছি; পিকাডিলি যেন ব্যাবিলনের সমসাময়িক হয়ে জেগে উঠেছে, আমার চোখে নিহত লোকটির স্পষ্টতা এতটুকু কমে নি বা কোন সময়ই তাকে অন্য সকলের চাইতে কম স্পষ্ট মনে হয়নি। বস্তুত একটা কথা না বললে চলে না—যে মূর্তিটিকে আমি নিহত লোক বলছি সে কিন্তু একটিবারও খুনীর দিকে তাকাচ্ছে না। বারবার ভেবেছি অবাক হয়ে সে তাকাচ্ছে না কেন? কিন্তু সে তাকায় নি কখনও।

ছোট ছবিটি উপস্থাপিত হবার পর থেকে বিচার শেষ হবার শেষ কয়েকটি মিনিট আগে পর্যন্ত সে কিন্তু আমার দিকেও তাকায় নি। রাত দশটা বাজতে সাত মিনিট আগে আলোচনা করার জন্য আমরা সকলে একত্রে বসলাম। কিন্তু গির্জার সেই বোকা লোকটি ও তার দুই সমগোত্রীয় অনুরাগী এমন অসুবিধার সৃষ্টি করতে লাগলেন যে জজসাহেবের মন্তব্য নতুন করে পড়িয়ে শোনাবার জন্য দুবার আমাদের আদালতে যেতে হল। আমাদের মধ্যে ন'জনের সে মন্তব্য সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না; আমার বিশ্বাস, আদালতের কারও ছিল না; কিন্তু সেই মাথা মোটা ত্রিমূর্তির বাধা দেওয়া ছাড়া অন্য কাজ না থাকায় অকারণেই বারবার আপত্তি তুলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের মতই বজায় রইল, এবং বারোটা বেজে দশ মিনিটের সময় জুরি আদালতে ফিরে গেল।

নিহত লোকটি তখন আদালতের অন্যদিকে জুরিদের আসনের ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়েছিল। আমি আসনে বসলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তাকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হল; এই

প্রথম সে হাতের উপরে একখানি বড় মাপের ধূসর অবগুণ্ঠন নিয়ে এসেছিল ; ধীরে ধীরে সেটা দিয়ে সে নিজের মাথা ও সারা শরীর ঢেকে দিল। আমি যখন রায় ঘোষণা করে বললাম, "দোষী" তখন সেই অবগুণ্ঠনটা খসে পড়ল ; সব উধাও ; তার জায়গাটা ফাঁকা।

জজসাহেব প্রথা অনুসারে যখন জিজ্ঞাসা করলেন খুনীকে মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে তার কিছু বলার আছে কি না, তখন সে যা বলল বিড়বিড় করে পরদিন প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে তার বর্ণনা দিয়ে বলা হল কয়েকটি কাটাকাটি অসংলগ্ন প্রায় অস্পষ্ট শব্দ যাতে সে অভিযোগ করেছে যে তার প্রতি সুবিচার করা হয় নি কারণ জুরিদের মুখপাত্রটি আগে থেকেই তার প্রতি বিরূপ ছিলেন। যে উল্লেখযোগ্য কথাগুলি সে বলেছিল আসলে সেটা এই—

মাই লর্ড, যখন তার আসনে বসলেন জুরিদের মুখপাত্র মহাশয় আমি তখনই জানতাম মৃত্যু আমার অনিবার্য। মাই লর্ড তিনি আমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না আমি জানতাম কারণ তিনি যেভাবেই হোক রাতে আমার বিছানার পাশে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়েছিলেন আমাকে বন্দী করার আগেই এবং একটা দড়ি পরিয়ে দিয়েছিলেন আমার গলার।

———

আমার ভূত দর্শন

এইচ, জি, ওয়েলস্

ক্লেটন হঠাৎ বলে উঠে ক্লাবে সকলে মিলিত হলে, গতকাল রাতটা আমি এই ক্লাবে কাটিয়েছি। আর আমি গ্রেপ্তার করি সে সময় একটা ভূতকেও।

সকলে কৌতূহলী হয়ে ওঠে ভূতের কথা শুনে। সকলে ঘিরে ধরে ক্লেটনকে। অনুরোধ জানায় সব ব্যাপারটা খুলে বলতে।

কেউ কেউ পরিহাস করে ব্যাপারটা নিয়ে। সব ব্যাপারটাই যে ডাহা বানানো মিথ্যে সে কথা বলতে ছাড়ে না।

কিন্তু তাদের কথা গায়ে মাখে না ক্লেটন। সে স্পষ্টভাবে বলে, আমি ভূত-টুত বিশ্বাস করতাম না আপনারা সকলেই বেশ ভাল করেই জানেন। কাজেই ব্যাপারটা বেশ ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে অনুরোধ জানায় ক্লেটনকে, অযথা ভূমিকা না বাড়িয়ে আসল ঘটনা বলতে।

ক্লেটন গভীর নিঃশ্বাস ফেলে। নিশ্চয় বলব। ভূতের যখন দেখা হয়

আমার সঙ্গে, তখন খুবই শোচনীয় অবস্থা বেচারার। আমার জানা ছিল না ভূত যে কাঁদতে পারে।

একটা চুরুট ধরিয়ে ক্লেটন বেশ আয়েশ করে বসে। তাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল প্রথম থেকেই। চুরুটে সে বেশ বড় করে একটা টান দেয়। ধীরে ধীরে বলে, আমরা সাধারণত যে সব ভূতের কথা বলি তারা একই জায়গায় ঘুর ঘুর করে সব সময়। ভয় দেখায় লোকদের।

আমার দেখা ভূতটা কিন্তু সে বিভাগে পড়ে না। সে যেন অন্য রকমের। কথা কটা বলে ক্লেটন ক্লাবঘরের চারিদিকে চোখ বোলায়।

আবার টান দেয় চুরুটে। বলে ভূতটাকে প্রথম আমি দেখতে পাই। কেননা, সে আমার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়েছিল। ওর দেহটা কি রকম যেন স্বচ্ছ ও সাদাটে। তাছাড়া ওর দেহটা ভেদ করে দূরের জানালার আলো আমি ভাল করে দেখতে পাই। আমার সুবিধে মনে হয় না ওর হাবভাব। মনে হয়, কিছু একটা করার তার ইচ্ছে। কিন্তু কি যে করবে তা ভেবে পাচ্ছে না। কাঠের দেওয়ালে এক হাত দিয়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। আর এক হাত মুখের কাছে নিয়ে নাড়াচ্ছে।

ক্লেটন থামার সঙ্গে সঙ্গে স্যাণ্ডারসন নামে এক সদস্য বলে উঠে, কি রকম ছিল ভূতটার চেহারা?

ক্লেটন চুরুটে টান দিয়ে মুখের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, বেশ রোগাই ছিল তা বলতে গেলে। লম্বায় বেঁটে খাটো। মাথায় কদম ছাঁটের চুল। স্বাভাবিক নয় কান দুটো। দেহের তুলনায় কাঁধ খুবই সরু, গায়ে ছিল কলার দেওয়া রেডিমেট জ্যাকেট, পরনে ছিল হাঁটু ছেঁড়া বেশ ঢোলা প্যাণ্ট।

প্রথমে নিঃশব্দে আমি দোতলায় উঠি। আমার পায়ে হালকা চটি ছিল। আমার হাতে কোন আলো ছিল না। সিঁড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পাই ওকে। দাঁড়িয়ে পড়ি। খুব ভাল করে ভূতটাকে লক্ষ্য করি। সে সময় অবশ্য আমি বিন্দুমাত্র ভয় পাই না। বরঞ্চ আমার কৌতূহল বেড়ে যায়। মনে মনে ভাবি, বিগত পঁচিশ বছর ধরে আমি

ভূতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এসেছি। বয়সকালে একে দেখার আমার সৌভাগ্য হল। আমাকে দেখতে পায় এক সময় ভূতটা। সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। এবার ভূতটাকে আরও ভালভাবে দেখতে সুযোগ পাই। ভূতটাকে আমার অপরিণত বয়স্ক মনে হয়। নাক, মুখ ইত্যাদি বেশ সুন্দর নয়। সবে ওঠা খোঁচা খোঁচা গোঁফ ঠোঁটের ওপরে।

ভূতটাও বেশ ধৈর্য্য সহকারে আমাকে দেখে। ভূতের করণীয় কর্তব্য ব্যাপারে সজাগ হয়। সে বেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। নিয়ম অনুসারে মাথাটা সামনের দিকে এগোয়। লম্বা লম্বা হাত দুটো দেহের দুপাশে ঝুলিয়ে দেয়। মুখটা খুলে মৃদু শব্দ করে। পায়ে পায়ে আমার দিকে এগোতে থাকে।

আমি কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় পাই না। কেননা, তখন সদ্য আমি নেশা করেছিলাম! নেশার ঝোঁকেই বলা যায় যে, উল্টে আমিই ভূতটাকে বেশ জোরে ধমক দিই। বলি, বোকার মত চিৎকার কোরো না! তোমার ডেরাটা তো এটা নয়! এখানে এসে শুধু শুধু ঝামেলা করছ কেন?

আমার ধমক খেয়ে ভূতটা বেশ জড়ো সড়ো হল। আগের মত নাকি সুরে ওঁ ওঁ ওঁ বলে মৃদু চিৎকার করে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে আমি প্রশ্ন করি, তুমি যে এখানে মজাশে দাঁড়িয়ে আছ, তুমি কি এই ক্লাবের মেম্বার? মেম্বার ছাড়া এ ক্লাবে প্রবেশ করা দণ্ডনীয়।

এ ছাড়া, আমি যে ভূতটাকে কেয়ার করি না, তা বোঝাবার জন্য আমি ওর ছায়া সর্ব্বস্ব দেহের একটা কোণের ভেতর দিয়ে দোতলার বারান্দায় যাই। মোমবাতি জ্বালাতে চেষ্টা করি।

তবে ভূতটার ওপর থেকে আমি আমার নজর সরাই না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করি, আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু আমি এখনও পাই নি!

ভূতটা আমার প্রশ্নে হোক, কিংবা আমার বেপরোয়া ভাব দেখে বারান্দায় চলা ফেরার যথেষ্ট পথ রেখে একপাশে দাঁড়ায়। বিষণ্ণভাবে বলে, না আমি আপনাদের ক্লাবের মেম্বার নই। তবে আমি হলাম একজন ভূত। আসলে ভূতটা আমাকে ভয় পাওয়াতে চাইছে।

আমিও বেপরোয়া ভাব দেখাই। বলি মেম্বার ছাড়া ক্লাবে ঘোরা ফেরা খুবই নিন্দনীয়। তা হলে কি তুমি ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছো ?

অবশ্য আমাকে প্রত্যেকটি কথা খুবই হিসেব করে বলতে হচ্ছিল। পাছে ভূতটা আমার মনের দুর্বলতার কথা টের পেয়ে যায়।

অতি কষ্টে আমি একটা মোমবাতি জ্বালি। মোমবাতি হাতে ভূতটার দিকে ঘুরে দাঁড়াই। প্রশ্ন করি, আসলে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে ? মোমবাতির আলোয় ভূতটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সুবোধ বালকের মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে আস্তে আস্তে বলে, প্রকৃত পক্ষে আমি এখানে এসেছি মানুষদের ভয় দেখাতে।

ভূতের কথায় আমার কৌতুহল জাগে। আবার প্রশ্ন করি, এ বুদ্ধিটা তোমাকে কে দিল ?

ভূতটা আমতা আমতা করে বলে, আমি একজন ভূত। ভূত সব সময় জীবন্ত মানুষদের ভয় দেখায়। আমিও আমার মহান কর্তব্য পালন করতে এখানে এসেছি।

আমিও ছাড়বার পাত্র নই।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, এটা ভদ্রলোকের ক্লাব। এখানে ক্লাবের সদস্যদের অনুমতি ছাড়া কারও কিছু করার অধিকার নেই। তা ছাড়া, এই ক্লাবে মহিলা ও শিশুরা আসে। তারা যদি একটিবার তোমার শ্রীবদন-খানা দেখে, তা হলে সত্যি সত্যি ভয় পাবে। ক্লাবের বদনাম হবে। এসব কথা কি একটি বারের জন্যও ভেবে দেখেছো ?

ভূতটা মাথা চুলকায়। অপ্রস্তুতভাবে বলে, আজ্ঞে না, সে রকম কিছু ভাবিনি !

তা হলে কি তুমি এ জায়গায় খুন হয়েছিলে ?

আজ্ঞে তাও নয়। তবে জায়গাটা দেখার পর কেন জানি না, জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়। কেননা এখানকার পরিবেশ সেকালের মত।

কথা বলতে বলতে ভূতটা একটা চেয়ারে বসে পড়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

আমি ভূতটার কাছে যাই। বলি, এ কি হচ্ছে ? এভাবে কাঁদলে কি সমস্যার সমাধান হবে ?

কথা বলতে বলতে অভ্যাস বশত ভূতের পিঠে হাত দিতে যাই।

কিন্তু আমার হাতটা ভূতের ছায়াশরীর ভেদ করে নিচে নামে।

আমি সমস্ত শরীরে শিহরণ অনুভব করি। কয়েক পা পিছিয়ে আসি। ওকে সাহায্য করবার জন্য আমিও হাত দুটো দিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গি করতে শুরু করি।

স্যাণ্ডারসন মন্তব্য করে, শেষ পর্যন্ত ভূতটা তোমার সহায়তায় সাফল্য মণ্ডিত হল ?

তুমি ঠিকই ধরেছো স্যাণ্ডারসন। অতি কষ্টে ভূতটার মনোবল ফিরিয়ে আনি। ওকে এক রকম জোর করে দাঁড় করাই। নানান রকম ভঙ্গি ভূতটাকে দেখাই।

ভূতটা মনোযোগ দিয়ে আমার নানান ভঙ্গি দেখে। পরে বলে আপনাকে দেখে আমি বেসামাল হয়ে পড়ছি।

অগত্যা আমি ভূতটার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াই। আয়নার মাধ্যমে ওর ওপরে লক্ষ্য রাখি।

আমাকে পেছন ফিরতে দেখে ভূতটা সঙ্গে সঙ্গে নানান রকম ভঙ্গি করতে শুরু করে। এক সময় শেষ ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে দেয়।

কথা বলতে বলতে ক্লেটন ভূতের সেই ভঙ্গিটা নিজে করে দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে ভূতটা নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ঠিক সে সময় ক্লাবের ঘড়ি সশব্দে রাত একটা ঘোষণা করে।

এতক্ষণ ইভান্স চুপ করে ছিল। সে এবার প্রশ্ন করে, তারপর তুমি কি করলে ক্লেটন ?

তারপর, তারপর আর কি করব ? ততক্ষণে নেশা আমার কেটে গেছে। আমি ঘুমিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করতে চেষ্টা করি।

ক্লেটনের বক্তব্য সকলে বিশ্বাস করতে পারে না।

বিশেষ করে প্রাচীন ও বর্তমান স্থাপত্য বিষয়ে গবেষক স্যাণ্ডারসন ভূতের দেহের ভঙ্গিগুলো বিশ্বাস করে না। ক্লেটনকে ও ভঙ্গিগুলো দেখাতে বলে। অন্য সদস্য ইভান্স বাধা দেয়। বলে তার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা ও সব ভঙ্গি করতে গিয়ে ক্লেটনের কোন ক্ষতি হয় না নিশ্চয়ই আমরা সহজভাবে নিতে পারব না!

অন্য সদস্য সমর্থন জানায় উইশ ইভান্সকে।

ক্লেটন তবুও ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়ায়। অল্প সময় নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করে। পরে তার হাত জোড়া সমান্তরালভাবে সামনের দিকে এগোয়...

দেহের বিভিন্ন ভঙ্গিমা করার পর স্যান্ডারসন বলে ওঠে বেশ মোটা-মুটি ভঙ্গিমা আয়ত্ব করেছো ভূতের কাছ থেকে। কিন্তু শেষের ভঙ্গিটা তুমি কিন্তু করোনি ক্লেটন।

হাসে ক্লেটন। বলে, জানি আমি। তবে ভূতটা অদৃশ্য হয়েছিল ঐ ভঙ্গির পরেই। তবু স্যান্ডারসন ছাড়ার পাত্র নয়। বিজ্ঞানের যুগে সে এ জাতীয় মনের দুর্বলতাকে পরিহাস করে।

অন্যান্যদের আপত্তি সত্বেও ক্লেটন আবার নূতন করে ভূতের অদৃশ্য হওয়ার ভঙ্গিগুলো শুরু করে।

এক সময় সব কটা অঙ্গ-ভঙ্গি করে ক্লেটন স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

ক্লেটন সে মজার গল্প তৈরী করেছে সে বিষয়ে সদস্যদের কোন সন্দেহ থাকে না।

যখন সকলে ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করছে, তখন আসলে কিন্তু ক্লেটনের মুখমণ্ডল পাল্টাতে শুরু করে। মৃতের মত স্থির হয়েছে তার চোখ। শক্ত হয়ে গেছে শরীরটা। নিশ্চল পাথরের মত হলেও অল্প অল্প দুলতে থাকে। তারপরেই হঠাৎ একই সঙ্গে ঘরের চেয়ার আসবাবপত্র ইত্যাদি আপনা আপনি মেঝেতে আছড়ে পড়তে শুরু করে। সকলে ব্যস্ত হয়। ভয়ও পায়।

ক্লেটনের দেহটা মাটিতে আছড়ে পড়ে দাঁড়ানো অবস্থায়। কোন লক্ষণই দেখা যায় না ওঠার। ইভান্স ক্লেটনকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে।

কিছুক্ষণ ধরে কথা বলতে পারে না ক্লাবের কোন সদস্যই। হকচকিয়ে যায় সকলেই।

স্যান্ডারসন সঙ্গে সঙ্গে ক্লেটনের দেহ পরীক্ষা করে ক্লেটনকে মৃত বলে অভিমত ব্যক্ত করে।

রিচার্ড হিউয়েস

সেদিন সন্ধ্যায় আমি দশ-বিশটা আরামদায়ক গোলাবাড়ি আর ছাউনী পেরিয়ে এসেছিলাম ঠিকই কিন্তু তার একটাও আমার পছন্দ হয় নি। বড় আঁকা-বাঁকা আর কাদায় ভরা ওরচেসটারশায়ারের গলিগুলো। আমি একখানা খালি কুঁড়েঘর দেখতে পেলাম সন্ধ্যার মুখোমুখি। একটু দূরে রাস্তা থেকে ঘরখানা আগাছায় ভরা একটা নোংরা বাগানের মধ্যে। ঘর-খানাকে কেমন অদ্ভুত লাগছিল আসন্ন ম্লান রক্তিম আলোয়। এই ঘরখানা হবে আমার রাতের আস্তানা।

প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে সারাদিন। হাওয়ার বেগ এখনও কমে নি বৃষ্টি থামলেও। এখনও সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে বাগানের ফলের গাছগুলোর ডালপালার মধ্য দিয়ে। বাগানের এদিকে ওদিকে বাতাসের বেগে পাতার উপর জমে থাকা বৃষ্টির জল ছিটকে পড়েছে। এ বাগানে বুঝি এখনও বৃষ্টির শেষ হয় নি বাইরে বর্ষণ থামলেও।

বেশ শক্ত পোক্ত বলেই মনে হচ্ছে কুটিরের ছাদটাকে। আশা করা যায় বৃষ্টির জল ঢোকে নি ভিতরে—বেশ শুকনোই আছে ভিতরটা।

শুকনো জায়গা দরকার। কেননা বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে আমার পোষাক পরিচ্ছদগুলো।

মনস্থির করে ফেললাম। রাত কাটাব এ বাড়িতেই। রাস্তার সামনের দিকে তাকালাম। লোকজন নেই কোন। এমনিতেই জনবিরল ওরচেস-টারশায়ারের এদিকটা। তার উপর আবার বর্ষণক্ষান্ত সন্ধ্যা। কে বেরোবে এমনি সময়ে ঝড়ের মধ্যে কাদায় ভরা পথে? অতএব একটা দিক থেকে নিশ্চিন্ত। কেউ আমাকে অভিযুক্ত করতে পারবে না অনধিকার প্রবেশের দায়ে।

একটা লোহার কাঠি বের করলাম কোটের 'লাইনিং'-এর ভিতর থেকে। খুব একটা অসুবিধা হল না সেটার সাহায্যে বন্ধ দরজা খুলে ফেলতে। দরজার এপিঠে ছিল একটা মরচেধরা পুরনো তালা আর ওপিঠে ছিল দু'টো ছিটকিনি। কোন সমস্যাই নয় এগুলো খোলা।

প্রবেশ করলাম। ভিতরে জমাট অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে, দেশলাই জ্বাললাম। একটা ওয়াটারপ্রুফ মোড়কের মধ্যে থাকায় এটা ভিজে অকেজো হয়ে যায়নি। একটা অন্ধকার পথের কালো মুখ কাঠির ম্লান আলোয় দেখলাম। কাঠিটা নিভে গেল হাওয়ার দমকে আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। অবশ্য কোন প্রয়োজন ছিল না এতটা সতর্কতার কারণ লোকালয় থেকে দূরে নির্জন পথে আসন্ন রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারে আমার দেশলাই কাঠির অতি ক্ষীণ আলো আর কোন পথিকের চোখে পড়ে তাকে কৌতূহলী করে তুলবে, কোন কারণ ছিল না এমন আশঙ্কা করবার। তবুও সাবধানের মার নেই।

কাঠি জ্বাললাম আর একটা। এগোলাম অন্ধকার পথে তার আলো-টুকু সম্বল করে। কাঠি নিভে গেল। আর একটা কাঠি জ্বাললাম। এসে পড়লাম পথের শেষে এমনি করে কাঠি জ্বালতে জ্বালতে। ছোট একখানা ঘর সেখানে। কোন তালা-টালা লাগানো নেই সে ঘরের দরজায়। ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকলাম।

এ ঘরের বাতাস অনেক স্বাভাবিক—অনেক পরিষ্কার। একটু ছিমছাম ঘরখানাও। একটা জানালা রয়েছে কিন্তু সেটা বন্ধ। একটু মরচেধরা চুল্লী ঘরের এক কোণে। ভাবলাম কেউ ধোঁয়া দেখতে পাবে না অন্ধকার রাতে, সুতরাং জ্বালান যেতে পারে চুল্লীটা। আগুনে সেঁকে

নেওয়া দরকার ভিজে পোষাকটাকে।

কিন্তু কি দিয়ে জ্বালব? কোঠায় কাঠ-কুটো? চারপাশে তাকালাম অসহায়ভাবে—কাঠও কি পাওয়া যাবে না দু'এক টুকরো। সমাধান হয়ে গেল সমস্যার, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরকার দেওয়াল তো ঢাকা রয়েছে ওক গাছের চমৎকার তক্তা দিয়ে। খানিকটা তক্তা কেটে নিলাম বড় ছুরিখানা দিয়ে। ঘরখানায় খুঁত হয়ে গেল। এ বাড়ির মালিক নই আমি। আমি তো মোটে একরাতের বাসিন্দা।

চমৎকার আগুন জ্বলল শুকনো এক কাঠের চুল্লীতে। চা-এর জল চড়িয়ে আমি ভিজে পোষাক শুকোতে লাগলাম আগুনের উত্তাপে। আগুনের কাছাকাছি বুট-জোড়াকেও রাখলাম।

আমার সঙ্গেই ছিল জল আর চায়ের সরঞ্জাম।

চা খেলাম। পোষাকও শুকোল। এবার শুয়ে পড়া ছাড়া করণীয় কিছু নেই। ক্ষিদে পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে যে খাবার ছিল তা পথেই শেষ হয়ে গিয়েছে। অগত্যা পেটের ক্ষিদে পেটে রেখেই শুয়ে পড়তে হল। ঘুমিয়েও পড়লাম একসময়।

কিন্তু খুব বেশী সময় ঘুমোতে পারলাম না কেননা যখন জাগলাম তখন চুল্লীতে আগুন বেশ উজ্জ্বলভাবেই জ্বলছিল, মেঝের শক্ত তক্তার উপর ঘুমানো সহজ নয়। কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ঘুম ভেঙে যায় একটু নড়াচড়া করলেই। আবার ঘুমাবার চেষ্টা করলাম পাশ ফিরে।

আচম্বিতে একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলাম, অন্ধকার পথটায় পায়ের শব্দ; শব্দটা এগিয়ে আসছে এই ঘরের দিকেই।

আগেই বলেছি এ ঘরে একটিমাত্র জানালা আর সেটাও বন্ধ। যে দরজা দিয়ে আমি এ ঘরে এসেছি সেটি ছাড়া আর কোন দরজাও নেই। ঘরের মধ্যে লুকোবার মত কোন আলমারী অথবা ক্যাবার্ডও নেই। আসছে বাড়ির মালিক। এখন আমি পালাই কি করে। আমি তো হাতে নাতে ধরা পড়ে যাব। কিন্তু এই অবস্থায় মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আমার সামনে তো দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। আমাকে অভিযুক্ত করবে বাড়ির মালিক নিশ্চয়ই অনধিকার প্রবেশের দায়ে। তার অর্থ যে কি তা আমার অজানা নয়। ফিরে যেতে হবে আমাকে আবার ওরচেসটার

জেলে। অথচ এই তো সবে দুদিন হল আমি সেই জেল থেকে খালাস পেয়েছি। সেখানে ফিরে যাবার ইচ্ছে আদৌ নেই।

আগন্তুকের কোন তাড়াহুড়ো নেই। সে বেশ ধীরে সুস্থে অন্ধকার পথ ধরে এগিয়ে আসছে। বাইরে আলো পড়েছে দরজার ফাঁক দিয়ে। আলো দেখেই লোকটি বোধ হয় এগিয়ে আসছে এই ঘরখানার দিকে। সে বোধ হয় ভাবছে তার অন্ধকার ঘরে কে আলো জ্বালল ?

লোকটি ঘরে ঢুকল। মনে হল ও আমাকে দেখতে পায় নি। আমি এক কোণে গুঁটিসুঁটি মেরে বসেছিলাম, কোন দিকে না তাকিয়ে লোকটা সোজা চলে গেল জ্বলন্ত চুল্লীটার কাছে। গরম করতে লাগল আগুনের তাপে জলে ভেজা ঠাণ্ডা হাত দুখানা।

সত্যি সাংঘাতিক ভিজেছে লোকটা। ওর সমস্ত শরীর থেকে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। স্বীকার করি সারাদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে আজকে। সন্ধ্যার আগে একটু থেমে আবারও সুরু হয়েছে ঝড়-বৃষ্টি। কিন্তু এরকম বৃষ্টিঝরা রাতেও বা লোকে এরকম ভিজে যায় কি করে। পুরনো আর জীর্ণ লোকটার পোশাক-পরিচ্ছদ। ওর সমস্ত শরীর থেকে জল ঝরে পড়ছে। জল পড়ছে ঘরের মেঝেতে। লোকটার মাথায় টুপি নেই। চুল ভিজে সপসপে। চুল থেকে জল ঝরে পড়েছে। চুল্লীর জ্বলন্ত কাঠের একটা হিস্ হিস্ শব্দ হচ্ছে। সে শব্দের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে যেন একটা অন্ধ আক্রোশ···একটা দুর্বোধ্য অসূয়া।

বুঝলাম লোকটি মোটেই একজন আইন মেনে চলা সুনাগরিক নয়। ও আমার মতই একজন ভবঘুরে। পথের ভদ্রলোক ! সুতরাং একই পথের পথিক আমরা। একটু হেসে ওকে সম্ভাষণ করলাম।

—"কি মশাই, আপনিও কি রাতের আশ্রয়ের খোঁজে ?"

—"তা ছাড়া কি ! বাইরে ঝড়-বৃষ্টি সুরু হয়েছে, শুনছেন না ঝড়ের গর্জন ?"

—"হ্যাঁ তা তো শুনছি। সারারাত বোধ হয় এমনিই চলবে।"

—"উঃ কি জঘন্য আবহাওয়া ! একেবারে ভিজে গিয়েছি। কি ঠাণ্ডা ! সমস্ত শরীর যেন জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে ! অনুযোগের সুরে আগন্তুক বলল। তারপর আগুনের আরো কাছে গিয়ে গুঁটিসুঁটি মেরে বসল।

—"না", আমি বললাম, "রাস্তায় চলার পক্ষে আবহাওয়াটা মোটেই

ভাল নয়। কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি……”

—“কি কথা? আমাকে শেষ করতে না দিয়েই আগন্তুক প্রশ্ন করল।

“ভাবছি এ বাড়িখানা পরিত্যক্ত কেন? এখানে মাঝে মাঝে লোকজন তো আসতে পারে, কেননা পুরনো হলেও এ বাড়িখানা এখনও বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে নি।”

বাইরে ঝড়ের গর্জন বেড়ে গেল। খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চিরে ফালাফালা করে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম বাগানের গাছপালা আর আগাছাগুলো ঝড়ের বেগে কি রকম অদ্ভুতভাবে আন্দোলিত হচ্ছে।

কড়্ কড়্ করে বাজ ডাকল।

সৃষ্টি যেন রসাতলে যেতে বসেছে।

—“একটা সময় ছিল যখন এমন একখানা চমৎকার সুন্দর কুটির বা এ রকম সুন্দর বাগান আর এ তল্লাটে ছিল না। আর এখন? এখন কোন লোক এখানে থাকে না। কোন পথ-ভোলা পথিক বা ভবঘুরেও রাত্রিবাস করে না এখানে,” খসখসে গলায় আগন্তুক বলল।

—“কিন্তু কেন?” আমি প্রশ্ন করলাম।

আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে আগন্তুক বলতে লাগল—

“আর আজ? আজ ভিখারীরা পর্যন্ত এ বাড়িতে রাত কাটায় না। যে সব পোড়ো বাড়িতে ভিখারীরা রাত কাটায় সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাদের ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাকের টুকরো, খাবারের অবশেষ। এখানে কি সেরকম কিছু দেখতে পাচ্ছেন?”

—“না, কিন্তু বাড়িখানার এরকম হাল হল কি করে?” আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

—“হানাবাড়ি,” বুঝলেন মশাই, এ বাড়িখানা হল হানাবাড়ি।”

“হানাবাড়ি!”

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল লোকটি, শ্বাস ফেলতেও যেন ওর কষ্ট হচ্ছে।

—“ভূত, এ বাড়িতে নাকি ভূতের উপদ্রব। লোকটা এ বাড়িতেই থাকত। সে এক মহা দুঃখের কাহিনী, সব কথা আপনাকে বলার প্রয়োজন নেই। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে হতভাগ্য লোকটিকে শেষে

মিলের পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করতে হল। ওকে যখন পাড়ে তোলা হল তখন ওর মৃতদেহটা জলের উপর ভাসছে। দেহটার উপর অতিসূক্ষ্ম পাতলা ও পিছল মাটির একটা আস্তরণ পড়ে গিয়েছে। আঁঠাল মাটির গায়ে আটকে ছিল জলের পানা আর শেওলা।

মরবার পরও নাকি লোকটাকে দেখা গিয়েছে। গাঁয়ের অনেকেই দেখেছে তাকে। মৃত মানুষটা যেন ক্লান্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে পুকুরের পাড় দিয়ে। ওকে বেশী দেখা গিয়েছে ইস্কুলের মোড়ে ছেলের জন্য অপেক্ষা করতে। ও বোধ হয় ভুলেই গিয়েছে যে ছেলে বা ওর পরিবারের কেউ আর বেঁচে নেই। বসন্ত রোগে সবাই মারা গিয়েছে। আর এজন্যই ও জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারের সবাই মারা যাবার পর লোকটা আর বাইরে বেরোত না। বাড়ির মধ্যেই ক্রমাগত পায়চারী করত। মরার পরও তার পায়চারী বন্ধ হয় নি। এখনও নাকি তার অশান্ত আত্মা দেহ ধারণ করে ঘুরে বেড়ায় এই বাড়ির মধ্যে। লোকটা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল। এখন সে ঘুরে বেড়ায়···কেবলই ঘুরে বেড়ায়। হানা দেয় তার একদা বড় সাধের বাগানে-ঘেরা বাড়িতে।”

আগন্তুক আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল! সে একটু নড়েচড়ে বসতেই তার বুটজোড়ার মধ্যে জলের পঁচ্ পঁচ্ শব্দ শুনতে পেলাম।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, শোনা যাচ্ছে ঝড়ো হাওয়ার হু-হুংকার। হাজার হাজার অদৃশ্য ক্রুদ্ধ দানব যেন দারুণ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই ছোট্ট কুটিরখানার উপর। বাড়িখানাকে যেন ওরা উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় বহুদূরের দানবলোকের পথে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে বজ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন।

শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভেঙ্গে আমি বললাম, “আমাদের কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলে চলবে না। অলীক ভূতের ভয়ে আমরা যদি এবাড়ির আশ্রয় ছেড়ে চলে যাই তবে এ দুর্যোগের রাতে খোলা আকাশের নীচে জল-কাদা ভরা রাস্তাতেই আমাদের রাত কাটাতে হবে।”

—“না না এবাড়ি ছেড়ে যাব কেন, ওসব ভূতুরে হানার গালগল্প আমি বিশ্বাস করি না,” আগন্তুক বলল।

“আমিও করি না হেসে বললাম। আমি কিন্তু কোনদিন ভূত দেখি নি, শুনি কম লোকে নাকি ভূত দেখে।”

আমার দিকে আগন্তুক তাকাল। কি অদ্ভুত ওর দৃষ্টি! কি বিষণ্ণ। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে সে বলল, দেখেননি আপনার বোধ হয় ধারণা ভবিষ্যতেও কোনদিন ভূতের সঙ্গে আপনার মোলাকাত হবে না, ভাল। সারা জীবনেও ভূতের দেখা পায় না কোন কোন লোক তো, একটা দারুণ কষ্টকর ব্যাপার গরীব মানুষের বাড়ীতে টাকা-পয়সা না থাকাটাই। তবে তো চমৎকার যদি আবার ভূতের ভয় দেখাতে সুরু করে।"

"পুলিশের লোকেরাই আমার ঘুমকে অস্বস্তিকর করে তোলে, ভূত নয়," আমি বললাম, "আজকাল রাতের বিশ্রাম পাওয়াটা খুব শক্ত হয়ে উঠেছে পুলিশ আর পরের ব্যাপারে অহেতুক নাকগলানে লোকদের জন্যই!"

তখনও জল ঝরে পড়ছিল লোকটার জীর্ণ পোশাক থেকে। সে জলে ঘরের মেঝেটা ভেসে যাচ্ছিল। কেমন স্যাঁতসেঁতে ভেজা ভেজা গন্ধ আসছিল ওর গা থেকে।

—"আরে মশাই, আপনার পোশাক শুকালো না, এতক্ষণ আগুনের পাশে বসে আছেন। এখনও সমানে জল ঝরছে গা মাথা থেকে। আপনার আর কতখানি তাপ লাগবে শরীর শুকোতে? আমি প্রশ্নটা করলাম বেশ অবাক হয়েই।

খসখসে গলায় লোকটা বলল, "আমার শরীর শুকোবার কথা বলছেন? না মশাই, কোনদিনই শুকোবে না আমার শরীর, শুকোবে কি করে? আমার মত যারা তাদের শরীর চিরকালই ভেজা থাকবে। চিরদিনই জল ঝরবে তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না বৃষ্টি···রোদ্দুর শীত গ্রীষ্ম যাইহোক না কেন। বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে দেখুন···"

তার কাদা মাখা হাত দু'খানা লোকটা ঢুকিয়ে দিল চুল্লীর আগুনের মধ্যে। ঢুকিয়ে দিল কব্জী পর্যন্ত। তারপর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল জ্বলন্ত আগুনের দিকে, ওর চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর···বদ্ধ উন্মাদের দৃষ্টি এ যে! এ দৃষ্টি অপার্থিব···এ দৃষ্টি অমানুষিক!

মুহূর্তের মধ্যে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল সমস্ত ব্যাপারটা। আতঙ্কের তুহিন-শীতল স্রোত আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল, বেরিয়ে এল এক নিদারুণ আর্তনাদ। আমি একছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর

থেকে বুটজোড়া হাতে নিয়ে।

কেমন করে যে অন্ধকার পথ আর বাগান পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় এসে পড়লাম তা বলতে পারি না, যেন পাল্টে গেল আমার কাছে বাইরের দুর্যোগের প্রকৃতিটাই। বৃষ্টিধারাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে হল, মনে হল পরম আশ্রয় কাদায়ভরা পথটাকে। আমি পথ দেখছি বিদ্যুতের আলোয়। এখন আমার কাছে এগিয়ে যাবার সংকেত বজ্রের গর্জন।

হানাবাড়িখানাকে পিছনে রেখে বৃষ্টিঝরা ঝড়ো রাতে আমি ছুট দিলাম সামনের দিকে জল কাদায়ভরা পথ ধরেই।

———

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখতুম, আমার আত্মীয়রা আমায় তিরস্কার করতেন, বন্ধুরা ঠাট্টা করতেন, মাষ্টারমশাই প্রহার দিতেন এবং কাগজের সম্পাদকেরা না-ছেপে ফেরৎ দিতেন। কিন্তু বলে রাখি, একদিন সমূহ বিপদ থেকে যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল, শুধু আমার ঐ কবিত্বশক্তির জোরে। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ কবিতা আমার প্রাণরক্ষা করলে কেমন ক'রে। সত্যি বলছি, সেদিন কারো সাধ্য ছিল না যে, মরণাপন্ন আমাকে রক্ষা করে? ভাগ্যে কবিতা লিখতে শিখেছিলুম, তাই বেঁচে গেলুম। নইলে লোকের অত্যাচারে কবিতা লক্ষ্মীকে বাল্যবয়সে বিদায় দিলে সেদিন আমার যে কি অবস্থা হতো, তা আমিই জানি।

গল্পটা তা'হলে খুলেই বলি। নানা স্থান ঘুরে আমি যাচ্ছিলুম জয়পুর থেকে দিল্লী। টাইম-টেব্‌ল্ খুলে দেখলুম, টানা দিল্লী যেতে হলে রাত্রের গাড়িতেই সুবিধে। কিন্তু সে ট্রেন অনেক রাত্রে ছাড়ে—প্রায় দু'টো। একে জয়পুরের মতো জায়গা, তায় মাঘ মাসের শীত তার উপর

রাত্রি দুটো—এই ব্রাহস্পর্শ ঘাড়ে নিয়ে যাত্রা করতে আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগলো। কিন্তু উপায় কি? আমি ষ্টেশন-মাষ্টারকে বল্লুম—"কি উপায় করা যায়, বলুন দেখি? এই দারুণ শীতে ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ট্রেন ধরবার কথা মনে করতেই তো আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে।"

ষ্টেশন মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি ফার্ষ্টক্লাস প্যাসেঞ্জার?" তখন বড়দিনের ছুটিতে রেল-কোম্পানী আধাভাড়ায় সর্বত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা করায় আমি সস্তায় বড় মানুষি করেছিলুম। বুক ফুলিয়ে বল্লুম—"হ্যাঁ, আমার ফার্ষ্টক্লাসের টিকিট।" ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন—"প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে খুব একটা ভাল ব্যবস্থা আছে।"

আমি বল্লুম—"কি?"

তিনি বল্লেন—"আপনি এক কাজ করবেন। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে ষ্টেশনে আসবেন। আপনার জন্যে একখানা ফার্ষ্টক্লাস গাড়ি ঐ সাইডিঙে কেটে রেখে দেবো, আপনি তাতেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়বেন লেপ মুড়ি দিয়ে। তারপর রাত্রে যখন মেল আসবে, তাতেই আপনার গাড়ী লাগিয়ে দেবো—আপনি দিব্যি ঘুমতে ঘুমতে দিল্লী গিয়ে পেঁছিবেন।"

আমি বল্লুম—"বাঃ এতো বেশ!"

ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন—"হ্যাঁ শীতের রাত্রে গাড়ি ধরবার অসুবিধে বলেই তো কোম্পানী বড়লোক যাত্রীদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন।"

আমি বল্লুম—"খুব ভালো ব্যবস্থা। আমি আটটার মধ্যেই আসবো—আপনি গাড়ি ঠিক করে রাখবেন।" তিনি বল্লেন—"গাড়ি ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি দেরী করবেন না! আটটার পর আর ট্রেন নেই ব'লে আমরা আটটার সময় ষ্টেশন বন্ধ করে চলে যাই।"

আমি বল্লুম—"আটটার মধ্যেই আসবো।" বলে আমি চলে গেলুম।

তারপর সন্ধ্যাবেলা আহারাদি সেরে পায়ে তিনজোড়া ডবল মোজা, গায়ে দুটো গরম গেঞ্জির উপর একটা মোটা ফ্লানেলের কামিজ, তার উপর সোয়েটার, তার উপর তুলো ভরা মেরজাই, তার উপর ওয়েষ্ট কোট ওভার-কোট এবং সর্বোপরি একটা মোটা বালাপোষ মুড়ি দিয়ে মাথাটাকে

কান-চাপা টুপি ও পশমের গলাবন্ধ দিয়ে এঁটে কাঁপতে কাঁপতে ঠিক আটটার সময় ষ্টেশনে এসে হাজির হলুম।

আমার মস্ত বড় লোহার তোরঙ্গটা দুজন কুলি এসে ধরাধরি ক'রে নামাতে গিয়ে একজন ফিক্ ক'রে একটু হেসে ছেড়ে দিলে।—আমি বল্লুম—"কেয়া হলো রে?"

সে বল্লে—"বাবুজীর তোরঙ্গ দেখছি ফাঁকা। যা দু'-একঠো ধুতি উতি আছে, সেগুলি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সটি আমাদের বখশিস্ ক'রে যান বাবু—আপনার কুলি-ভাড়া, রেল-মাশুল অনেক বেঁচে যাবে।"

আমি বল্লুম—"যা, যা, তোমকো আর ইয়ে করতে হবে না!" ব'লেই আমি হন্ হন্ করে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরের দিকে চলে গেলুম। ষ্টেশন-মাষ্টার আমাকে দেখেই বললেন—"গুড্ ইভিনিং বাবু। আপনার ভাগ্য খুব ভালো আজ আর কোন প্যাসেঞ্জার নেই; সমস্ত গাড়িটাই আপনার একলার। চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি। ব'লে তিনি আমাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে, পাঁচ-ছয়টা রেল-লাইন টপকে অনেক দূর চলে চলে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে এনে দাঁড় করালেন। সামনে দেখলুম, একখানা ধোঁয়াটে রঙের গাড়ি কাটা পড়ে রয়েছে—ঠিক যেন একটা স্কন্ধকাটা, অন্ধকারের আড়ালে গা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! মাষ্টারবাবু গাড়িটার চাবি খুলে দিলে বল্লেন—"নিন্—উঠে পড়ুন। বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন। বলেই তাড়াতাড়ি তাঁর হাত বাতিটা তুলে নিয়ে গুড নাইট—ব'লে ছুট দিলেন। অন্ধকারে তাঁকে আর দেখতে পেলুম না, রেল-লাইনের খোয়াগুলোর উপর তাঁর জুতোর খস্ খস্ শব্দ কেবল শুনতে লাগলুম। ছ্যাঁৎ ক'রে আমার মনে হলো—তাই তো মাষ্টারবাবু অমন ক'রে পালালেন কেন?

ইতিমধ্যে দেখি, কুলি-দুটো আমার তোরঙ্গ ও বিছানাটা গাড়ির মধ্যে, তুলে দিয়ে বল্‌ছে—বাবুজি পয়সা; আমি তাদের হাতে পয়সা দিতেই, তারাও ছুট্ দিল ষ্টেশনের দিকে। ব্যাপার কি? আমি হতভম্বের মতো ভাবছি, দেখি দুটো কয়লা-মাখা কালো ভূত রেল-লাইনের বাঁধের নীচে থেকে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারটে সাদা চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেখতে ষ্টেশনের দিকে চলে গেল। তাদের পিছনে একটা কুকুর ল্যাজ তুলে দৌড় দিলে। তার পরেই সবই একেবারে নিস্তব্ধ! একেবারে

অন্ধকার।

অমাবস্যার রাত্রি—চারিদিক অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। সেই অন্ধকারে একটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক চারদিক দেখতে লাগলুম—আশে পাশে কেউ নেই; দূরে কেবল গাছগুলো অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের ভিতরটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করতে লাগলো।

আমি আস্তে আস্তে গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলুম। গাড়ির ভিতরটা একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। তাড়াতাড়ি দেওয়াল হাৎড়ে বিজ্‌লিবাতির চাবি টিপলুম—খুট ক'রে শব্দ হলো, আলো হলো না। সর্বনাশ! আলো নাই না কি ঃ আলোর সুইচ্‌ নিয়ে অনেক নাড়ানাড়ি করলুম, কোনই ফল হলো না, যেমন অন্ধকার তেমনই, পকেট খুঁজলুম, দিয়েশালাই নেব। কেমন ক'রেই বা থাকবে? তোরঙ্গের মধ্যে একটা দিয়েশালাই আছে। চাবি খুঁজতে লাগলুম, পৈতেতে চাবি বাঁধা ছিল, বালাপোষ, ওভার-কোট, ওয়েস্ট-কোট, সোয়েটার গেঞ্জির গোলক-ধাঁধাঁর মধ্যে কোথায় পৈতে-গাছাটা হারালো, কিছুতেই খুঁজে পেলুম না। বামুনের ছেলে, বিপদে আপদে, বিদেশবিভূঁয়ে যজ্ঞোপবীতটাই মস্ত সহায়! সেটাও শেষে খোওয়ালুম!

সেই অন্ধকারে আমার যেন হাঁপ ধরতে লাগলো। অন্ধকার যে জাঁতাকলের মত মানুষের বুককে এমন করে পিষতে থাকে এ আমি জানতুম না। আমি গাড়ির মধ্যে এদিক-ওদিক ক'রে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলুম, কানে কাদের সব ফিস্‌ ফিস্‌ কথা এসে লাগতে লাগলো। কোথায় একটু আলো পাই? আমি ছুটে গাড়ি থেকে বেরিয়ে রেলের লাইন থেকে দুটো পাথর তুলে ঠক্‌ ঠক্‌ করে সজোরে ঠুক্‌তে লাগলুম—যদি একটু আলোর ফিন্‌কি পাই। কিন্তু হায় অদৃষ্ট, অলোর বদলে পাথরের কুচির ফিন্‌কি এসে আমার চোখ দুটোকে ঝনঝনিয়ে দিল!

আমি দু-হাতে চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে ষ্টেশনের দিকে ছুট দিলুম, যেমন ক'রে পারি, সেখান থেকে একটা আলো নিয়ে আসব। ষ্টেশন মাষ্টারটা কি পাজি! এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আমায় একা ফেলে গেল, একটা আলো দিল না! বল্লে কি না, দিব্যি ঘুমতে ঘুমতে যাবেন! পাজি কোথাকার!

আমি ছুটতে ছুটতে একেবারে ষ্টেশনের কাছে এসে হাঁপ নিয়ে

দাঁড়ালাম—প্ল্যাটফর্মের—কিনারায় যে একটা বাঁকা খেজুরগাছ ছিল, ঠিক তার সামনে। কিন্তু এ কি? এই তো সেই খেজুরগাছ, এই তো এই তো রয়েছে। কিন্তু ষ্টেশন কোথায়? আমি এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ চেয়ে দেখলাম ষ্টেশন নেই। মনে হলো, কালো শ্লেটের গা থেকে ছেলেরা যেমন তাদের আঁকা ছবিগুলো মুছে ফেলে, ঠিক তেমনি ক'রে অন্ধকারের গা থেকে ষ্টেশনকে একেবারে কে মুছে ফেলেছে।

আমার বুকটা ধ্বক ক'রে উঠলো। আমি তিলমাত্র না দাঁড়িয়ে আবার ছুটলুম্—যে পথে এসেছিলুম, সেই পথে আমার গাড়ির দিকে টপাটপ্ পাঁচ-ছয়টা লাইন টপ্‌কে ছুটতে ছুটতে আমি যখন সেই মাঠের ধারে আমার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম, তখন দেখি অতবড় গাড়িখানা নিয়ে কে উধাও হয়েছে। গাড়ির চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। কি সর্বনাশ!

আবার ভালো করে চারিদিক্ চেয়ে দেখলুম—ষ্টেশনও নেই গাড়িও কোথায়? করি কি! একবার মনে হলো, যাই, আর একবার গিয়ে ভালো ক'রে ষ্টেশনটা খুঁজে আসি। কিন্তু ষ্টেশনের দিকটার সেই খাঁ-খাঁ মূর্ত্তি মনে হতে আমার বুকটা ছ্যাৎ ক'রে উঠলো! ছেলেবেলায় গল্পে শুনতুম দৈত্যদানবরা রাতারাতি বড়-বড় বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আবার সকালে যেখানকার বাড়ি সেইখানে রেখে যেতো—একি তাই হলো নাকি। মনে তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোখে তো দেখছি তাই।

হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠে মনে হলো, এমন ক'রে রেল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা তো ঠিক নয়—আচম্‌কা একখানি গাড়ি এসে চাপা দিয়ে যেতে পারে! যেই এইকথা মনে হওয়া, তাড়াতাড়ি লাইন থেকে সরে অন্যদিকে ছুটে গেলুম। কিন্তু যেদিকে যাই, সেইদিকেই রেলের লাইন, সামনে পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে যে দিকে ছুটি সেইদিকেই দেখি রেলের লাইন লোহার জাল দিয়ে আমায় ঘিরে ফেলেছে—পালাবার উপায় আর নেই! আমার এই ছোটাছুটি দেখে অন্ধকার থেকে কারা হঠাৎ যেন খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। আমি চম্‌কে উঠে থেমে দাঁড়াতেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে বাঁধের উপর থেকে গড়াতে গড়াতে নীচে এক গাছতলায় এসে পড়লুম। মনে হলো প্রাণটা যেন বাঁচলো! ট্রেন-চাপা পড়বার আর ভয় নেই।

গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। মনে হতে লাগলো

কতক্ষণে রাত্রিটা কাট্‌বে। কিন্তু রাত্রির যেন শেষ নেই। বসে বসে দেখতে লাগলুম নিস্তব্ধ রাত্রি ঝিম্‌-ঝিম্‌ করতে করতে আরো নিঝুম চিকের ডানার মতো একখানা কালো কুৎসিত কম্বল আস্তে আস্তে টেনে মুড়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব জিনিস যেন মুছে আসছে। দেখতে-দেখতে আমি শুদ্ধ যেন মুছে আসতে লাগলুম। কালো জুতো-মোজা পরা আমার লম্বা পা দুখানা একটু একটু ক'রে মুছে গেল। কালো ওভার কোট ও নীল বালাপোষ মোড়া-গা—তাও আস্তে আস্তে মুছতে লাগলো। যখন প্রায় কোমর অবধি মুছে গেছে, আমি আর সেই দৃশ্য দেখতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেল্লুম। চোখ বুজে মনে হতে লাগলো—আমি আছি কি নেই? আছি কি নেই?

"আছি আছি—এইখানে আছি।" বলে কানের কাছে কে একজন চীৎকার করে উঠলো। আমি চোখ চেয়ে দেখি মানুষের দেহের মেদ-মাংস ছাড়িয়ে নিলে যেমন হয়, তেমনিতর কঙ্কাল তার কাঠির মতো সরু সরু লম্বা আঙ্গুল নেড়ে ইসারা করে কাকে ডাকছে। দেখতে দেখতে ঠিক তারই জুড়ি আর একটা কঙ্কাল লাফাতে লাফাতে তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

তারপর আর একটা।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা আস্তে আস্তে সরে আমার খুব কাছে এসে ঘাড় হেঁট ক'রে আমাকে দেখতে লাগলো। তার চোখের ওপর চোখ পড়তে দেখলুম—না আছে পাতা, না আছে তারা, শুধু দুটো গোল গোল গহ্বর কালো কট্‌কট্‌ করছে। সে আমাকে বেশ নিরীক্ষণ ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—"এই নাকি সে?"

প্রথম কঙ্কালটা বল্লে—"বেশ বেমালুম লুকিয়েছ তো, একেবারে চেনবার জো নেই।"

শেষ কঙ্কালটা ছুটে এলে বল্লে—"কৈ, দেখি।" ব'লে তার হাড় বারকরা আঙ্গলগুলো টিপে টিপে আমায় দেখতে লাগলো।

"ও আর দেখছিস কি? ও সে-ই। আমার চোখে কি ধুলো দেবার জো আছে—হাজারই লুকোক না।" ব'লে প্রথম কঙ্কালটা এতখানি হাঁ ক'রে বিরাট শব্দে হেসে উঠলো। মুখের ভেতর থেকে তার সেই সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে অন্ধকারকে যেন কামড়ে ধরল।

শেষ কঙ্কালটা বল্লে—"তবু একটু পরখ করতে হবে না ; ওদিকে লগ্ন বয়ে যায়।" ব'লে সে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি ভাবলুম, ব্যস্, এইবার আমার শেষ !

দেখতে দেখতে বাকি-দুটো কঙ্কাল এগিয়ে এসে আমার পা-দুখানা ধরলে, প্রথমে মাথার দিকটা ধরলে; তারপর তিনজনে মাটি থেকে চ্যাং-দোলা ক'রে আমায় তুলে ফেল্লে। আমি তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে গাছের গুঁড়িটা চেপে ধরে বলে উঠলুম—"কোথায় নিয়ে যান মশাই ?"

তারা বল্লে—"বিয়ে দিতে।"

আমি চমকে উঠে বললুম—"বিয়ে দিতে কি মশাই! এই বুড়ো বয়সে ?"

একজন বল্ল—"বুড়ো বরই পছন্দ করি।"

আমি বল্লুম—"মশায় আমার চেয়ে ঢের বুড়ো আছে, তাদের কাউকে নিয়ে যান্ না, আমায় কেন মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন।"

প্রথম কঙ্কালটা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো—"তুমি ভেবেছ, পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকলে রেহাই পাবে ? তোমাকে আমরা জোর করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেবো।"

আমি বল্লুম—"আমি তো মশাই, পালিয়ে এসে লুকিয়ে নেই। সেই ছেলেবেলায় একবার পালিয়েছিলুম বটে ; তারপর তো জ্যাঠামশাই পুলিশ দিয়ে ট্রেন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে দেন।"

সে বল্লে—"আমরাও পুলিশ এনে ; ধরে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দেবো ব'লে।"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বল্লুম—"কিন্তু আমি তো আর বিয়ে করতে পারব না।"

"পারবে না কি ? বিয়ে তোমায় করতেই হবে। এমন কি তোমার গো ?" বলে সেই পয়লা নম্বরের কঙ্কালটা ভীষণ গর্জন ক'রে উঠলো।

আমি বল্লুম—"রাগ করেন কেন মশাই ? আমি ছাড়া কি আর পাত্র নেই ? কত ছেলে হয়তো খুশী হয়ে বিয়ে করবে।"

সে বল্লে—"এত রাত্রে এখন ভালো পাত্র পাই কোথায় ? যার তার হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না, চল, লগ্ন বয়ে যায়।"

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লুম—"তাহলে নিতান্তই কি আমাকে

বিয়ে করতে হবে ?”

শেষ কঙ্কালটা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নরম সুরে বল্লে—“দুঃখ করছিস কেন ভাই ক্যাংলা।”

আমি তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লুম—“ক্যাংলা কে মশাই! আমি তো ক্যাংলা নই। আমি শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্তী। আমার পিতার নাম “মধুসূদন চক্রবর্তী।”

প্রথম কঙ্কালটা হো হো ক’রে হেসে উঠে বল্লে—“রাধে মাধব! রাধে মাধব।”

আমি বল্লুম—“সে কি মশাই ?”

সে বল্লে—“এই এতরাত্রে, এই শ্মশানের ধারে একটা জ্যান্ত শিয়াল কুকুর থাকে না, আর মাধব চক্রবর্তী আছে ? তুই এতই বোকা পেলি আমাদের ?” আমি বল্লুম—“এই তো আমি রয়েছি।” সে বল্লে—আরে ভাই, মাধব চক্রবর্তীর দেহের ভিতর আবার কে এলো।”

সে বল্লে—“আরে ক্যাংলা, তুই মাধব চক্রবর্তীর শূন্য দেহের মধ্যে সিঁধিয়ে আছিস, সে কি আমি টের পাইনি ভেবেছিস ?”

আমি বল্লুম—“এসব কি হেঁয়ালি বকছেন মশাই ? মাধব চক্রবর্তীর দেহের মধ্যে যদি ক্যাংলা এলো, তবে মাধব চক্রবর্তী গেল কোথা ?”

সে বল্লে—‘আরে ভাই, বামুনের ছেলে সে, বৈকুণ্ঠে গেছে।”

আমি বল্লুম—“না-মরেই সে বৈকুণ্ঠে গেল ?” সে বল্লে—“মরেছে না তো কি ?”

আমি বল্লুম—‘মরেছে কি রকম! সে মরে গেল আর টের পেলে না ?

সে বল্লে—“মানুষ কখন জন্মায় আর কখন মরে, সে তা টের পায় না কি!”

কথাটা শুনে বোঁ ক’রে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমার অজান্তে আমি মরে গেলুম না কি অ্যাঁ। সেই যে দেখলুম পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব মুছে আসছে—সেই কি আমার মৃত্যু না কি ? কিন্তু এই তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা বটে। কিন্তু তবু কেমন সন্দেহ হতে লাগলো। হয়তো এ আমি নই—এ আর কার আত্মা আমার শূন্য শরীর দখল করেছে। নইলে এই কঙ্কালগুলোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইতে

পারতুম ? জ্যান্ত মানুষ কি কখনো তা পারে ? কিন্তু মরে গেলুম কেমন করে ? আমার তো রোগ হয়নি ? হয়ত ঐ বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ার সময়ে পাথরে মাথা লেগে আমার মৃত্যু হয়েছে—আমি টের পায় নি।

ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গুলিয়ে যেতে লাগলো। কেমন মনে হ'তে লাগলো—না, আমি মাধব চক্রবর্ত্তী নই। এবং ঠিকই বলেছে—কাঙালীচরণের আত্মা আমার শূন্য দেহের মধ্যে এসে আসন পেতে বসেছে। তাইতো আমার দেহের ভ্রম হচ্ছে, মাধব চক্রবর্ত্তীর জের বুঝি এখনো চলছে কিন্তু কাঙালীচরণ লোকটা কে ? আমি যদি কাঙালীচরণ হব তবে আমি আমাকে চিনতে পারছি না কেন ? এরা তো চিনতে পেরেছে।

প্রথম কঙ্কালটা ব'লে উঠলো—"কি হে ক্যাংলা, কি ভাবছ ? বিয়ে করবার মত স্থির হলো।" আমি বল্লুম—"আচ্ছা মশাই, আমি কি সত্যি কাঙালীচরণ ?"

সে খানিক আমার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে বল্লে—"সে কিরে ক্যাংলা তুই নিজেকে নিজে চিনতে পারছিস্ না ?"

আমি বল্লুম—"না।"

সে বল্লে—সর্বনাশ হয়েছে ! তুই আমাদেরও চিনতে পারছিস না ?"

আমি বল্লুম—"একটুও না।"

সে বল্লে—"তোর মনে পড়ছে না—আজ এই অমাবস্যার দিনে ঘুট-ঘুটে লগ্নে তোর বিয়ে—বাগেশ্বরীর সঙ্গে ?"

আমি বল্লুম—"কৈ আমার তো কোন বিয়ের কথা হয়নি !" সে বল্লে—"সে কিরে ! তোর গায়ে গোবর পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, মনে পড়ছে না ?"

আমি বল্লুম—"গায়ে-গোবর কাকে বলে ?"

সে বল্লে—"তুই অবাক করলি। তোর কিছু মনে পড়ছে না ? গায়ে গোবরের দিন ভোর রাত্রে তালপুকুরে তুই মাছ ধরতে যাচ্ছিলি তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে, তালগাছের মাথায় বসে পা ঝুলিয়ে বাগেশ্বরী বরপণের কড়ি বাচছিল, তুই বাগেশ্বরীকে দেখতে পাস্ নি সেও তোকে দেখতে পায়নি, তারপর তুই যেমন ঠিক তালগাছের তলাটিতে এসেছিস্, অমনি

বাগেশ্বরীর পা দুটো দুলতে দুলতে তোর কপালে এসে ঠক ক'রে লেগে গেল। বাগেশ্বরী তো লজ্জায় সাত হাত জিভ্ কেটে, মাথায় ঘোমটা টেনে দৌড়? আর তুই বাড়িতে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বল্লি ও মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। কেন রে, কেন কি হয়েছে? তুই বল্লি—ওর পা আমার কপালে ঠেকেছে। তাতে হয়েছে কি? তুই বল্লি—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। ব'লে তুই—কপাল চাপড়াতে লাগলি। এ সব তোর মনে পড়ছে না?"

আমি বল্লুম—"মনে পড়েছে, ওই রকম একটা গল্প যেন কোথায় শুনেছিলুম। তারপর কি হলো?"

সে বল্লে—"সর্বনাশ করলি। তারপরেও তোর মনে পড়ছে না? তারপর তো গুরুঠাকুর এলেন; এসে বিধান দিলেন যে, বাগেশ্বরীর পা তোর মাথায় একবার ঠেকেছে, তুই-সাত—একে—সাতশোবার তোর পা দিয়ে তার মাথাটা থেৎলে দে, তা হ'লেই সব দোষ খণ্ডে যাবে। তুই বল্লি ওরে বাপরে; বাগেশ্বরীর মাথায় লাথি-মারা; সে আমি পারব না;—ব'লে তুই ছুট্ দিলি।"

আমি বল্লুম—"তারপর?"

সে বল্লে—"তারপর আজ বিয়ের সময় তোকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে খুঁজতে এই শ্মশানঘাটে এসে দেখি, তুই এই মাধব চক্রবর্ত্তীর মড়াটাকে দানা পাইয়ে বসে আছিস্। হাঁরে এই মাধব চক্রবর্ত্তীকে যারা পোড়াতে এসেছিল, তারা গেল কোথায়; তোকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে বুঝি?"

আমি বল্লুম—"মাধব চক্রবর্ত্তীকে আবার পোড়াতে আসবে কারা? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না?

সে বল্লে—"তোর কিছুই মনে পড়ছে না? তুই সত্যি বলছিস না মস্করা করছিস?

আমি বল্লুম—"তোমার দিব্যি, আমি সত্যি বলছি।" সে বল্লে "তবে সর্ব্বনাশ হয়েছে—তোকে মানুষ পেয়েছে।"

আমি বল্লুম···"মানুষে পেয়েছে কি গো!"

সে বল্লে—"জানিস না বুঝি, আমরা যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপি, মানুষও তেমনি আমাদের কারো কারো ঘাড়ে চাপে। তুই যখন মাধব

চক্রবর্ত্তীর দেহে সেঁধিয়েছিল, তখন বোধ হয় তার একটুখানি প্রাণ ছিল, সেইটে তোকে পেয়ে বসেছে।"

আমি বল্লুম—"তাতে কি হয়?"

সে বল্লে—"মানুষ যেমন তখন নিজেকে চিনতে পারে না, আপনার লোককে চিনতে পারে না, আবোল তাবোল বকে, কট্‌মট্‌ করে চোখ ঘুরোতে থাকে, আমাদেরও ঠিক তেমনি হয়। তাই তো তুই অমন করছিস্—নিজেকে চিনতে পারছিস না, আমাদেরও চিনতে পারছিস না।"

"ওগো, তবে আমার কি হবে?"

সে বল্লে—"যেমন বিয়ে করব না বলে পালিয়ে এসেছিস, তেমনি ঠিক জব্দ।"

আমি বল্লুম—"ওগো, আমি বাগেশ্বরীকে বিয়ে করবো—আমাকে উদ্ধার করো।"

সে বল্লে—"তবে বেরিয়ে আয় ওখান থেকে।"

আমি বল্লুম—"বেরুব কি করে গো?"

সে বল্লে—"পথ হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি? মুস্কিল করলি দেখছি? এক কাজ কর। মাধব চক্রবর্তীর ঐ কোঁচার খুঁটটা এই গাছের ডালে বেঁধে গলায় একটা ফাঁস দিয়ে তুই ঝুলে পড়—তাহলেই সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে আসতে পারবি।"

আমি আঁতকে উঠে বল্লুম—"ওরে বাপরে—সে যে ফাঁসি! সে আমি পারব না।"

সে বলল—"ভয়-কি! আমি তো কতবার ফাঁসি গেছি! তোর কোনো ভয় নেই, তুই ঝুলে পড়।"

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বললুম—"না গো, না—সে আমি পারব না, গলায় ফাঁসি দিতে কিছুতেই পারব না।"

যেমন এই কথা বলা, সেই প্রথম কঙ্কালটা তার সেই কালো গর্তের মত চোখ দুটোকে বন্‌ বন্‌ করে ঘুরিয়ে বল্লে—"কী তুই ফাঁসি যেতে পারবি না! আমরা হলুম গলায়-দড়ে! তুই আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে এমন কথা বলিস যে, ফাঁসি যেতে তোর ভয় হয়—কুলাঙ্গার কোথাকার।"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বল্লুম—"কি করব, আমার যে ভয় করছে!"

সে দাঁতের দু'পাটি কড়মড় করতে করতে বলে উঠলো—"ফের ঐ কথা! এই বেলা ঝুলে পড়, নইলে তোর ভালো হবে না বলছি।"

আমি বল্লুম—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ফাঁসিতে ঝুলতে পারব না—আমার ভয় করছে।"

সে আরো রেগে বল্লে—"হতভাগা কোথাকার! দূর হ, আমাদের সামনে থেকে দূর হ। ব'লে সে তেড়ে আমায় মারতে এলো।"

দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"রাগ করেন কেন খুড়ো মশাই। ও হয় তো ক্যাংলা নয়? নইলে ফাঁসিতে ভয় পাবেন কেন?" খুড়ো মশাই বল্লেন—"কী। ক্যাংলা নয় ও? আমি সাত বছর টিক্‌টিকি পুলিশে কাজ করেছি, কত বড় বড় ফেরার পাকড়াও করেছি—আমার ভুল হবে? শেষ কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে···যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন একবার পরখ করে দেখতে ক্ষতি কি দাদামশাই?"

দাদামশাই বল্লেন,—আচ্ছা কেন, পরীক্ষা হোক। বলে আমার দিকে ফিরে বল্লে—কি হে, তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী না কাঙালীচরণ।"

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে, আগে তো জানতুম আমি মাধব চক্রবর্ত্তী, কিন্তু তারপর থেকে মনে হচ্ছে কাঙালীচরণ।" সে বল্লে—'কাঙালীচরণ যদি হও, তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ বলে তোমার ফাঁসি দেবো আমরা, এই শ্মশানে—এই গাছের ডালে।"

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে আমি তবে মাধব চক্রবর্ত্তী, সে বল্লে—বেশ মাধব চক্রবর্ত্তী ব'লে যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পার, তাহলে তোমায় তিনবার সেলাম ঠুকে আমরা চলে যাবো।"

"আর যদি না পারি?"

"তা হ'লে এইখানে তোমার ঘাড় মটকে রেখে চলে যাবো।"

"ঘাড় মট্‌কে দেবেন? সর্বনাশ। এই বিদেশ বিভুঁয়ে—এই অচেনা জায়গায় এত রাত্রিতে নিজেকে কি করে প্রমাণ করবো মশাই?"

"না পার ঘাড়টি মট্‌কে দেবো—শ্মশানের ভুত হয়ে থেকো।"

সত্যি-বলছি, এই কথা শুনে আমি কেঁদে ফেল্লুম। তখন সেই দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"কাঁদছ কেন? তোমার এমন কোনো চিহ্ন নেই, যাতে প্রমাণ হয়, তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী।"

আমি বল্লুম—"আছে। এই দেখুন, আমার ডানহাতে একটা জড়ুলের দাগ।"

সে হেসে বল্লে—"ও প্রমাণ তোমাদের পুলিশের কাছে চলে, এখানে আমাদের কাছে চলে না। কোন ভিতরের প্রমাণ দিতে পার?"

আমি বল্লুম—"আমার ভিতরে কি আছে না আছে, আমিতো জানি না মশাই। এই দেখুন না আমার ভিতরে কাঙালীচরণ আছে কি মাধব চক্রবর্ত্তী আছে, আমি ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।"

প্রথম কঙ্কালটা গম্ভীরস্বরে বলে উঠল—"আজ্ঞে না, না, আমি মাধব চক্রবর্ত্তী।"

সে বল্লে—"শীগগির প্রমাণ কর নইলে ঘাড় মটকালুম বলে।"

দ্বিতীয় কঙ্কালটা বল্লে—অমন ঘেবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কি এমন গুঁণ নেই যাতে বোঝা যায় তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী?"

আমি বলে উঠলুম—"হ্যাঁ আছে বৈ কি? আমার একটা মস্ত গুণ আছে, আমি কবিতা লিখতে পারি।"

প্রথম কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"তুমি কবিতা লিখতে পার? নিজে লেখ? না পরের কবিতা নিজের ব'লে চালাও?"

আমি বল্লুম—"না মশাই, আমি সে-রকম কবি নই।" সে বল্লে—"তোমার কবিতা কাগজে ছাপা হয়?"

আমি বল্লুম—"না সম্পাদকেরা ভয়ে ছাপেন না।" সে বল্লে—"ভয়ে ছাপেন না কি রকম?"

আমি বল্লুম—"আমার কবিতা এত উচ্চশ্রেণীর যে, একবার সে কবিতা ছাপলে পাঠকেরা অন্য কবিতা পড়তেই চাইবে না। কাগজ ভর্তি করা তখন দায় হয়ে উঠবে। এ কথা এক সম্পাদক আমায় নিজের মুখে বলেছেন।"

সে বল্লে—"আচ্ছা। কৈ দেখি একটা কবিতা লেখ দিকিনি।"

আমি তখনই ওভারকোটের পকেট থেকে আমার পকেট বইখানা বার করে বল্লুম—"আলো একটা চাই যে।"

সে বল্লে—"দিচ্ছি আলো। বলে খানিকটা ধুলো বালি একত্র করে একটা ফুঁ দিলে আর অমনি আগুন জ্বলে উঠলো। আমি সেই আলোয় বসে লিখতে লাগলুম।"

খানিকটা লিখেছি, "সে বল্লে—কৈ, কি লিখলে পড়।" আমি বল্লুম—এখনও যে শেষ হয় নি মশাই। সে বল্লে—"কবিতার আবার শেষ আছে না কি? যা লিখেছ পড়—ফাজলামি করতে হবে না। আমি সুর করে পড়লুম—

"পড়িয়ে বিপদে তারা,
হয়েছি মা দিশে হারা।
উদ্ধার এ-দুঃখ-কারা
পার হ'তে মা জননী
শ্মশানে বসিয়ে ডাকি,
ভয়ে ঘোরে শির চাকি;
খাবি খায় প্রাণ-পাখি,
শূন্য হেরি এ ধরণী
কোথা মোর দেহ খাঁচা
কোথা পিতা, কোথা চাচা,
এসে মা আমারে বাঁচা,
দিয়ে তোর পা-তরণী।.....

এইটুকু শেষ হতেই সে বল্লে—"ঢের হয়েছে ঢের হয়েছে। এ-রকম গান তো আমি অনেক যাত্রায় জুড়িদের মুখে শুনেছি। এ তোমার নিজের লেখা না পুরনো গান একটা মুখস্থ ছিল তাই লিখে শোনাচ্ছ?"

আমি বল্লুম—"না মশাই, এ আমার নিজের রচনা। একেবারে টাট্‌কা। এতে আপনি পুরনোর গন্ধ কোথায় পেলেন? দেখছেন না, একেবারে আধুনিক ধরনের লেখা।"

সে বল্লে—"থাম, তোমায় আর জ্যাঠাপনা করতে হবে না। পুরোনো একটা গান চুরি ক'রে নিয়ে আমায় ফাঁকি দেবে ভেবেছ। তা হচ্ছে না। দেখি তুমি কত বড় ওস্তাদ, আমার নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখতে পার?" আমি বল্লুম—"খুব পারি। নাম দিয়ে আমি অনেক কবিতা লিখেছি।

তেলের নাম দিয়ে ওষুধের নাম দিয়ে অনেক ভালো ভালো কবিতা আমার লেখা আছে। একবার একটা জুতোর দোকানের কবিতা লিখে প্রাইজ পেয়েছিলাম আপনার নামটা কি বলুন, আমি এখনি লিখে দিচ্ছি।"

সে বল্লে—"আমার নাম জাঁদরেল। লিখে ফেল দেখি এই নাম দিয়ে একটা কবিতা চট্ করে। বুঝব কত বাহাদুর তুমি।"

আমি কাগজ-পেন্সিল নিয়ে লিখতে সুরু করেছি মাত্র, সে বল্লে—"কি লিখলে, পড় হে। আমিও বড় কবিতা দু'চক্ষে দেখতে পারি না।"

আমি বল্লুম—"মশাই আর একটু সময় দিন।" ব'লে আমি খস্ খস্ শব্দে লিখে যেতে লাগলুম। একবার একটু থেমেছি, সে আমার খাতার দিকে ঝুঁকে দেখে বল্লে—উঃ, অনেকটা লেখা হয়েছে। এইবার পড়।"

অগত্যা আমি পড়লুম—

রেল আছে, জেল আছে,
আর আছে কৎবেল ;
পাশ্ আছে, ফেল আছে,
আর আছে শূল শেল্ ;
ঢোল আছে, চোল আছে,
আর আছে সরখেল ;
সব সে বড়া হ্যায়
জাঁদরেল জাঁদরেল।"

পড়া শেষ হ'তেই সে চীৎকার ক'রে উঠলো—"বাঃ, বাঃ, বেড়ে লিখেছ তো হে। আর একবার পড় তো, আর একবার পড় তো।"

আমি আর একবার চীৎকার করে পড়লুম—"রেল আছে, জেল আছে, ইত্যাদি।"

সে আবার বল্লে—"বেশ হয়েছে! চমৎকার হয়েছে! যাও প্রমাণ হয়ে গেল তুমি কবি মাধব চক্রবর্ত্তী।"

আমি বল্লুম—"ঠিক বলেছেন মশাই, আমি কাঙালীচরণ নই!" সে বল্লে—"কাঙালীচরণের চৌদ্দপুরুষ এমন কবিতা লিখতে পারে না। মাধব চক্রবর্ত্তী না হ'লে এমন কবিতা লেখে কে?" আমি বল্লুম—"মশাই" আমার আর একটা কবিতা শুনবেন? এই খাতায় লেখা আছে—"এই জয়পুরের সম্বন্ধে।" সে বল্লে—"কি শোনাও তো দেখি।"

আমি তাড়াতাড়ি পকেট বইয়ের খাতা হাতড়ে কবিতাটা বার ক'রে পড়তে শুরু করলুম—

বস্তা-বস্তা পুঞ্জ পুঞ্জ তীব্র হিম ঢেলে
ব্যোম মার্গে কে রচিল শীতের পাহাড় ?
লেপ-গদি বালাপোষ সর্ব্ব বর্ম্ম ভেঙে
কম্প এসে কাঁপাইছে শরীরের হাড় !
ঊর্ধ্ব-ফলা ক্রুদ্ধ শত নাগিনীর প্রায়
কপালে-কপোলে ভীম হানিছে ছোবল,
কিম্বা কোন্ পিশাচিনী উন্মাদিনী-সমা
তীক্ষ্ণধারা ছুরিকায় করিছে কোতল !
অথবা কি মেঘ-দৈত্য ছোঁড়ে শার্পনেল—"

হঠাৎ দূরে একটা বীভৎস কোলাহল উঠলো—"ওরে ক্যাংলাকে পাওয়া গেছে।"

আমি চম্‌কে উঠে পড়া থামিয়ে চেয়ে দেখি আমার সামনে কঙ্কাল তিনটে লাফাতে লাফাতে ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল! আমি রাম! রাম! বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে পড়লুম। এতক্ষণ রাম নামটা যে কেন মনে আসে নি কে জানে!

আমি রেল-লাইনের বাঁধ ঠেলে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় দুটি কুলির সঙ্গে দেখা। তারা বল্লে—বাবু আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি গাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন ?

আমি আর কি বল্‌ব ? বল্লুম—"আমি এখানে ঐ ইয়ে হচ্ছিল কি না, তাই একটু দেখছিলুম।" তারা বল্লে "আপনার গাড়ি ঠেলে আমরা ঐ ওদিকে রেখে দিয়েছি। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিই।" ব'লে তারা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলে।

আমি গাড়িতে উঠে বল্লুম—"হাঁরে গাড়িতে আলো নেই কেন ?"

সে বল্ল—"বিজুলিবাতি আছে, মেল গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে তবে জ্বলবে।"

আমি বল্লুম—"আমাকে একটা বাতি দিয়ে যেতে পারিস্ ?—বখশিস্ দেবো।"

তাদের একজন ছুটে গিয়ে একটা বাতি এনে দিলে। আমি সেইটে সামনে রেখে পকেট বই খুলে নিজের লেখা কবিতা পড়তে লাগলুম।

———

ট্রেনের কামরায় ভূত

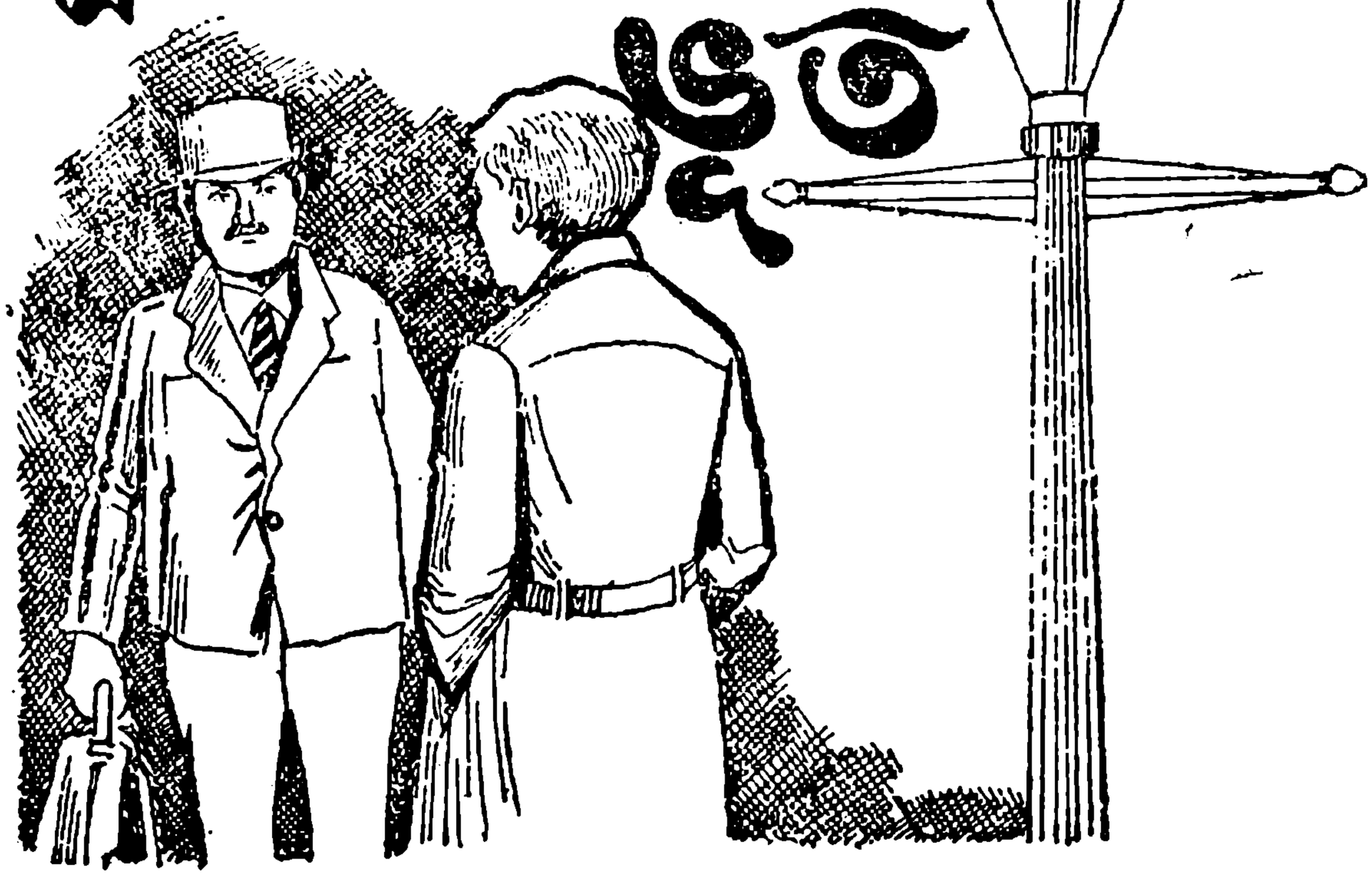

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

এক ভদ্রলোক ইউস্‌টন রেল স্টেশনে আসেন সকালের ট্রেন ধরার জন্য। ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। ট্রেনের কামরায় সে-সব কাগজপত্র দেখে নেবেন তিনি মনে মনে স্থির করেন। ফলে খোঁজ করেন একটু ফাঁকা কামরায়।

এ বিষয়ে বললে ট্রেনের গার্ডকে, গার্ড তাকে তুলে দেয় একটা খালি কামরায়। কামরার দরজার তালা লাগায় বাইরে থেকে। নিশ্চিত হন ভদ্রলোক। ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজ বের করেন ব্যাগ থেকে। চলতে শুরু করে ট্রেন।

ঠিক সে সময় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ব্যাগ হাতে ছুটতে ছুটতে ট্রেনের সেই ভদ্রলোকের কামরার দরজা খুলে কামরায় ওঠেন।

বয়স্ক ভদ্রলোককে কামরায় উঠতে দেখে প্রথম যাত্রীটি মনে মনে বেশ বিরক্ত হন। তাকিয়ে থাকেন লোকটির দিকে। ভাবেন, ট্রেনের গার্ড নিশ্চয়ই ভাল করে কামরার দরজায় তালা দেয়নি।

বয়স্ক ভদ্রলোক কামরায় উঠে প্রথম যাত্রীটিকে দেখেন। বসেন একই

বার্থে। প্রথম যাত্রীটিকে নমস্কার জানান সামান্য হেসে। এমন ভাব করেন তার কত না ঘনিষ্ঠতা আছে যেন প্রথম যাত্রীটির সঙ্গে।

হাতের ব্যাগটা কামরার বার্থের ওপরে সযত্নে রাখেন বয়স্ক ভদ্রলোক। বলেন, আমি হচ্ছি রেল কোম্পানীর একজন পরিচালক। বর্তমানে রেলের একটা নূতন লাইন খোলার দায়িত্ব আমার ওপরে পড়েছে। এখন আমি সেখানকার কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের বেতনের টাকা নিয়ে যাচ্ছি। আর সে টাকা সত্তর হাজার পাউণ্ড-এর মত হবে। প্রথম যাত্রী অবাক হয়ে বয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে একটু সময় তাকান। পরে আস্তে আস্তে বলেন, কত পাউণ্ড বললেন ?

কোন দ্বিধা না করে বয়স্ক ভদ্রলোক বলেন, তা সত্তর হাজার পাউণ্ডের মত। অবশ্য প্রথমে টাকাটা কাছাকাছি কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখবো। তারপর আস্তে আস্তে তুলবো।

প্রথম যাত্রীটির চোখ জোড়া বিস্ময়ে বড় হয়ে ওঠে। বলেন, এত টাকা একলা নিয়ে চলাফেরা করতে আপনার ভয় করে না ?

বয়স্ক ভদ্রলোক মৃদু হাসেন। বলেন, ভয় করবে কেন ? তাছাড়া, একমাত্র আপনাকে বললাম ব্যাপারটা। আপনি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা তৃতীয় জনকে বলবেন না ?

প্রথম যাত্রী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান। মনে মনে ভাবেন, সত্যিই ভদ্রলোকের বুকের পাটা আছে।

বয়স্ক ভদ্রলোক মৃদু হাসেন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন। কথায় কথায় প্রথম যাত্রীটির গন্তব্যস্থল জেনে নেন। এমন কি কার কাছে থাকবেন তাও জানেন।

সব জানার পর বয়স্ক ভদ্রলোক বলেন, আপনি যে বাড়ীতে উঠবেন, সে বাড়ীর বউ হল আমার আপন ভাইজি। কাজেই, আপনি যদি দয়া করে আমার ভাইঝিকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান, তা হলে আমি কৃতজ্ঞ হব ; নানান রকম কথা বলতে বলতে প্রথম যাত্রীটির ট্রেনে যাওয়া ক্লান্তি মনেই হয় না।

এক সময় ট্রেনটা স্টেশনে এসে দাঁড়ায়।

বসস্ক ভদ্রলোক ট্রেনের কামরার জানলা দিয়ে স্টেশনের দিকে তাকান। বার্থ থেকে উঠে দাঁড়ান। বলেন, আমার গন্তব্যস্থল এসে গেছে। এবার

আমাকে নামতে হবে।

এত তাড়াতাড়ি বয়স্ক ভদ্রলোককে বিদায় দিতে মন চায় না প্রথম যাত্রীটির। ফলে, তিনিও বয়স্ক ভদ্রলোককে ট্রেন থেকে নামতে সাহায্য করেন। বয়স্ক ভদ্রলোক প্রথম যাত্রীটিকে নিজের নাম লেখা একটা কার্ড দেন। বলেন, আমার বাড়ীতে এলে আনন্দিত হব।

প্রথম যাত্রীটি সম্মতি জানান। কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করেন। আয়েস করে নিজের বার্থে বসেন। বয়স্ক ভদ্রলোকের দেওয়া কার্ডটা আলোর সামনে ধরেন। কার্ডে "ডায়েরিং হাউস" লেখা আছে।

ততক্ষণে বয়স্ক ভদ্রলোক প্লাটফর্ম থেকে বাইরে বেরুবার পথের দিকে এগোন। প্রথম যাত্রীটি বয়স্ক ভদ্রলোকের সাহসের কথা চিন্তা করেন। একদৃষ্টে তার চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

হঠাৎ এক সময় প্রথম যাত্রীটি দেখে যে, তার পায়ের কাছে চুরুটের একটা বাক্স পড়ে আছে। আর সে চুরুটের বাক্সটা যে বয়স্ক ভদ্রলোকের সে বিষয়ে প্রথম যাত্রীটির কোন সন্দেহ থাকে না।

ট্রেন ছাড়তে অল্প দেরী দেখে প্রথম যাত্রীটি চুরুটের বাক্সটা নিয়ে ট্রেন থেকে নামেন, বয়স্ক ভদ্রলোককে ধরার জন্য ছুটতে শুরু করেন।

এক সময় প্রথম যাত্রীটি দেখেন, প্লাটফর্মের বাইরে একটা লাইট পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে বয়স্ক ভদ্রলোক অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। সেই লোকটাকে বেশ ভালভাবে দেখতে পান প্রথম যাত্রীটি। লোকটির মাথার চুলের রঙ বালির মত।

প্রথম যাত্রীটি বয়স্ক ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সেই লাইট পোস্টের দিকে ছোটেন। কিন্তু লাইট পোস্টের কাছাকাছি আসামাত্র সেই বয়স্ক ভদ্রলোক ও তার সঙ্গী কোথায় যেন অদৃশ্য হয়। প্রথম যাত্রীটি তাদের দেখতে পান না।

নিরুপায় হয়ে এক সময় তিনি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কুলিকে বয়স্ক ভদ্রলোক কোথায় গেলেন তা জানতে চান।

কুলিটা প্রথম যাত্রীটির কথা শুনে অবাক হয়। পেছন ফিরে আগের সেই লাইট পোস্টটা দেখে। কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, এখানে তো বেশ কিছুক্ষণ কাউকে দেখিনি। এই পথ দিয়ে কেউ যানও নি।

এবার ট্রেনের বাঁশি বেজে ওঠে।

ফলে প্রথম যাত্রীটি হতাশভাবে নিজের কামরার দিকে ছোটেন। কামরায় উঠেও প্ল্যাটফর্মের ওপর সন্ধানী দৃষ্টি মেলে রাখেন।

নির্দিষ্ট সময় প্রথম যাত্রীটি তাঁর গন্তব্যস্থলে পেঁছান। রাত্রের পোষাক পরে যে বাড়ীতে উঠেছেন, সেই বাড়ীর বসবার ঘরে যান। সেখানে বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে উপস্থিত দেখেন। তিনিও সকলের সঙ্গে গল্প গুজবে মেতে ওঠেন।

সকলের সঙ্গে খাবার খাওয়ার সময় তার মনে পড়ে ট্রেনের সেই বয়স্ক ভদ্রলোকের কথা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকলের সামনেই বাড়ীর গিন্নী ওরফে বয়স্ক ভদ্রলোকের ভাইঝিকে উদ্দেশ্য করে তার কাকার সঙ্গে আলাপ ও তাদের প্রতি বয়স্ক ভদ্রলোকের শুভেচ্ছার কথা বলেন।

প্রথম যাত্রীটির কথায় বাড়ীর গিন্নী কি রকম যেন ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। ভীষণ বিব্রত বোধ করেন। মহিলাটির স্বামীর অবস্থাও প্রায় তার গিন্নীর মত।

প্রথম যাত্রীটি আসল ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারেন না। এতগুলো গণ্যমান্য লোকের সামনে কথা বলাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি বলে অনুমান করেন। নিজেও লজ্জিত হন। আর কথা বাড়ান না। খাবার শেষ করে নিজের থাকার ঘরে চলে যান।

একটু পরেই বাড়ীর কর্তা প্রথম যাত্রীটির থাকার ঘরে আসে। বলে, খাবার সময় আপনি যে কথা অর্থাৎ আমার স্ত্রীর কাকার কথা বলেছেন, তা আমরা ঠিকভাবে নিতে না পারার জন্য দুঃখিত। কেননা, কিছুদিন আগে আমার স্ত্রীর কাকা রেল কোম্পানীর সত্তর হাজার পাউণ্ড নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। অনেক চেষ্টা করেও তাঁর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য পুলিশ সমানে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্বভাবতই, এ জাতীয় কথা বাড়ীর গণ্যমান্য অতিথিদের সামনে বলায় আমরা দুজনেই খুবই বিব্রত বোধ করেছি। আশা করি, আপনি এ বিষয়ে মনে কিছু করবেন না।

এবার প্রথম যাত্রীটি সত্যিই খুব লজ্জিত হন। অতসব না জানার জন্য বিব্রত বোধ করেন। গৃহকর্তার কাছে ক্ষমা চান।

খাবার সময় প্রথম যাত্রীটির মন্তব্য উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ভাল

করেই শুনতে পান। তাদের দুজন রেল কোম্পানীর পরিচালক ছিলেন। খাবার একটু পরেই দুজন প্রথম যাত্রীটির সঙ্গে দেখা করেন। বয়স্ক ভদ্রলোকের নিখোঁজ হওয়ায় ব্যাপারে নূতন কোন সূত্র বের করতে চেষ্টা করেন।

অনেক চেষ্টার পরও নূতন কোন সূত্র বের করতে পারেন না তাঁরা। ফলে, প্রথম যাত্রীটিকে তাঁরা অনুরোধ করেন যে, রেলের পরিষদের সামনে যদি বয়স্ক ভদ্রলোক সম্বন্ধে কিছু বলেন, তা হলে রেল কোম্পানীর খুবই উপকার হবে।

প্রথম যাত্রীটি সঙ্গে সঙ্গে রেলের পরিচালকদের অনুরোধ গ্রহণ করেন। কবে কোথায় তাকে যেতে হবে তা সেদিনই ঠিক হয়।

নির্দিষ্ট দিনে রেলের পরিষদের সামনে হাজির হন প্রথম যাত্রীটি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বয়স্ক ভদ্রলোকের গতিবিধি ও কথাবার্তা বলতে থাকেন। কথা বলতে বলতে প্রথম যাত্রীটি পরিষদ সদস্যদের মধ্যে একজনকে দেখিয়ে বলেন, এই ভদ্রলোককেই তো রেল ষ্টেশনের প্লাটফর্মে সেই বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।

প্রথম যাত্রীর কথায় সকলে রেল কোম্পানীর একজন কোষাধ্যক্ষের দিকে তাকায়।

হঠাৎ আক্রমণে কোষাধ্যক্ষ ভদ্রলোক হকচকিয়ে ওঠে। বলে না না, এ কিছুতেই সম্ভব নয়। সে সময় আমি ছুটিতে ছিলাম।

এবার পরিচালকমণ্ডলী প্রথম যাত্রীটিকে ভাল করে কোষাধ্যক্ষকে দেখে তারপর নিজের মন্তব্য সম্বন্ধে বিবেচনা করতে বলেন।

প্রথম যাত্রীটি বেশ জোরের সঙ্গে নিজের প্রথম মন্তব্যকে সমর্থন জানান। ফলে পরিচালকমণ্ডলী ঠিক করেন, প্রথমে তাঁরা ভাল করে খোঁজ নেবেন যে, কোষাধ্যক্ষ সত্যিই বয়স্ক ভদ্রলোক নিখোঁজ হবার সময় ছুটিতে ছিলেন কি না? তারপর রেলের পুরানো হিসাবপত্র পরীক্ষা করা হবে আবার নূতন করে।

প্রথম অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বয়স্ক ভদ্রলোক নিখোঁজ হন যে সময়, কোষাধ্যক্ষ সে সময় ছুটিতে ছিলেন না।

ফলে, সকলে কোষাধ্যক্ষকে জেরার পর জেরা শুরু করে।

এক সময় জেরার চোটে কোষাধ্যক্ষ স্বীকার করে যে, বয়স্ক

ভদ্রলোকটি যে সত্তর হাজার পাউণ্ড নিয়ে ট্রেনে যাচ্ছেন সে কথা সে আগেই জানতে পায়। ফলে, নির্দিষ্ট ষ্টেশনে সে বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে সে তাকে অনুসরণ করে। সে বয়স্ক ভদ্রলোককে কথায় ভুলিয়ে নিয়ে আসে একটা নির্জন জায়গায়। উদ্দেশ্য ছিল, মাথায় আঘাত করে বয়স্ক ভদ্রলোককে অজ্ঞান করা হবে। অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দেবে তার হাতের পাউণ্ড ভর্তি বাক্সটা নিয়ে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোষাধ্যক্ষ বয়স্ক ভদ্রলোককে মাথায় আঘাত করে। ফলে, একটা পাথরের ওপর আছড়ে পড়েন ভদ্রলোক। তাঁর মৃত্যু হয় তাতেই।

আসলে বয়স্ক ভদ্রলোককে হত্যা করতে চায়নি কোষাধ্যক্ষ।

বয়স্ক ভদ্রলোকের নিরুদ্দেশের পর যে কামরায় বয়স্ক ভদ্রলোক চেপেছিলেন, সেই কামরা কোন এক অজ্ঞাত কারণে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রথম যাত্রীটির সঙ্গে দেখা করেন যেদিন বয়স্ক ভদ্রলোক, কারখানা থেকে আনা হয় সেদিনই প্রথম সেই কামরাটা।

ট্রেনের গার্ডকে জেরা করেন পরিষদের সদস্যরা।

জেরার মুখে গার্ড বলে, সে একজন ভদ্রলোককে গাড়ীর কামরায় ঢুকিয়ে কামরার দরজায় এমনভাবে তালা দিল যে, কামরার যাত্রীরা কামরার ভেতর থেকে কামরার দরজা খুলতে পারবে। কিন্তু কেউ কামরার দরজা খুলতে পারবে না বাইরে থেকে। ট্রেন চলতে শুরু করে তারপরই। ফলে, তার পক্ষে বলা সম্ভব নয় পরের ঘটনার কোন কথাই।

ডাইনি বুড়ির ভবিষ্যদ্বাণী

ই. এম. ফর্স্টার

আমার পাণ্ডুলিপিটা "দ্বৈতবাদ বিতর্ক"-এর উপর লেখা। যখন ভূমধ্যসাগরের জলে পড়ে তলিয়ে যেতে লাগল তার চাইতে সুন্দর দৃশ্য আমি খুব অল্পই দেখেছি। বইখানা ডুবে গেল একখণ্ড কালো পাথরের মত, নীল জলের মধ্যে কাঁপতে লাগলো ফিকে সবুজ পাতাগুলো খুলে গিয়ে। এই অদৃশ্য হয়ে গেল, আবার দেখা দিল অনন্ত সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একখণ্ড যাদুকরী রবারের মত, আবার হয়ে উঠল একখানি বই, সর্ববিদ্যা-সংগ্রহ পুঁথির চাইতেও বড়। বইখানা যেন আরও অলৌকিক হয়ে উঠল সমুদ্রের একেবারে তলায় পেঁছে; একমুঠো বালুকণা যেন তাকে সাদরে গ্রহণ করে দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। বইটা আবার দেখা দিল; বেশ স্বাভাবিক ঈষৎ কাঁপলেও; চিৎ হয়ে পড়ে আছে পাতা খোলা অবস্থায়, আর অদৃশ্য আঙুলগুলি সেই পাতার মধ্যে নাড়াচাড়া করছে।

পিসি বলল, 'খুবই দুঃখের কথা যে হোটেলে থাকতে তোমার বইটা

শেষ করলে না। তাহলে এখন বেশ খোলা মনে বেড়াতে পারতে, আর এ ঘটনাটাও ঘটত না।"

পাদরি বলল, নষ্ট কিছুই হবে না ; সবই ফিরে আসবে আরও সমৃদ্ধ হয়ে আরও বিস্ময় নিয়ে।" তার বোন বলল, "সে কি আশ্চর্য, অতলে তলিয়ে গেল বইটা যে।" মাঝিদের একজন হেসে উঠল, আর মুখে কিছু না বলে অপরজন উঠে দাঁড়িয়ে পোষাক খুলতে শুরু করল।

চেঁচিয়ে উঠল কর্ণেল, "পুণ্যাত্মা মোজেস। লোকটা পাগল কি ?"

পিসি বলল, "ঠিক, তাকে ধন্যবাদ দিন ; অর্থাৎ তাকে বলুন যে খুবই দয়ালু, কিন্তু এখন থাক।"

আমি অভিযোগের সুরে বললাম, "যাই বল, আমি চাই বইটা আমার কাছে ফেরৎ আসুক। এটা যে আমার 'ফেলোশিপের আলোচনা।' যে ওর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না আর অপেক্ষা করলে।"

ছাতার আড়াল থেকে কোন নারী-কণ্ঠ বলে উঠল, "আমি একটা কথা বলছি। প্রকৃতির সন্তানটি বইটা তুলে আনতে জলে ডুব দিক, আর আমরা অন্য কোন 'গ্রোটো'তে (বিশ্রামশালায়) চলে যাই। তাকে নামিয়ে দিয়ে যাব এই পাহাড়ে বা অন্য কোথাও, আর ততক্ষণে সেও সেখানে হাজির থাকবে আমরা যখন ফিরব।"

ভালই মনে হল প্রস্তাবটা ; তাতে কিছুটা যোগ করে আমি বললাম, আমিও সেখানেই নেমে যাব ; তাতে নৌকাটাও কিছুটা হাল্কা হবে। কাজেই ছোট গ্রোটোরি বাইরে একটি রৌদ্রস্নাত পাহাড়ের বুকে আমাদের দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হল।

নৌকোটা ছেড়ে যেতেই বুঝলাম, কত বড় অবিবেচক আমি। একটা গড়ানে পাহাড়ের উপর আমার একমাত্র ভরসা একজন অজ্ঞাত মিসীলীয় অধিবাসী। নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে সে বলল, "গ্রোটোর শেষপ্রান্তে চলুন, আপনাকে একটা সুন্দর জিনিস দেখাব।"

তার কথামত একলাফে পাহাড় থেকে বেরিয়ে-আসা পাথরটার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জন। সে আমাকে আলোর কাছ থেকে টেনে নিয়ে চলল। একেবারে শেষপ্রান্তে একটি ছোট পীরোজাচূর্ণের মত বালুকাময় সৈকতভূমিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে

আমার হাতে তার পোষাকপত্র দিয়ে সে দ্রুতপায়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল। মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল সূর্যালোকে সে উলঙ্গদেহে একবার দাঁড়াল, নীচে যেখানে বইটা রয়েছে সেদিকে তাকাল। তারপর বুকের উপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে দুই হাত মাথার উপর তুলে ঝাঁপ দিল।

বইটা যদি আশ্চর্য কিছু হয়, লোকটি সব বর্ণনার অতীত। সে যেন সাগরের তলে জীবন্ত একটি রুপোলি মূর্তি; তার মধ্যে জীবনের ধারাটি কাঁপছে সবুজ-নীলে। তার সুখ অনন্ত জ্ঞান অনন্ত—কিন্তু, রোদে-পোড়া, জল-ঝরা শরীর নিয়ে দ্বৈতবাদী বিতর্ক"-এর পুঁথিখানা দুই সারি দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে সে যে আবার উঠে আসবে সে তো একেবারেই অসম্ভব।

ডুবুরিরা সাধারণত কিছু আর্থিক পুরস্কার আশা করে। আমি যতই দেই না কেন সে নিশ্চয়ই আরও বেশী চাইবে; আর এরকম একটা সুন্দর নির্জন জায়গায় কোনরকম তর্কাতর্কি করার ইচ্ছাও আমার ছিল না। তাই কথাপ্রসঙ্গে সে যখন বলল, "এরকম জায়গায় কুহকিনীদের দেখা পাওয়া যেতে পারে," তখন আমি খুবই স্বস্তি বোধ করলাম।

তার কথায় তার পরিবেশের সুর বেজে ওঠায় আমি খুশি হলাম। এখন আমরা রয়েছি সাধারণ বাস্তব জগৎ থেকে অনেক দূরে এক মায়া-জগতে; এ যেন এক নীলের জগৎ—সমুদ্র যার মেঝে, যার পাহাড়ের দেওয়াল ও ছাদের ছায়া সমুদ্রের জলে পড়ে কাঁপছে—এখানে একমাত্র অলৌকিককেই সহ্য করা যায়। আর সেই মনোভাব নিয়েই আমিও তার কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললাম, "সহজেই কুহকিনীর দেখা পাওয়া যেতে পারে।"

পোশাক পরতে পরতে সে সকৌতূহলে আমাকে দেখতে লাগল। বালির উপর বসে আমি বইয়ের লেপ্টে-যাওয়া পাতাগুলি খুলছিলাম।

অবশেষে সে বলে উঠল, "ওহো, আপনি হয় তো গত বছর ছাপানো বইটা পড়েছেন। কে ভাবতে পেরেছিল যে আমাদের কুহকিনী বিদেশীদেরও আনন্দ দিতে পারবে!"

(আমি পরবর্তীকালে সেটা পড়েছিলাম। যুবকটির একটা কাঠ-খোদাই ছবি থাকা সত্ত্বেও বিবরণটি স্বভাবতই অসম্পূর্ণ ছিল।)

আমি বললাম, "সে তো নীল সাগরের ভিতর থেকে উঠে আসে তাই না? আর পাহাড়ের ঠিক মুখে বসে চুল আঁচড়ায়?"

সে শুধাল, "আপনি কি কোনদিন তাঁকে দেখেছেন ?"
"প্রায়ই তো দেখি।"
"আমি কোনদিন দেখি নি।"
"কিন্তু তুমি তার গান তো শুনেছ ?"
কোটটা গায়ে দিয়ে সে অধৈর্য গলায় বলল, "জলের নীচে সে গান করবে কেমন করে ? কে তা পারবে ? অনেক সময় সে গাইতে চেষ্টা করে কিন্তু বড় বড় বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছুই তার মুখ থেকে বের হয় না।"
"তার তো পাহাড়ের উপর উঠে যাওয়া উচিত।"

এবার সে রেগে বলল, "তা কেমন করে যাবে। পুরোহিতরা তো বাতাসকে মন্ত্রপূত করে রেখেছে, সে-বাতাসে সে নিশ্বাস নিতে পারে না পুরোহিতরা পাহাড়কে মন্ত্রপূত করে রেখেছে, সেখানে সে বসতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রকে কেউ মন্ত্রপূত করতে পারে না, কারণ সমুদ্র যে অনেক বড় আর সদা পরিবর্তনশীল। তাই সে সমুদ্রেই থাকে।"

আমি চুপ।

এবার তার মুখটা শান্তভাব ধারণ করল। এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন একটা কিছু তার মনে এসেছে। প্রবেশমুখের পাহাড়টায় গিয়ে সে বাইরের নীল সমুদ্রের দিকে তাকাল ; তারপর ফিরে এসে বলল, নিয়ম হচ্ছে একমাত্র ভীত মানুষেরাই কুহকিনীকে দেখতে পায়।"

আমি কোন মন্তব্য করলাম না। একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল। "সে এক আশ্চর্য ব্যাপার ; পুরোহিতরাও তার ব্যাখ্যা করতে পারে না। অবশ্য সে খুব দুষ্টু। শুধু যে যারা উপবাস ও প্রার্থনা করে তাদেরই বিপদ ঘটে তা নয়। যারা দৈনন্দিন জীবনে শুধুই ভাল মানুষ তাদেরও বিপদ ঘটে। দুই প্রজন্ম ধরে কেউ তাকে দেখে নি। আমি তাতে অবাক হই না। জলে নামবার আগে আমরা সকলেই ক্রুশচিহ্ন আঁকি ; কিন্তু সেটা অদরকারী। আমরা ভাবতাম, গিসেপ্পি অন্য অনেকের চাইতে নিরাপদ। আমরা তাকে ভালবাসতাম সেও আমাদের অনেককেই ভালবাসত ; কিন্তু তাকে তো আর ভাল হওয়া বলে না।

আমি জানতে চাইলাম, গিসেপ্পি কে ?

"সেদিন—তখন আমার বয়স ছিল সতেরো আর দাদার বয়স কুড়ি ; সে ছিল আমার চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী ; আর যে অতিথিরা এই

গ্রামকে দিয়ে সম্পদ ও নানা রকমের পরিবর্তন সেই বছরই তারা প্রথম আসতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে একজন ইংরেজ মহিলা এসেছিলেন; খুব বড় ঘরের মেয়ে; এই জায়গাটা সম্পর্কে একখানা বইও লিখেছেন; তারই চেষ্টায় এখানে গড়ে উঠেছে ইমপ্রুভমেণ্ট সিণ্ডিকেট; আর সিণ্ডিকেট একটি বিশেষ রেলপথের সাহায্যে হোটেল-গুলিকে স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত করার কাজে নেমেছে।"

"সে মহিলার কথা না হয় এখন থাক", আমি বললাম।

"সেদিন তাকে ও তার বন্ধুদের ফটোগুলো দেখাতে নিয়ে গেলাম। পাহাড়ের ধার ঘেঁসে-নৌকো চালিয়ে যেতে যেতে যেমন সকলেই করে থাকে আমিও তেমনি হাত বাড়িয়ে একটা ছোট কাঁকড়া তুলে নিয়ে তার দাঁড়াগুলো ভেঙে তাদের দিকে গেলাম। মহিলারা তো ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কিন্তু একটি ভদ্রলোক খুশি হয়ে টাকা দিতে চাইলেন। অনভিজ্ঞ লোক হওয়ায় আমি টাকা নিতে অস্বীকার করলাম। বললাম, তিনি যে সুখী হয়েছেন সেটাই যথেষ্ট পুরস্কার। গিসেপ্পি পিছনের দাড়ে বসেছিল, আমার ওপর খুব রেগে হাতটা বাড়িয়ে সে আমার মুখের কোণে এত জোরে আঘাত করল যে দাঁত লেগে আমার ঠোঁটটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। আমি তাকে পাল্টা আঘাত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে আবার আঘাত করল আমার বগলের নীচে। মহিলাদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল। পরে শুনেছিলাম, তারা তখনই মতলব করছিল যে আমাকে দাদার কাছ থেকে নিয়ে হোটেলের ওয়েটার বানিয়ে তুলবেন। অবশ্য, সেটা আর ঘটে ওঠে নি।"

"যখন গ্রোটোতে পেঁছিলাম—এখানে নয়, সেটা আরও বড়—তখন ভদ্রলোকটি প্রস্তাব করল, আমাদের দুজনের যেকোন একজনকে টাকার বিনিময়ে সমুদ্রে ডুব দিতে হবে। মহিলারাও তাতে সম্মতি জানাল। আমাদের জলে ডুব দিতে দেখে বিদেশীরা যে কত আনন্দ পায় গিসেপ্পি তা ভালোই জানে। তাই সে গোঁ ধরে বসল যে রুপো না পেলে সে ডুব দেবে না। ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ একটা দুই লিরার মুদ্রা সমুদ্রে ছুঁড়ে দিল।"

"জলে ঝাঁপ দেবার ঠিক আগে দাদার চোখে পড়ল, যে আমি কাটা ঠোঁটটা চেপে ধরে কাঁদছি। সে হেসে বলে উঠল, কোন ভয় নেই রে।"

এবার অন্তত কুহকিনীর সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে না! ক্রুশ-চিহ্ন না এঁকেই সে ডুব দিল। কিন্তু কুহকিনীর দেখা সে পেল।"

কথা থামিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট নিল। প্রবেশ মুখের সোনারং পাহাড় কম্পন দেওয়াল ও যাদুকর সাগরের দিকে তাকালাম। সেখানে অনবরত বড় বড় বুদ্বুদ উঠেছে।

অবশেষে সিগারেটের গরম ছাই ঢেউয়ের উপর ফেলে সে মুখটা ঘুরিয়ে বলল, "মুদ্রাটা না নিয়েই দাদা উঠে এল। তাকে টেনে নৌকোতে তুললাম। জল খেয়ে পেট ঢাক হয়ে গেছে, এতবেশী ভিজে গেছে যে পোশাকটাও পরানো-গেল না। কোন লোককে এত বেশী ভিজতে আমি কখনও দেখি নি। ভদ্রলোক ও আমি নৌকো বেয়ে ফিরে এলাম। গিসেপ্পিকে বস্তা দিয়ে ঢেকে মাস্তুলের গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলাম।"

আমি অস্ফুট গলায় বললাম, "সে তাহলে ডুবে যায় নি?"

লোকটি রেগে বলল, "না। সে কুহকিনীকে দেখতে পেয়েছিল। আপনাকে তো বলেছি।"

আবার চুপ করে গেলাম।

"অসুস্থ না হলেও তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ডাক্তার এসে টাকা নিয়ে গেল। পুরোহিত এসে তার গায়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সে তখন ভীষণ ফুলে উঠেছে। —সাগরের মতই। 'সান বিয়োগ'-র বুড়ো আঙুলের হাড়ে চুমো খেল; সন্ধ্যার আগে সে দাগ শুকোল না।"

"তখন সে কেমন দেখতে হয়েছিল?" সাহস করে শুধালাম।

"যে কেউ কুহকিনীকে দেখলে যেমনটি হয় ঠিক সেইরকম। আপনি যদি 'প্রায়ই' তাকে দেখে থাকেন তো বুঝতে পারছেন না কেন? সুখ ছিল না, কারণ সে সবই জানত। যা কিছু জীবন্ত তাই তার দুঃখের কারণ, কারণ সে জানত সে মরে যাবে। সে তখন কেবল ঘুমোতে চাইত।"

আমার বইটাতে মন দিলাম।

"কাজ করে না, খেতে ভুলে যায়, পোশাক পরেছে কি না তাও ভুলে যায়। সব কাজের চাপ পড়ল আমার উপরে; বোনকেও কাজে বেরোতে

হয়। তাকে ভিক্ষুক সাজাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার-সমর্থ চেহারা দেখে কারও করুণা হত না ; বুদ্ধিহীন হলেও তার চোখে সেটা ফুটে উঠত না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে লোকজনের দিকে তাকিয়ে থাকত ; যত তাকাত তত তার দুঃখ বাড়ত। কোন শিশুর জন্ম হলে সে দুই হাতে মুখ ঢাকত। কেউ বিয়ে করলে সে তো ভয়ংকর হয়ে উঠত ; তারা যখন গির্জা থেকে বেরিয়ে আসত তখন তাদের শাসাত। তখন কে জানত যে সে নিজেই একদিন বিয়ে করে বসবে। আর সেটা আমি ঘটিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, আমি। খবরের কাগজে পড়লাম, রাগুসার একটি মেয়ে 'সমুদ্রে স্নান করে পাগল হয়ে গেছে।' গিসেপ্পি উঠে দাঁড়াল, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরল।

'দাদা আমাকে কখনও কিছু বলে নি, কিন্তু আমার ধারণা সে সোজা মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে দরজা ভেঙে তাকে তুলে নিয়ে এসেছিল। সে ছিল এক ধনী খনিমালিকের মেয়ে। কাজেই আমাদের বিপদটা তো বুঝতে পারছেন। একজন নিপুণ উকিলকে সঙ্গে নিয়ে বাবা ছুটে এল আমাদের বাড়িতে, কিন্তু আমার চাইতে বেশী কিছুই করতে পারল না। তারা তর্ক করল, ভয় দেখাল, আর শেষ পর্যন্ত ফিরে গেল। আমাদের কিছুই হল না—অর্থাৎ টাকা পয়সা ব্যয় করতে হল না। গিসেপ্পি ও মারিয়াকে নিয়ে গির্জায় গেলাম, তাদের বিয়ে দিয়ে দিলাম। উঃ। সে কী বিয়ে। পুরোহিত আর কোনদিন ঠাট্টা তামাসা করে নি, আর গির্জা থেকে বের হতেই ছেলেরা ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগল·····মেয়েটিকে সুখী করতে আমি মরতেও রাজী ছিলাম ; কিন্তু এক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, কারও কিছুই করার ছিল না।"

"তাহলে বিয়ের পর তারা দুজনেই অসুখী হয়েছিল ?"

"তারা পরস্পরকে ভালবাসত, কিন্তু ভালবাসা তো সুখ নয়। ভালবাসা আমরা সকলেই পেতে পারি। ভালবাসা তো তুচ্ছ। তখন দুটো কাজের লোক রাখতে হয়েছিল, কারণ সব ব্যাপারেই যেমন দেবা তেমন দেবী—কে যে কখন কি বলে তা কেউ জানে না। নিজেদের নৌকোটা বিক্রি করে দিয়ে এখন এই খারাপ বুড়োটার কাছে কাজ করতে হচ্ছে। সবচাইতে খারাপ কি জানেন, সকলেই আমাদের ঘৃণা করতে শুরু করল। প্রথমে ছোট ছেলেমেয়েরা—তাদের দিয়েই তো সব কিছু

শুরু হয়—তারপর নারীরা, আর সবশেষে পুরুষরা। কারণ সব দুর্ভাগ্যেরই কারণ তো—আপনি আবার কাউকে বলে দেবেন না তো ?”

আমি কথা দিলাম কাউকে বলব না। সে আবার বলতে শুরু করল।

“মারিয়ার পেটে সন্তান এল। লোকে বলল, তোমার আদরের ভাইপোটি কতদিনে জন্মাবে ? আহা, এমন বাবা-মার কি সন্তানই না হবে।” স্থির গলায় জবাব দিতাম, সন্তান ভালই হবে। কথায় বলে, “দুঃখ থেকেই তো সুখের জন্ম।” আমার জবাব শুনে তারা ভয় পেল, পুরোহিতদের গিয়ে বলল, আর পুরোহিতরা আর ভয় পেল। তারপরই কানঘুসা শুরু হয়ে গেল যে সন্তানটি হবে খৃস্টবিরোধী। ভয়ের কোন কারণ নেই ঃ সে কোনদিন জন্মাবে না।

“এক বুড়ি ডাইনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগল, কেউ তাকে বাধা দিল না। সে বলল, গিসেপ্পি ও মেয়েটা হল ছোট শয়তান, তারা বেশী কিছু ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু সন্তানটি হবে মহা শয়তান ; হাসবে খেলবে কথা বলবে, এবং শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়ে কুহকিনীকে এনে বাতাসে ছেড়ে দেবে আর সারা জগৎ তাকে দেখবে, তার গান শুনবে। যে সে গান উঠবে অমনি সপ্ত ভাণ্ডারের ঢাকনা খুলে যাবে, পোপ মারা যাবেন, মঙ্গিবেলেত আগুন লাগবে, আর সান্তা আগাতার ঘোমটা পুড়ে যাবে। তারপর সেই ছেলের সঙ্গে কুহকিনীর বিয়ে হবে, আর তারা দুজনে মিলে চিরকাল ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করবে।

“সারা গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল, হোটেলওয়ালারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, কারণ যাত্রীদের আসার মরশুম সবে শুরু হতে চলেছে। তারা সকলে একজোট হয়ে স্থির করল, সন্তান না হওয়া পর্যন্ত গিসেপ্পি ও মেয়েটিকে আরও ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আর সে জন্য অনেক টাকা চাঁদা তোলা হল। যেদিন তাদের চলে যাবার কথা তার আগের রাতটা ছিল পূর্ণিমা। আকাশে ভরা চাঁদ, হঠাৎ পূব থেকে ধেয়ে এল বাতাস, সমুদ্র ফেঁপে-ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পেঁছাল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। মারিয়া বলল, সে আর একবার দৃশ্যটা দেখবেই।

“আমি বললাম, ‘তুমি যেয়ো না। আমি পুরোহিতকে ওদিকে যেতে দেখেছি। সঙ্গে আরও কেউ আছে। হোটেলওয়ালারা চায় না যে তোমাকে কেউ দেখুক। তাদের চটালে আমরা যে না খেয়ে মারা যাবো।”

"মেয়েটি জবাব দিল, 'আমি যাব। সমুদ্রে ঝড় উঠেছে ; এ দৃশ্য হয় তো আর কোনদিন দেখতে পাব না।"

গিসেপ্পি বলল, 'ভাই ঠিকই বলেছ। তুমি যেয়ো না। যদি যাওই তো আমরা একজন তোমার সঙ্গে যাব।'

'আমি একলা যাব', একথা বলে, একলাই সে গেল।

তাদের মালপত্র একটা কাপড়ে পুঁটুলি বেঁধে দিলাম ; কেমন যেন মনে হতে লাগল যে তাদের দুজনকেই আমি হারাব। দাদার পাশে গিয়ে বসে দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম, আর সেও আমার গলা জড়িয়ে ধরল। এক বছরের উপর হয়ে গেল সে আমাকে এভাবে জড়িয়ে ধরে নি। এইভাবে কতক্ষণ যে আমরা বসেছিলাম তা মনে পড়ে না।

"দরজা খুলে গেল হঠাৎ। একসঙ্গে ঘরে ঢুকল চাঁদের আলো ও বাতাস। হাসতে হাসতে বলল, একটি শিশু-কণ্ঠ, ওরা পাহাড়ের উপর থেকে তাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে।"

টানাটার কাছে ছুটে গেলাম। আমার ছোরা-ছুরিগুলো থাকে সেই টানার মধ্যে।

"বসে থাকব", গিসেপ্পি বলল। "অন্যকেও মরতে হবে কেন সে মরেছে বলে ?"

চীৎকার করে বললাম, "কে করেছে একাজ জানি আমি। আমি তাকে খুন করব।"

"প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিলাম ঘর থেকে, কিন্তু আমাকে সে জাপ্‌টে ধরল। দুটো হাত চেপে ধরে কব্জি দুটো মুচড়ে দিল—প্রথমে ডানাটা তারপর বাঁটা। এ কাজের কথা আর কেউ ভাবতেও পারত না গিসেপ্পি ছাড়া। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম যন্ত্রণায়। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম সে চলে গেছে। তাকে দেখিনি আর কোনদিন।"

কিন্তু গিসেপ্পিকে আমার ভাল লাগল না।

লোকটি বলল, "সে খারাপ লোক ছিল আপনাকে তো বলেছি। সে যে কুহকিনীকে দেখতে পাবে তা কেউ আশা করেনি।"

"তা তুমি জানলে কেমন করে সে যে কুহকিনীকে দেখেছিল।"

কারণ সে তো তাকে মাঝে মাঝেই দেখে নি, মাত্র একবারই দেখেছে।"

"তুমি তাকে ভালবাস কেন, সে যদি খারাপ লোকই হবে ?"

সে হেসে উঠল এই প্রথম। আর সেটাই তার একমাত্র জবাব।

"আমি শুধালাম এখানেই শেষ ?"

"যে লোক মেয়েটিকে খুন করেছিল আমি তাকে মারি নি ; কারণ আমার কব্জি দুটো যখন ভাল হল ততদিনে সে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে ; তাছাড়া একজন পুরোহিতকে তো খুন করা যায় না। কুহকিনীকে দেখেছে এমন আর একটি মানুষের খোঁজে সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান—সে যদি পুরুষ হয় তো হোক, তবে নারী হলেই ভাল হয়, কারণ তাহলে হয়তো একটি সন্তানের জননী হতে পারবে। শেষ পর্যন্ত সে লিভারপুলে হাজির হল ; সেখানে তার কাশি হল আর শেষ পর্যন্ত মারা গেল।"

"কুহকিনীকে দেখেছে এমন কেউ বেঁচে আছে বলে আমি মনে করি না। এক প্রজন্মে সে রকম মানুষ একজনের বেশী কদাচিৎ থাকে ; আমার জীবনকালে আর কোনদিন এমন দুটি নরনারীকে পাব না যাদের মিলনে সেই শিশুর জন্ম হবে, যে সমুদ্রের বুক থেকে কুহকিনীকে ডেকে আনবে নৈঃশব্দকে ধ্বংস করবে আর পৃথিবীকে বাঁচাবে।"

"পৃথিবীকে বাঁচাবে ?" আমি চীৎকার করে বললাম। সেটাই কি ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ কথা ছিল ?"

সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে আমি তাকেই দেখতে পেলাম সব নীল-সবুজ প্রতিবিম্বের মধ্যে শুনতে পেলাম ঃ চিরদিন থাকতে পারে না "নৈঃশব্দ ও নির্জনতা। একশ' বছর হাজার বছর থাকতে পারে ; আরও বেশীদিন থাকবে সমুদ্র, কুহকিনী গান করবে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে।" জিজ্ঞাসা করার ছিল আরও কিছু, কিন্তু গুহাটা অন্ধকার হয়ে গেল সেই মুহূর্তে, ফিরতি নৌকোটা এসে ভিড়ল তার সংকীর্ণ প্রবেশ-মুখে।

———

অভিশপ্ত বাড়ি

এ. ই. ডি. স্মিথ

আমি বেশ ভাল করেই জানি অফিসের অন্য লোকেরা আমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে করে। যদিও, একজন লোক যে অধ্যয়নশীল স্বভাব-বিশিষ্ট, যে গোলমাল পছন্দ করে না এবং যে নির্বোধের সঙ্গই বেছে নেয়, আরো বিশেষ করে দৃষ্টির অভাবহেতু যে মোটা কাঁচের চশমা পরে, সে ভুল বুঝে থাকবে সব সময় নীচমনা লোকদের কাছে। সাধারণভাবে, আমার বন্ধুদের মতামতের জন্যে যে অবজ্ঞা পাওয়া উচিত তাই দিয়ে থাকে। কিন্তু আমি ভাবতে শুরু করেছি যে তাদের অভিমতের পেছনে হয়ত কিছু থাকতে পারে এই বিশেষ মুহূর্তে। যদিও আমি মেনে নিতে পারি না, ঐ বিচিত্র পক্ষীবিশেষেয় ব্যাপারটা তবে নিঃসন্দেহে আমি একটা প্রথম শ্রেণীর বোকা লোক। তা না হলে আমি ছুটিটা উপভোগ করতে পারতাম দিব্যি আরামে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে। ভাঁড়ের গান শুনে অথবা সমুদ্রের ধারে বিশ্রাম নিয়ে দিন কাটাতাম। তার পরিবর্তে ফ্রান্সের এক নাম জানা জায়গায় বোকার মত সাইকেলে ঘুরে বেড়াবার মতলব করেছি! বৃষ্টিতে পুরাদস্তুর ভিজে, ক্ষুধার্ত ও দিশেহারা হয়ে,

মাল বোঝাই সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এক অচেনা দেশে অপরিচিতের মত।

অনেক মাইল দূরে সরে গেছি ঝড়ের বেগে আমি নির্দিষ্ট পথ থেকে ভোসজেসের এক জনশূন্য রাস্তা দিয়ে প্রায় দুঘণ্টা ধরে প্রবল বৃষ্টি মাথায় করে অনেক কষ্টে চলেছি, কোথাও চোখে পড়েনি জীবন্ত মানুষ অথবা মানুষের বাসস্থান।

অবশেষে অনেকক্ষণ পর একটা মোড় ঘুরতেই সামনে একটা বাড়ির ছাদের অংশ এবং চিমনী চোখে পড়ল। বাড়িটা অবস্থিত রাস্তা ছেড়ে একটু ভেতরে একটা গাছের ছাড়ের আড়ালে নির্জন জনশূন্য পরিবেশে। এমন কি সেখানে আকর্ষণ করার মত কিছু নেই। তবু ওই বন্য পরিবেশের মধ্যেও বাড়িটা স্বাগতম জানবার পক্ষে যথেষ্ট। সাময়িক আশ্রয় পাবার আশ্রয় এবং কিছু খাবার প্রয়োজনেও, আমি সেইদিকে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম। এক শোচনীয় হতাশার সম্মুখীন হলাম দুশো গজ যাবার পর তবে বাড়ির গেটের সামনে এসে হাজির হয়ে। ছাদহীন দারোয়ানের ঘর, পুরনো ক্ষয়প্রাপ্ত লোহার গেট দুটো কব্জার ওপর ভর করে ঝুলছে, সামনের পায়ে-চলার পথটা ঝোপঝাড়ে ভর্তি—এখানে কেউ থাকে না এ সবকিছু ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মন থেকে সব ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে এই বলে চাঙ্গা করে তুলতে লাগলাম যে এমন দুর্যোগময় অবস্থার মধ্যে এই পরিত্যক্ত বাড়িটা অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। আমার ভিজে পোশাক নিঙ্ড়োতে পারব আর ভাঙা সাইকেলটাও মেরামত করে নিতে পারব কোন ঢাকা এক আস্তানায় দাঁড়াতে পারলে। তাই আর সময় নষ্ট না করে সাইকেল নিয়ে বারান্দার নিচে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেটা মনে হল একটা পুরানো জমিদার বাড়ি বলে। লতাগুল্ম বাড়িটার দেওয়াল ঢেকে ফেলেছে। দরজার পাশে দুধারে খোদাই করা পাথরে বংশমর্যাদার নিদর্শন। বোঝা যাচ্ছে উঁচু দরের লোক বাস করত এখানে কোন এক সময়ে। ঝুলে ভর্তি জানালাগুলো প্রায় সব বন্ধ, বোধ হচ্ছে বহুদিন কেউ বাস করেনি এখানে।

চেষ্টা করলাম দরজাটা খোলবার। কি আশ্চর্য, দরজা খোলা পাল্লাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে ফাঁক হয়ে গেল কাঁধের একটু ধাক্কা লাগতেই। সামনে

বড় হলঘর, অস্পষ্ট আলোর ভেতরে ঢুকলাম। একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চোখ বোলালাম। একটা পুরনো খালি বাড়িতে ঢুকলে যেমন গা ছম ছম করে আমারও তেমনি একটু ভয় ভয় করছিল। আমার সামনে একটা চওড়া সিঁড়ি তার ঠিক ওপরে লম্বা মত জানালা—কাঁচগুলো মাকড়সার জালে আর ময়লায় ভর্তি, একটুও আলো দেখা যাচ্ছে না। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই যে ঘরটা দেখা গেল তার দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললাম। সাজানো গোছানো ঘরটা বেশ বড়। এটাই প্রধান ঘর বলে মনে হল যদিও বহুদিন অযত্ন ও অব্যবহারে শোচনীয় অবস্থা। কারুকার্য করা কার্নিশ ভেঙে গেছে, ঘরের ছাদের এক কোণের চুনবালি একেবারে খসে গেছে। আঠার শতাব্দীর সবুজ ছাতা ধরেছে, আঠার শতাব্দীর আসবাবপত্রগুলোয়। ছেঁড়া পর্দাকার্পেটের প্রায় অর্ধেকটায় কমলা রঙের ছাতা গজিয়ে উঠেছে।

আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল ফায়ারপ্লেসটা দেখে। জ্বালানি কিছু পেলে আগুন জ্বালিয়ে গরম চা করতে পারি আর ভিজে পোশাক শুকিয়ে নিতে পারি। শুকনো ডালপালা পাওয়া গেল বাইরে একটু খুঁজতেই। কিছু ডালপালা নিয়ে আসা আবার বাড়িতে ঢুকে চটপট সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। কিন্তু কেন জানি না, হঠাৎ থমকে গেলাম ঘরটার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। তাদের ইচ্ছায় পা দুটো যেন আমাকে আর টেনে নিয়ে যেতে চাইল না—কিছু যেন আমাকে ঘরের বাইরে যাবার জন্যে প্ররোচিত করছে। ডালপালা আবার পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে কিছুটা অনিশ্চিতভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই পরিবেশের মধ্যে আমি অজানা বিপদের গন্ধ উপলব্ধি করতে লাগলাম। এ জায়গা ছেড়ে যাবার সময় সব যেমন ছিল তেমনই আছে তবু আমার বোধ হচ্ছে আমার স্বল্পকালের অনুপস্থিতিতে অশুভ কিছুই এই ঘরে ঢুকেছিল, আবার বেরিয়ে গেছে!

আমি ভীতু অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক নই। কিছুক্ষণ পরে আমি ডালপালা তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে ফিরে গেলাম। আসলে আমি একাজ করিনি কোন ভয় পেয়ে। আমি চিন্তা করলাম সদর দরজার কাছাকাছি থাকলে এবং নিচে কোন ঘরে আগুন জ্বালালে হয়ত আমি বেশী স্বস্তি

পাব। তা আমি জানি, যদিও এটা একটা ডাহা মূর্খের কল্পনা কিন্তু—আচ্ছা, যদি কিছু—অদ্ভুত ঘটনাই ঘটল। ঐ পথ দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম।

সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে পা দিয়ে যেই খোলা সদর দরজার আলোর দিকে তাকিয়েছি হঠাৎ একটা জিনিস নজরে পড়তেই চমকে উঠলাম। মনে হল কেউ যেন এইমাত্র ধুলোর ওপর দিয়ে থলে কিংবা ঐ ধরনের কিছু সিঁড়ির মাঝখান দিয়ে উপরে টেনে তুলেছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে লক্ষ্য করলাম, সেই ঘষড়ানো দাগটা হলঘর পেরিয়ে উল্টোদিকে দেওয়ালের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে দেওয়ালে আটকান আলনায় একটা পুরনো, পোকায় কাটা কোট ঝুলছে। দেখলাম অনেকগুলো দাগ ঘরের বিভিন্ন দিকে গেছে—কোনটা দুদিকে দরজার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে, কোন কোনটা সিঁড়ির পাশ দিয়ে বাড়ির পেছন দিকে গেছে—কিন্তু সবগুলো একটা জায়গা থেকেই উদ্ভুত—কোট ঝোলানো আলনা থেকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আর কোন পায়ের চিহ্ন নেই আমার পায়ের দাগ ছাড়া।

আবার আমাকে ঘিরে ধরল অস্থিরতা। মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ বাস করে না অথচ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেউ বা কিছু সম্প্রতি এখানে ছিল। কে অথবা কি অশান্ত, অনুসন্ধানী প্রাণী যে ঐ কোট থেকে অদ্ভুত দাগগুলো করেছে? কোন বোকা ভবঘুরে—হয়ত মেয়ে—যার পেছনে ঝুলেপড়া চাদরের ঘষড়ানিতে তার নিজের পায়ের দাগ মুছে গেছে?

ভাল করে দেখলাম সেই পুরনো কোটটার কাছে গিয়ে। এটা একটা পুরনো ধাঁচের মিলিটারী ওভারকোট, তখনও দু-একটা ময়লাধরা রুপোর বোতাম লাগান রয়েছে স্বাক্ষর বহন করছে বহুদিন ব্যবহারের। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আস্তে আস্তে আলনাটাকে ঘোরালাম। দেখলাম বাঁ কাঁধের ঠিক নিচে পনীর মত গোলাকার একটা গর্ত—তার চারধারের কাপড় পোড়া ও বিবর্ণ, মনে হয় যেন খুব কাছে থেকে পিস্তলের গুলি লেগে এমন হয়েছে। যদি এই গর্ত হয় পিস্তলের গুলিতে নিশ্চয়ই এই কোটটা কোন মৃত মানুষের গায়ের।

মনটা ভরে উঠল একটা বিরক্তিতে, কিন্তু স্থান দিলাম না বেশীক্ষণ।

এটা একটা কল্পনাও হতে পারে না। তবে মনে হল বিশ্রী কাপড়ের গন্ধ ছাড়াও যেন একটা পচা মাংস ও হাড়ের গন্ধও বেরোচ্ছে··· ।

কোন জন্তুর পচা গন্ধ—মৃদু অথচ সন্দেহাতীত—বাতাসে তো আমি ঘ্রাণ নিতে পারছি। সেই সঙ্গে কিছু অবর্ণনীয় কিন্তু সত্য—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত অতীতের কোন কলঙ্কিত ও লজ্জাজনক পাপ কার্যে সমস্ত পরিবেশটা ঘিরে রয়েছে।

নিজেকে শক্ত করে তুললাম। কি এমন আছে যা ভয় করতে হবে? কোন মনুষ্য লুণ্ঠনকারীদের ভয় পাই না কারণ সব সময় আমার কাছে পেস্তল থাকে। আর ভূত? যদি সত্যিই কোন অস্তিত্ব থাকে তবে দিনের বেলায় তারা ঘুরে বেড়ায় না। গা ছমছমে জায়গা এটা ঠিক, আমি ত আর এখানে রাত কাটাচ্ছি না। আমার অতি প্রয়োজনীয় গরম চা ও সাইকেল মেরামত না করে বৃথা অলীক কল্পনায় ভীত হয়ে আবার আমি গুষ্টির তাণ্ডবের মধ্যে বাইরে বেরোচ্ছি না।

সুতরাং আমার কাছেই যে দরজাটা ছিল সেটা খুলে একটা ছোট ঘরে ঢুকলাম। একসময় এটা পড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হত বলে মনে হল। দরজার উল্টোদিকে ফায়ার প্লেস—তখনও ঝাঁঝরিতে শেষ কাঠের ছাই পড়ে রয়েছে। শুকনো ডাল সাজিয়ে নিলাম খোঁচানি দিয়ে ছাই পরিষ্কার করে। কিন্তু কাঠগুলো এমন স্যাঁতসেঁতে ছিল যে আমার অর্ধেক দেশলাই শেষ হয়ে গেল তবু আগুন ধরল না শুধু ধোঁয়া বেরোতে লাগল। ঘরের মধ্যে ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেল চিমনি দিয়ে এক দমকা বাতাস এসে। মেঝেয় হাঁটু ও হাত রেখে কাঠগুলোর কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মরিয়া হয়ে ফুঁদিয়ে আগুন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এই বিরক্তিকর কাজের মধ্যে হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম হলঘর থেকে—মনে হল ধপ করে কে যেন মেঝেয় জামা ফেলল।

পলকের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে কিছু শোনাবার চেষ্টা করলাম কান খাড়া করে। কোন সাড়া শব্দ নেই, পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোতে লাগলাম অটোমেটিক পিস্তলটা হাতে নিয়ে। হলঘরে কোথাও কিছু নেই, কিছু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, কেবল বাইরে বৃষ্টির শব্দ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই পুরনো কোটটার ঠিক নিচে মেঝেয় ধুলো উড়ছে!

দূর। একটা ইঁদুর! নিজের কাজে ফিরে গেলাম স্বগতোক্তি করে।

পোড়া কাঠে আরো জোরে ফুঁ দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে, আরো দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করতে লাগলাম—এর মধ্যেও আবার সেই অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম খুব জোরে নয়, অথচ পরিষ্কার ও নির্ভুল।

আর একবার হলঘরে গেলাম। ঠিক একই জায়গায় একইভাবে ধুলো উড়তে দেখলাম। চোখে পড়ার মত আর কিছু নেই। কিন্তু সেই ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত আরো বেশী করে অনুভূত হল। এবার আমি বুঝতে পারলাম—এই পুরনো, খালি বাড়িতে আমি একা নই—কোন অপবিত্র, অদৃশ্য কিছুর গুপ্তভাবে চলাফেরা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারলাম।

আমার আর দরকার নেই এসব চিন্তার। আমি বোকা ভীতু হতে পারি কিন্তু এসব সহ্য করতে পারছি না। যা ঘটে ঘটুক আমার জিনিস-পত্র নিয়ে চলে যাই। এই বলে শক্ত করে তুললাম নিজেকে।

ঘরের মধ্যে ফিরে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে হ্যাভারস্যাকের ভেতরে জিনিষপত্র পুরতে পুরতে এক একবার ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকাতে লাগলাম। থলির মুখ বন্ধ করে দড়ির শেষ পাক দিয়েছি এমন সময় হলঘর থেকে খুব আস্তে চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেলাম, তারপরই মৃদু পায়ের শব্দ। ক্ষিপ্রগতিতে পিস্তলটা বার করে দরজার দিকে ফিরে ঘরের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে দেহের রক্ত। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম একটা ছায়ার মত কি যেন চলে গেল। তারপরেই দরজায় একটু ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ, আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেল—ভেতরে ঢুকলো সেই কোট।

সেটা সোজা হয়ে দাঁড়াল দরজার গোড়ায়, তারপর একটু এদিক ওদিক দুলতে লাগল, অদৃশ্য লোক যেন কলারটা তুলে রেখেছে—যেটা হলঘরে ঝুলতে দেখেছি এটা সেই কোট।

পাথরের মূর্তির মত আমি দাঁড়িয়ে অনন্ত শূন্যের মধ্যে, দৃষ্টি আমার দোরগোড়ায় বস্তুটির প্রতি নিবদ্ধ। সোজা দাঁড়িয়ে রইলাম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে, সমস্ত দেহ অবশ হয়ে গেল সম্মোহিতের মত পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল অসাড় আঙুল থেকে। তবু আমার মাথা ঠিক রইল। আমি

জানতাম চরম অমঙ্গলের সান্নিধ্যে রয়েছি—দোরগোড়ায় নরকপ্রসূত বস্তুটির যে অলৌকিক আভা বিচ্ছুরিত তা সংক্রামক—এর সামান্য স্পর্শ শুধুমাত্র যে আমার দেহের ধ্বংস তা নয়, আমার আত্মার অনন্ত নরকভোগ !

এখন সেটা ঘরের মধ্যে ঢুকছে—চলার গতি এক অবর্ণনীয়—অদ্ভুত ভাবে খালি হাত দুটো দুলছে, কোটের প্রান্ত মেঝেয় একবার করে পড়ছে, ঘষড়ানির দাগ হচ্ছে আর সেই সঙ্গে ধুলো উড়ছে, ধীরে ধীরে আমার দিকে এগোচ্ছে ! আমার বিস্ফারিত চোখ দুটো বস্তুটার উপর স্থিরভাবে নিবদ্ধ রেখে পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগলাম। আড়ষ্ট, অচেতন যন্ত্রের মত চলতে চলতে একেবারে অগ্নিকুণ্ডের দেওয়ালে পিঠ স্পর্শ করল, তার পিছনে যাবার জায়গা নেই। তখনও সেটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে মারাত্মক অশুভ উদ্দেশ্যে। উপরে উঠে আমার গলা ছোঁবার চেষ্টা করছে শূন্য হাত দুটো কাঁপতে কাঁপতে। মনে হল পরমুহূর্তে সেগুলো আমাকে ধরে ফেলল। ভীত ও আতঙ্কে বুঝতে পারলাম আমার সমস্ত বিচারবুদ্ধি লোপ পাবে। সেই মুহূর্তে একটা চিন্তা আমার মাথায় এল—অনেকদিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম কি শুনেছিলাম—পবিত্র চিহ্নের—ক্ষমতা—অশুভশক্তির—বিরুদ্ধে—। প্রচণ্ড প্রয়াসে ইচ্ছাশক্তিকে জাগরিত করে অসাড় আঙুল তুলে ক্রস চিহ্ন তৈরী করলাম ···সেই মুহূর্তে পেছনে আমার অন্য হাতটা কিছু পাবার জন্যে উত্তেজিত হয়ে হাতড়াচ্ছে, একটা ঠাণ্ডা শক্ত, গোল কিছুর সংস্পর্শে এল। ভারী ঊনুন খোঁচানোর হাতল, সেটা পুরানো।

সেই ঠাণ্ডা লোহার স্পর্শ আমার বোধশক্তিকে জাগিয়ে দিল ! বিদ্যুতের গতিতে সেই ভারী খোঁচানিটা তুলে নিয়ে আমার সামনে আতঙ্কজনক বস্তুটিকে আঘাত করলাম। দেখ ! মুহূর্তে বস্তুটি পড়ে গেল এবং কোট ছাড়া আর কিছু নয়, আমার পায়ের কাছে জড়ো হয়ে রয়েছে। আমি দিব্যি করে বলছি একলাফে সেটা পার হয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। বস্তুটি আমার পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে তাড়া করছে, আড়চোখে ফিরে দেখলাম।

সেই অভিশপ্ত বাড়ির বাইরে এসে যে দৌড় লাগালাম জীবনে সেরকম কখনও দৌড়াইনি। একটা সরাইখানার দরজার অর্দ্ধচৈতন্যহীন অবস্থায়

পড়ে যাবার আগে পর্যন্ত আমার আর কিছুই মনে নেই। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে মদ দিন, টলতে টলতে ভেতরে ঢুকে বলি। একটা ছোট জনতা বিস্ময়ে আমাকে দেখছে আমি যখন মগে মদ ঢালছি। আমার কাহিনী বলতে চেষ্টা করলাম আমি ভাঙা ভাঙা ফরাসী ভাষায়। তারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে বিহ্বল দৃষ্টিতে; অবশেষে সহানুভূতির ভাব ফুটে উঠল সরাইখানার মালিকের মুখে।

এও কি সম্ভব, মশাই ওই বাড়িতে ছিলেন। জুলিয়েট তাড়াতাড়ি আর এক বোতল মদ দাও মশাইকে!

আমি একটা গল্প শুনি, পরে ঐ মালিকের কাছ থেকে, যদিও বলার জন্য সে আগ্রহী ছিল। ঐ পরিত্যক্ত বাড়িতে থাকত নেপোলিয়নের সৈন্যদলের একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। আফ্রিকান বংশজ ঐ লোকটি আধা-পাগল ছিল। গল্প শুনে মনে হয় লোকটি অতি বদ ছিল। নিশ্চয়ই মশাই খুব খারাপ লোক—ঐ লোকটি। সে তার স্ত্রীকে মেরে ফেলে, সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর উপর, এমন কি, লোকে বলে, তার নিজের মেয়েদের উপর নিদারুণ অত্যাচার করত। খুব বদ নাম আছে পুরনো জমিদার বাড়িটার। এদেশের কোন লোকই ঐ বাড়িটার কাছে যাবে না। আপনি যদি এক মিলিয়ন ফ্রাঁও দেন।

গোড়ায় যা বলেছি, আমি জানি অফিসের লোকেরা আমায় একটা মানুষ মনে করে, তাই তাদের কাছে আমি এ গল্প করিনি। তবু এটা ডাহা সত্যি। আমার নতুন সাইকেল ও জিনিসপত্র হয়ত এখনও পড়ে আছে ঐ ভূত-প্রেত অধ্যুষিত জমিদার বাড়ির হলঘরে! রেখে দিতে পারে কেউ যদি ওগুলো সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক হয় তবে অনায়াসে ঐ বস্তুগুলো রেখে দিতে পারে।

———

স্যার ওয়াল্টার স্কট

কলমের মুখে ঠিক সেইভাবেই নিম্নলিখিত বিবরণটি পেশ করা হচ্ছে। লেখক নিজের কানে যেরকমটি শুনেছে, যতটা কুলিয়েছে তার স্মৃতিশক্তিতে। তাছাড়া সযত্নে পরিহার করা হয়েছে এই কাহিনীর সরলতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে এরকম কোন অলংকরণকেও। আমি যেরকম শুনেছি একটি অলৌকিক ত্রাসের গল্পকে, এখানে তারই একটা বিবরণ দিচ্ছি মাত্র।

তখন শেষ হবার মুখে আমেরিকার যুদ্ধ ; আত্মসমর্পণ করছে লর্ড কর্নওয়ালিসের বাহিনী ইয়র্ক টাউনে ; সকলেই দেশে ফিরে এসে ক্লান্তি অপনোদন করছে, সেই বাহিনীর অফিসারসহ আর যারা বন্দী হয়েছিল, আর বলে বেড়াচ্ছে নিজেদের বীরত্বের কাহিনী। সম্ভবত কোন কাহিনীতে একজন নামহীন নায়ককে উপস্থিত করার অসুবিধাকে এড়াবার জন্যই মিস এস, তাদের একজন জেনারেল অফিসারের নাম দিয়েছিলেন ব্রাউন। তিনি একাধারে ছিলেন একজন যোগ্য অফিসার এবং উঁচুদরের ভদ্রলোক।

পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণের সময় কোন বিশেষ কাজে একটি মফঃস্বল

শহরে জেনারেল ব্রাউন একদিন হাজির হলেন। অসাধারণ সুন্দর শহরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য ; যে কোন বিলেতি শহরের বৈশিষ্ট্য সেখানে অবশ্য লক্ষণীয়।

শহরটি ছোট। দীর্ঘ অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে সুউচ্চ প্রাচীন গির্জা। চারদিকে ছোট ছোট গোচরণ ও শস্যভূমি। শহরের সীমান্ত-রক্ষীর মত বিরাজমান বিরাট সব বনস্পতি। চোখে পড়ে কিছু আধুনিকতার ছাপও। শহরটির পরিবেশ একদিকে যেমন ধ্বংসের নির্জনতা নেই, অপরদিকে তেমনি নেই নতুনত্বের হট্টগোল ; বাড়িগুলো পুরনো, কিন্তু মেরামতির দ্বারা সুরক্ষিত। শহরের বাঁ-দিক দিয়ে সুন্দর ছোট নদীটি কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে ; তার বুকের উপর নেই কোন বাঁধের বন্ধন বা তার পাশ দিয়ে নেই কোন চলাচলের পথ।

প্রায় এক মাইল দক্ষিণে শহরের একটা উঁচু জায়গায় প্রাচীন ওক গাছের সারি ও ঝোপজঙ্গলের ফাঁক দিয়ে যে দুর্গের গম্বুজগুলো চোখে পড়ে সেটা ইয়র্ক ও ল্যাংকাস্টার যুদ্ধের সমকালীন হলেও তাতে এলিজাবেথ ও তার পরবর্তীকালের পরিবর্তন ও সংযোজনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। প্রাচীন সামন্ত যুগের দুর্গটি চারদিকে পরিখা দিয়ে ঘেরা সেকালের রীতি অনুসারে। দুর্গটির কিছু অংশ ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখেই আমাদের সামরিক পর্যটকটির মন আনন্দে নেচে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করলেন, বাড়িটাকে ভাল করে দেখতে হবে আরও কাছ থেকে ; খোঁজ নিতে হবে সেখানে পারিবারিক চিত্রশালা এবং আকর্ষনীয় পুরা-বস্তুর সংগ্রহশালা আছে কিনা। তারপর একটা ভাল সরাইখানার দরজায় গিয়ে থামলেন হাঁটতে হাঁটতে।

যাত্রাপথের জন্য নতুন ঘোড়ার ব্যবস্থা করার আগে জেনারেল ব্রাউন ঐ দুর্গাঞ্চলের মালিকের খোঁজখবর করে জানতে পারলেন এবং জেনে বিস্মিত ও পুলকিত হলেন যে মালিকের নাম—লর্ড উড্‌ভিল বলেই উল্লেখ করব আমরা তাকে। কী সৌভাগ্য! ব্রাউনের স্কুল ও কলেজ জীবনের অনেক স্মৃতিই যুবক উড্‌ভিলের নামের সঙ্গে জড়িত ; আর কিছুটা জিজ্ঞাসাবাদ করেই তিনি নিশ্চিত হলেন সেই উড্‌ভিল আর এই দুর্গাধিপতি উড্‌ভিল একই লোক। তিনিই এখন লর্ড উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। কয়েকমাস আগে পিতার মৃত্যুতে এবং শোক-দিবসের অবসান এই হেমন্তকালেই

পৈত্রিক সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, আর সেই উপলক্ষ্যে দুর্গে কিছু নির্বাচিত বন্ধু-বান্ধবের সমাগম ঘটেছে।

খবরটি খুবই সুখকর আমাদের পর্যটকের কাছে। ইটন-এ ফ্রাংকউড-ভিল ছিল রিচার্ড ব্রাউনের "ফ্যান", অরে ক্রাইস্ট চার্চ-এ ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু; তাদের ছিল একই আনন্দ একই কর্তব্য। প্রথম জীবনের বন্ধুটিকে এমন একটা বাসভবন ও সম্পত্তির মালিকরূপে দেখতে পেয়ে সৎ সৈনিকটার মন আনন্দে ভরে উঠল। তিনি স্থির করলেন, তিনি অচিরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবেন অন্য সব কাজ মুলতুবি রেখেই।

সুতরাং নতুন করে সংগৃহীত ঘোড়াগুলিই তার ভ্রাম্যমান গাড়িটিকে টেনে নিয়ে গেল উড্‌ভিল দুর্গে। দারোয়ান তাকে নিয়ে গেল একটি আধুনিক পথিক আসবে; তৈরী করা হয়েছে দুর্গের স্থাপত্যের সঙ্গে মিল রেখেই সেটাকে! অতিথির আগমন-বার্তা জানিয়ে দিল দারোয়ান ঘণ্টা বাজিয়ে। জেনারেল ব্রাউন গাড়ি থেকে নামতেই যুবক লর্ড হলের ফটকে এসে দাঁড়ালেন। বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন মুহূর্তকাল অপরিতের মতই। অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে যুদ্ধের ক্লান্তি ও ক্ষত-চিহ্ন সে মুখের! কিন্তু অতিথির কথা শুনেই সে পরিবর্তনের আবরণ উড়ে গেল; দুই বন্ধুর সাদর সম্ভাষণ বিনিময়ের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠল শৈশব ও প্রথম যৌবনের অনেক আনন্দঘন দিনের স্মৃতি।

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "প্রায় ব্রাউন, আজকের দিনে যদি আমরা কিছু চাইবার থাকে তো সেটা হবে আমাদের মাঝে তোমার উপস্থিতি। যতদিন তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরে ছিলে ততদিন আমি তোমার খোঁজ রাখিনি একথা মনেও এনো না। তোমার বিপদ, তোমার বিজয়, তোমার দুর্ভাগ্য—সবকিছুর ভিতর দিয়েই তোমার খবর আমি রেখেছি, আর এই দেখে খুশি হয়েছি যে কি জয়ে কি পরাজয়ে আমার পুরনো বন্ধুর নামটি সব সময়েই প্রশংসার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।"

জেনারেলও যথোচিত উত্তর দিলেন; বন্ধুর নতুন মর্যাদা ও সম্পত্তি লাভের জন্য তাকে অভিনন্দন জানালেন।

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "আরে এ বাড়ির কিছুই দেখ নি। এখনও তো তুমি; আশা করি বাড়িটার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত না হয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাবে না। অবশ্য এ কথা সত্য যে এখন বাড়িতে বেশ

একটা বড়সড় দলই জমায়েত হয়েছে, আর এই পুরনো বাড়িটাকে বাইরে থেকে দেখতে বেশ বড় মনে হলেও আসলে খুব বেশী লোকের থাকবার মত ব্যবস্থা নেই। তবু তোমাকে একটা আরামদায়ক সেকেলে ঘর আমি দিতে পারব ; আশা করি, নানা যুদ্ধাভিযানে যোগদানের ফলে অপেক্ষাকৃত খারাপ বাড়িতে থাকার শিক্ষা তুমি পেয়েছ।"

জেনারেল হেসে উঠল দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে। বলল, "আমার তো ধারণা, একবার একটা হাল্কা বাহিনী নিয়ে যখন শত্রুর অপেক্ষায় আত্মগোপন করেছিলাম তখন যে পুরনো তামাকের বাক্সের মধ্যে আমাকে রাত কাটাতে হয়েছিল, তোমার এই দুর্গ-নিবাসের খারাপ ঘরটাও তার তুলনায় অনেক—অনেক ভাল।"

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "আরে, তাহলে তো কোন কথাই নেই। বাস-স্থানের ভয় যখন তোমার নেই তখন তোমাকে আমার কাছে থাকতেই হবে অন্তত এক সপ্তাহ। বন্দুক, শিকারী কুকুর, ছিপ, টোপ, এবং নানা ধরনের খেলাধুলার সরঞ্জাম আমাদের প্রচুর আছে ; বরং কিছু বাড়তিই আছে। তবে তুমি যদি বন্দুকটাই পছন্দ কর তো আমিও তোমার সঙ্গে আছি। নিজের চোখে দেখতে চাই, কালো আদমিদের দেশে কিছুকাল কাটিয়ে আসার ফলে তোমার শিকারের হাত আরও ভাল হয়েছে কি না।

সানন্দে জেনারেল এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে মহানন্দে সারাটা দিন কেটে গেল। কোনকিছুই অভাব ছিল না—খেলাধুলা, গান-বাজনা, পান-ভোজন। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে বলে এগারোটার পরেই অতিথিরা যার যার ঘরে শুতে চলে গেল।

যুবক লর্ড নিজেই বন্ধু জেনারেল ব্রাউনকে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গেলেন। লর্ড ঠিকই বলেছিলেন, ঘরটি আরামদায়ক কিন্তু সেকেলে ধরনের। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ব্যবহৃত একটা অত্যন্ত ভারী পালংক, সিল্কের বিবর্ণ, মশারি, তাতে জরির ভারী কুঁচি বসানো। কিন্তু বিছানার চাদর, বালিশ, কম্বল সবই মনোরম। কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার আমেজ দরজা-জানালায় ঝোলানো পুরনো বিবর্ণ পর্দাগুলিতে। পর্দাগুলি দুলছে জানালা দিয়ে আসা হেমন্তের বাতাসে।

লর্ড বললেন, দেখ জেনারেল, শয়ন-কক্ষটি খুব সেকেলে ; তবে আশা

করি তোমার সেই তামাকের বাক্সের চাইতে এটা খারাপ লাগবে না।"

জেনারেল উত্তরে বললেন, আমার কোনরকম মাথা ব্যথা নেই থাকার জায়গা নিয়ে ; তবু যদি পছন্দ-অপছন্দের কথাই তোল তো বলি, তোমাদের ঐ পারিবারিক অট্টালিকার আধুনিক সব ঘরের তুলনায় এই ঘরটাই আমার বেশী পছন্দ। বিশ্বাস কর, আধুনিক আরামদায়ক ব্যবস্থাকে যুক্ত করি, যখনই এই ঘরের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে, যখনই মনে করি যে এ সবই 'ইয়োর লর্ড-শিপ' এর সম্পত্তি, তখনই মনে হয় লণ্ডনের যে কোন সেরা হোটেলের চাইতেও এখানে আমি ভাল আছি।"

"প্রিয় জেনারেল, আমিও বিশ্বাস করি—আমি নিঃসন্দেহ যে তুমি এখানে আমার মত আশানুরূপ আরামেই থাকবে", এই কথাগুলি বলে সম্ভ্রান্ত যুবকটি আর একবার অতিথিকে শুভরাত্রি জানিয়ে করমর্দন করে বিদায় নিলেন।

চারদিক তাকালেন জেনারেল আর একবার ; পোশাক ছেড়ে তারপর আরামদায়ক রাত্রি যাপনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

এখানে, এ ধরনের কাহিনীর প্রথা ভঙ্গ করে, জেনারেলকে পরদিন সকাল পর্যন্ত তার ঘরে রেখে আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

বেশ সকালেই সকলে প্রাতঃরাশে এসে হাজির হল, কিন্তু সেখানে জেনারেল ব্রাউনের দর্শন পাওয়া গেল না। এতে বারকয়েক বিস্ময় প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত লর্ড উড ভিল একজন চাকরকে তার খোঁজে পাঠালেন। ফিরে এসে লোকটি জানাল, কুয়াসা ঢাকা অস্বস্তিকর আবহাওয়াকে অগ্রাহ্য করে জেনারেল ব্রাউন খুব ভোরেই বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

সম্ভ্রান্ত যুবকটি বন্ধুদের বললেন, "সৈনিকের অভ্যাস আর কি ; অনেকেরই এই অভ্যাসটি গড়ে ওঠে ; কর্তব্যের ডাকে সকালে প্রস্তুত হতে হতে তারা আর ভোরের পরে ঘুমুতেই পারে না।"

তথাপি এই ব্যাখ্যা লর্ড উড্‌ভিলের নিজেরই মনঃপুত হল না, অন্যমনস্কভাবে নিঃশব্দে তিনি জেনারেলের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। জেনারেল ফিরে এলেন প্রাতঃরাশের ঘণ্টা বাজবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে। তাকে বেশ ক্লান্ত ও অসুস্থ মনে হল। মাথার চুল এলোমেলো, পোশাক-পরিচ্ছদ এতই অবিন্যস্ত যে একজন সামরিক লোকের বেলায় সেটা সহজেই চোখে পড়ে ; কেমন যেন বিকৃত ও অদ্ভুত

তার চোখের দৃষ্টিও।

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "প্রিয় জেনারেল, আজ সকালে দেখছি তুমি আমাদের সকলের উপর টেক্কা দিয়েছ ; আশানুরূপ ও মনোমত হয় নি না কি তোমার শোবার ব্যবস্থাটা। কেমন কাটল রাতটা ?

"ওঃ খুব ভাল—অত্যন্ত চমৎকার—সারা জীবনে কখনও এত ভালভাবে আমার রাত কাটে নি", জেনারেল ব্রাউন তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন ; অথচ তার কথা বলার মধ্যে একটা বিব্রত ভাব ছিল যেটা তার বন্ধুর চোখে ধরা পড়ল। তারপরই এক পেয়ালা চা গলায় ঢেলে অন্য কোন খাবার স্পর্শ না করেই কেমন যেন অন্য মনস্ক হয়ে গেলেন।

গৃহস্বামী বন্ধুটি বললেন "জেনারেল, আজ বন্দুক নিয়ে বের হচ্ছো তো ? পরপর দু'বার একই প্রশ্ন করার পরে হঠাৎ জবাব এল, না আমি দুঃখিত যে আর একটি দিনও 'ইয়োর লর্ডশিপের' সঙ্গে কাটাবার সৌভাগ্য আমার হবে না ; আমার ডাক-ঘোড়া আনতে বলে দিয়েছি, এখনি তারা এসে পড়বে।

উপস্থিত সকলেই বিস্মিত ; লর্ড উড্‌ভিল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ডাক ঘোড়ার কথা কি বলছ হে বন্ধু ! কি করবে তা দিয়ে ? অত্যন্ত একটি সপ্তাহ আমার সঙ্গে কাটাবে তুমি তো আমাকে কথা দিয়েছ ?

স্বভাবতই বেশ বিব্রতভাবে জেনারেল বললেন, "তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের আনন্দে হয়তো এখানে কয়েকদিন থাকবার কথা বলেছিলাম ; কিন্তু এখন দেখছি সেটা একেবারেই অসম্ভব।

সম্ভ্রান্ত যুবকটি বললেন, খুবই আশ্চর্যের কথা। কালই মনে হয়েছিল তোমার হাতে কোন জরুরি কাজ নেই, আর আজই তো যাবার ডাক আসতে পারে না, কারড শহর থেকে আমাদের ডাকই তো এখনও আসে নি, তাই এর মধ্যে কোন চিঠি তুমি পেতে পার না।"

আর কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে জেনারেল ব্রাউন শুধু এইটুকুই জানালেন যে তার একটা অনিবার্য কাজ আছে, কাজেই তাকে অতি অবশ্য চলে যেতে হবে। অগত্যা গৃহস্বামী চুপ করে গেলেন। বুঝলেন যে বন্ধুটি চলে যেতে দৃঢ়সংকল্প, কাজেই কোনরকম অনুরোধ করাই বৃথা।

তবু তিনি বললেন, "প্রিয় ব্রাউন, তুমি যখন একান্তই চলে যাবে, আমাকে অনুমতি দাও—এ বাড়ির ছাদ থেকে চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যটা তোমাকে একবার দেখাই, যেভাবে কুয়াসা উঠছে তাতে অচিরেই দৃশ্যটা ঢেকে যাবে।"

কথা বলতে বলতেই বড় জানালাটা খুলে তিনি ছাদে পা বাড়ালেন। জেনারেল যন্ত্রের মত তাকে অনুসরণ করলেন লর্ডটি চারদিকে আঙুল বাড়িয়ে অনেক কিছু দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাতে লাগলেন, কিন্তু দেখবার মত কিছুই জেনারেলের চোখে পড়ল না। এইভাবে এগোতে এগোতে লর্ড উড্‌ভিল অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে অন্য সকলের কাছ থেকে বেশ কিছু দূরে সরে গিয়ে হঠাৎ বন্ধুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

"রিচার্ড ব্রাউন, তুমি আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু; এখন এখানে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। তাই বন্ধুর কাছে, একজন সৈনিকের কাছে আমার একান্ত মিনতি, আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও। কাল রাতটা সত্যি তোমার কিভাবে কেটেছে?"

গম্ভীর মুখে জেনারেল জবাব দিলেন, "অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে; সে অভিজ্ঞতা এতই মারাত্মক যে এই প্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত সব জমির বিনিময়ে তো নয়ই, এমন কি এখানে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় সেই বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বিনিময়েও আমি দ্বিতীয় রাত সে ঘরে কাটাতে রাজী হব না।"

যেন নিজেকে সম্বোধন করেই লর্ড বললেন, "খুবই আশ্চর্যের কথা; তাহলে তো দেখছি ঐ ঘরটি সম্পর্কে যা শুনেছি তার মধ্যে কিছু সত্য আছে।" পুনরায় জেনারেলের দিকে ঘুরে তিনি বললেন, "প্রিয় বন্ধু, ঈশ্বরের দোহাই, মন খুলে আমাকে সব কথা সবিস্তারে বল।"

তার মিনতিভরা কথা শুনে জেনারেল দুঃখ পেলেন; একমুহূর্ত থেমে বলতে লাগলেন, "প্রিয় লর্ড, গত রাত্রে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা এতই অদ্ভুত ও অপ্রীতিকর যে সেকথা তোমাকে বলতে আমি কুণ্ঠিত বোধ করছি। অন্য কেউ এ কথা শুনলে ভাববে যে আমি একটা দুর্বলচিত্ত, কুসংস্কারে বদ্ধ বোকা লোক; নিজের কল্পনাই আমাকে বিভ্রান্তি করছে। কিন্তু তুমি তো আমাকে ছেলেবেলায় ও যৌবনেও দেখেছ। তাই প্রথম যে চারিত্রিক দুর্বলতা ও বিচ্যুতি থেকে আমি মুক্ত

ছিলাম প্রাপ্ত বয়সে আমি তারই শিকার হব এ সন্দেহটা তুমি অন্তত করবে না।

জেনারেল থামলেন। তার বন্ধু উত্তরে বললেন ঃ

"তোমার বক্তব্য যত অদ্ভুতই হোক তার সত্যতাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করব সে বিষয়ে কোনরকম সন্দেহ তোমার মনে রেখো না! তোমার মনের দৃঢ়তার সঙ্গে আমি এত বেশী পরিচিত যে তুমি কখন অবাস্তব কল্পনার শিকার হতে পার সে সন্দেহ কখনও আমার মনে জাগবে না। আমি এও জানি, তোমার সম্মানবোধ ও বন্ধুত্বের খাতিরেই তুমি যা কিছু দেখেছ তার কোন অতিরঞ্জিত বিবরণ আমাকে শোনাবে না।"

জেনারেল বললেন, "ঠিক আছে ; তোমার বিশ্বাসের উপর ভরাসা রেখেই সব কথা বলছি। তবু এও বলে রাখি, গত রাত্রের দিকে নতুন করে মনে করার চাইতে আমি বরং একটা গোলা-বারুদের আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াটাকেও শ্রেয়তর বলে মনে করি।"

তিনি দ্বিতীয়বার থামলেন ; লর্ড উড্‌ভিলের চোখে নীরব আগ্রহ লক্ষ্য করে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুটিদার পর্দায় ঢাকা ঘরটিতে তার নৈশ অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলতে শুরু করলেন।

"কাল রাতে তুমি চলে যাবার পরেই আমি পোশাক ছেড়ে শুতে গেলাম। বিছানার সামনেই চিমনির আগুন ঝল্‌মল্‌ করে জ্বলছে। তোমার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের ফলে শৈশবে ও যৌবনে অনেক মনমাতানো স্মৃতি ভিড় করল! তাই সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম এল না।

"সুখের স্মৃতিতে মন আচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে ঘুম নেমে এল চোখে। হঠাৎ রেশমী গাউনের খস্‌খস্‌ শব্দে ও উঁচু-গোড়ালি জুতোর ঠুকঠুক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল কোন নারী ঘরের মধ্যে হাঁটছে। মশারি সরিয়ে ব্যাপারটা দেখবার আগেই একটি ছোটখাট নারীমূর্তি বিছানা ও অগ্নিকুণ্ডের মাঝখান দিয়ে চলে গেল। মূর্তিটি আমার দিকে পিছন ফিরে ছিল ঃ তার ঘাড় ও গলা দেখেই বুঝতে পারলাম, একটি বৃদ্ধা নারী সেকেলে গাউন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; ঢিলে গাউনটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

"একটি বৃদ্ধার এই উপস্থিতি যথেষ্ট অদ্ভুত মনে হলেও মুহূর্তের

জন্যও এ কথা আমার মনে আসে নি এই নারীমূর্তি এ বাড়ির জনৈকা কাজের লোক ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে। ঠাকুমার আমলের পোশাক পরা হয় তো তার একটা শখ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, তুমি ঘরের টানাটানির কথা বলেছিলে। তাই ভাবলাম, আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিতেই তুমি হয় তো এই বৃদ্ধার ঘরটিই আমাকে দিয়েছ, আর সেও সব কথা ভুলে গিয়ে রাত বারোটার সময় তার পুরনো ঘরেই ফিরে এসেছে। তাই তাকে আমার উপস্থিতির কথাটা জানাবার জন্য বিছানায় নড়েচড়ে একটু কাশলাম। ধীরে ধীরে সে ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু—হা ঈশ্বর!—সে কি মুখ আমি দেখলাম! সে যে কে অথবা সে যে বা কোন জীবিত প্রাণী নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহই আর রইল না। মৃত মানুষের একখানি মুখের উপর কে যেন এঁকে দিয়েছে তাঁর জীবিতকালের নীচতম ও জঘন্যতম সব পাপের ছাপ! এক ভয়ংকর অপরাধিনীর দেহ যেন কবর থেকে উঠে এসেছে, আর তাতে বাসা বেঁধেছে নরকের অগ্নিকুণ্ড থেকে ছাড়া পাওয়া একটি আত্মা যে ছিল তার অপকর্মের সঙ্গী। চমকে উঠে খাড়া হয়ে বসলাম; দুই হাতের উপর ভর দিয়ে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সেই ভয়ংকর ছায়ামূর্তির দিকে। বীভৎস নারীমূর্তিটি দ্রুত-পদক্ষেপে আমার বিছানার কাছে এগিয়ে এল, আমার পাশেই বসে পড়ল, তার ভয়ংকর মুখটা এগিয়ে এল আমার মুখের এক হাতের মধ্যে, তার মুখের কুটিল হাসিতে ফুটে উঠল মূর্তিমতী এক শয়তানীর ঈর্ষা ও ক্রূরতা।"

জেনারেল ব্রাউন এখানে থামলেন। গতরাতের ভয়ংকর দৃশ্যকে মনে করতে গিয়ে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে; হাত দিয়ে মুছে ফেললেন!

'মাই লর্ড, আমি ভীরু নই। আমার পেশাগত সবরকম প্রাণঘাতী বিপদের মুখোমুখি আমি হয়েছি। কোন মানুষ কখনও বলতে পারবে না যে রিচার্ড ব্রাউন তার তরবারির অমর্যাদা করেছে। কিন্তু সেই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে একটি মূর্তিমতী শয়তানীর একেবারে চোখের নীচে এমন কি তার "একেবারে মুঠোর মধ্যে বসে আমার মনের সব দৃঢ়তা হারিয়ে ফেললাম, আগুনের ভিতর মোমের মত আমার সব পৌরুষ গলে গেল, আমার প্রতিটি চুল খাড়া হয়ে উঠল। জীবনদায়ী

রক্তের স্রোত থেমে গেল, ভয়ে ও ত্রাসে দশ বছরের একটি গ্রাম্য বালিকার মত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম। সেভাবে কতক্ষণ পড়েছিলাম তা জানি না।

"দুর্গের ঘড়িতে একটা বাজার শব্দে মূর্চ্ছা ভাঙল শব্দটা এত জোরে হয়েছিল যে মনে হল বুঝি ঘরের মধ্যেই বাজল। পাছে সে ভয়ংকর দৃশ্য আবার দেখতে হয় সেই ভয়ে চোখ খুলতে বেশ কিছু সময় লাগল। যাই হোক, সাহস সঞ্চয় করে যখন চোখ মেলে তাকালাম তখন আর তাকে দেখতে পেলাম না প্রথমেই মনে হল ঘণ্টাটা টানি, চাকরদের জাগিয়ে তুলি, তারপর কোনা চিলেকোঠায় বা খড়ের গাদায় চলে যাই যাতে দ্বিতীয়বার তার সঙ্গে দেখা না হয়। না, আনি সত্যকেই স্বীকার করব, আমার সে সিদ্ধান্ত বদলে ফেললাম; নিজের লজ্জাকে ঢাকবার জন্য নয়, বরং এই ভয়ে সে চিমনির পাশে যে ঝোলানো ঘণ্টার দড়িতে হাত দিতে সেখানে যেতে গিয়ে হয় তো আবার সেই কুৎসিত শয়তানীর সামনে পড়ে যাব; আমার মনে হল সে হয় তো তখনও ঘরের কোণে কোথাও লুকিয়ে আছে।

"একটা জ্বর-বিকারের মধ্যে বাকি রাতটা কেটে গেল। শরীর কখনও গরম, কখনও ঠাণ্ডা; মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়, জেগে বসে থাকি; হাজার রকমের সব ভয়ংকর দৃশ্য চোখের সামনে আসা যাওয়া করতে লাগল।

"অবশেষে দিনের আলো দেখা দিল। অসুস্থ দেহে ও লজ্জাহত মনে বিছানা থেকে উঠলাম। মানুষ হিসাবে, একজন সৈনিক হিসাবে নিজের জন্য বড়ই লজ্জা হল; তার চাইতে বেশী লজ্জা পেলাম এই ভূতে-পাওয়া ঘর থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত বাসনার জন্য। কোন রকমে পোশাক পরে তোমার এই প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেলাম। অন্য জগতের সেই আগন্তুকের সঙ্গে এক ভয়াবহ সাক্ষাৎকারের ফলে আমার স্নায়ুতন্তুগুলো তখন একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে; খোলা হাওয়ায় সেগুলিকে কিছুটা চাঙ্গা করার জন্য ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম। আমার অসুবিধার কথা, তোমার আতিথেয়তাপূর্ণ প্রাসাদ থেকে হঠাৎ চলে যাবার কারণের কথা সবই তোমাকে বললাম ইয়োর লর্ডশিপ। আশা করি অন্য কোন স্থানে আবার আমাদের দেখা হবে; কিন্তু এ ছাদের নীচে আর একটা

রাতও কাটানোর হাত থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন!"

জেনারেলের কাহিনীটি খুবই অদ্ভুত; কিন্তু যেরকম দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি সেটা বললেন তাতে এ সম্পর্কে কোনকিছু বলার আর অবকাশ রইল না। লর্ড উড্‌ভিল একবারও জানতে চাইলেন না যে সে স্বপ্নে কোন প্রেত-মূর্তি দেখেছে কি না, অথবা এ সবই তার অতি-কল্পনা বা দর্শনেন্দ্রিয়ের ফাঁসির ফল কি না। বরং মনে হল তিনি যা কিছু শুনলেন তার সভ্যতা ও বাস্তবতাকে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসই করছেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আন্তরিকভাবেই জানালেন যে তারই বাড়িতে এসে তার প্রথম জীবনের বন্ধুটির এই দুর্গতির জন্য তিনি খুবই দুঃখিত।

"প্রিয় ব্রাউন, তোমার এই কষ্টের জন্য আমি আরও বেশী দুঃখিত এই জন্য যে এটা আমারই একটা পরীক্ষায় দুঃখজনক অথচ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ফল। তোমার জানা দরকার যে অন্তত পক্ষে আমার বাবা ও ঠাকুর্দার আমল থেকেই ঐ ঘরটা সবসময়ই বন্ধ করে রাখা হত, কারণ জনশ্রুতি ছিল যে ঐ ঘরটাতে নাকি অলৌকিক সব দৃশ্য দেখা যায়, নানারকম ভৌতিক শব্দ শোনা যায়। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে যখন এই সম্পত্তির দখল পেয়ে এখানে এলাম, তখনই কেন জানি না আমার মনে হল যে আমার যেসব বন্ধুবান্ধব এই উপলক্ষ্যে এখানে আসবে তাদের যথোপযুক্ত স্থান-ব্যবস্থা করার মত এত বেশী ঘর এ বাড়িটাতে নেই যাতে এরকম একটা আরামদায়ক শয়নকক্ষকে অদৃশ্য লোকের অধিবাসীদের জন্য ছেড়ে দেওয়া চলে। সুতরাং ঐ বুটিদার পর্দা ঢাকা ঘরটাকে, ঐ নামেই ঘরটাকে উল্লেখ করা হত, লোকজন দিয়ে খুলে ফেললাম, এবং তার প্রাচীনত্বকে কোন-রকম ক্ষুণ্ণ না করে আধুনিক জীবনযাত্রার উপযুক্ত কিছু নতুন আসবাব ও জিনিসপত্র দিয়ে ঘরটাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলাম। তবু যেহেতু ঘরটা যে ভূতুড়ে সে কথাটা বাড়ির লোকজনরা ভাল করেই জানত, আশপাশের লোকজন এবং আমার কিছু কিছু বন্ধুরও সেটা অজানা ছিল না, তাই আমার আশংকা ছিল যে ঐ বুটিদার পর্দা-ঢাকা ঘরে যে লোক প্রথম রাত

কাটাবে পূর্বজ্ঞাত ভূতুড়ে সংস্কারবশত সে হয়তো সেই জনশ্রুতিটাকেই নতুন করে জাগিয়ে তুলবে, আর ঐ ঘরটাকে কাজে লাগাবার যে ব্যবস্থা আমি নিয়েছি তাকেও পণ্ড করে দেবে। প্রিয় ব্রাউন, আমি অসংকোচেই স্বীকার করছি, গতকাল তোমাকে দেখেই আমি খুশি হবার অন্য অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা যে ঐ ঘরের দুর্নাম ঘোচাবার একটা চমৎকার সুযোগ আমার হাতে এসে গেল, কারণ তোমার সাহসিকতা সন্দেহের অতীত, আর এসব ব্যাপারে তোমার মন সবরকম সংস্কারমুক্ত। সুতরাং অধিকতর উপযুক্ত কোন লোকের কথা আমি ভাবতেই পারি নি আমার পরীক্ষাটা চালাবার পক্ষে।"

জেনারেল ব্রাউন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "ইয়োর লর্ডশিপের অপার করুণা—আমার ঋণের শেষ নেই আপনার কাছে। একটা পরীক্ষা তুমি যাকে বলছ, আমি কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারব না তার ফলটা।"

লর্ড উড্‌ফিল বললেন,"আহা, বন্ধু তুমি আমার প্রতি অবিচার করছ। বিশ্বাস কর, আমি মোটেই পরিমাপ করতে পারি নি যে কষ্ট তুমি ভোগ করেছ তার সম্ভাবনাটা। আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী কাল সকাল পর্যন্তও অলৌকিক আবির্ভাবের ব্যাপারে। উপরন্তু, আমার তো স্থির বিশ্বাস যে ঐ ঘর সম্পর্কে সব কথা তোমাকে জানালে তুমি নিজে থেকেই ঐ ঘরটিকে তোমার বাসস্থান হিসাবে নিতে। সেটা আমার দুর্ভাগ্য, তুমি যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে কষ্ট পেয়েছ, হয় তো আমার ভুল, কিন্তু অপরাধ বলতে পার না সেটাকে।"

"সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার!" আবার খুশি হয়ে উঠল জেনারেলের মেজাজ। "নিজেকে আমি দৃঢ়চরিত্র ও সাহসী বলেই জানতাম, আর তুমিও আমাকে সেইরকম ভেবেছ বলে তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবার কোন অধিকার আমার নেই। তোমাকে আর আমি আটকে রাখব না।" ঐ যে আমার ডাক-ঘোড়াগুলো এসে পড়েছে।

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "না বন্ধু, তুমি যখন আর একটা দিনও আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না, আর সেজন্য কোনরকম পীড়াপীড়িও

আমি করতে পারছি না, তাই বলছি আরও অন্তত আধঘণ্টা সময় আমাকে দাও। তুমি তো ছবি ভালবাসতে একসময়। এখানে আমার একটা প্রতিকৃতির চিত্রশালা আছে; অনেকগুলো ভ্যানডাইকের আঁকা; একদা এই সম্পত্তি ও দুর্গপ্রাসাদ যাদের অধিকারে ছিল তাদেরই বংশধরদের সব প্রতিকৃতি। আমার ধারণা, তার অনেকগুলি তোমার ভাল লাগবে।"

জেনারেল ব্রাউন আমন্ত্রণটা গ্রহণ করলেন কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই। আমন্ত্রণ তো প্রত্যাখ্যান করা যায় না বন্ধুর।

সুতরাং লর্ড উড্‌ভিলের সঙ্গে কয়েকটা ঘর পার হয়ে জেনারেল একটা লম্বা চিত্রশালায় ঢুকলেন। ঝোলানো রয়েছে অনেক ছবি। লর্ড পরপর সেগুলি তার অতিথিকে দেখালেন, বললেন, তাদের নাম কিছু কিছু ব্যক্তিগত বিবরণও দিলেন। জেনারেল ব্রাউনের বিশেষ আগ্রহ ছিল না সে সব বিবরণের প্রতি সচরাচর যে কোন পারিবারিক চিত্রশালায় যে রকম সব ছবি থাকে ঠিক তাই। এই হয় তো কোন নাইট যিনি জমিদারিকে প্রায় নষ্ট করেই ফেলেছিলেন; আর এই জনৈকা সুন্দরী মহিলা যিনি ধনবান কোন "বাউণ্ডহেড'-কে বিয়ে করে সম্পত্তিকে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন। ওখানে ঝোলানো রয়েছে জনৈক বীরের ছবি যিনি সেণ্ট জার্মেন-এ নির্ধারিত রাজ-দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ফলে বিপন্ন হয়েছিলেন; আবার এখানে এমন একজনের ছবি যিনি বিপ্লবের সময় উইলিয়ামের সপক্ষে অস্ত্র ধরেছিলেন; ওই তো একজন যিনি কখনও হুইগদের আবার কখনও টোরিদের দলের পাল্লা ভারী করেছিলেন।

লর্ড উড্‌ভিল এইসব বুলি আওড়াতে আওড়াতে তিনি দেখতে পেলেন, চিত্রশালার মাঝামাঝি পেঁছিতেই হঠাৎ চমকে উঠলেন জেনারেল ব্রাউন, তীব্র বিস্ময় ও আতংক ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে; একদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে প্রচলিত শৌখিন পোষাক পরিহিতা একটি বৃদ্ধ মহিলার প্রতিকৃতির দিকে।

"ঐ তো সে!" চীৎকার করে উঠলেন জেনারেল—"ঠিক সেই আকৃতি, সেই চোখ-মুখ-নাক, তার মুখের মত পৈশাচিক ভাব এ মুখে নেই শুধু

কাল রাতে যে অভিশপ্ত কুৎসিত দর্শনা আমার ঘরে হাজির হয়েছিল।”

সম্ভ্রান্ত যুবকটি বললেন, কোনরকম সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না “তাই যদি হয় তাহলে যে তোমার ছায়ামূর্তি দর্শনের ভয়ংকর বাস্তবতা সম্পর্কে। ঐ ছবিটা আমারই এক হতভাগিনী পূর্ব প্রজন্মের; আমাদের পারিবারিক ইতিহাস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার জঘন্য ও ভয়ংকর পাপের একটা তালিকা আমার সিন্দুকেই তালাবন্দী হয়ে আছে। বলাও ভয়ংকর, শোনাও ভয়ংকর সে সব কাহিনী। ঐ মারাত্মক ঘরে ব্যাভিচার ও নরহত্যার ঘটনা ঘটেছিল, শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে। তাই স্থির করেছি, আমার পূর্ব পুরুষরা উচিত বিবেচনা করে ঐ ঘরটাকে যে ভাবে তালাবন্ধ করে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখেছিলেন আমিও তাই করব; যে অলৌকিক আতংক তোমার মত মানুষের সাহসকেও হার মানাতে পারে আর কেউ যাতে তার শিকার না হয় তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা আমি করব।”

এইভাবে যে বন্ধুদ্বয় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তারাই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন দুঃখের ভিতর দিয়ে। লড্ উড্ভিল হুকুম দিলেন সব জিনিসপত্র সরিয়ে দরজাটা গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হোক বটিদার পর্দা-ঢাকা ঘরটার। দুর্গ-প্রাসাদের সেই বেদনাদায়ক রাতের স্মৃতিকে ভুলতে জেনারেল ব্রাউন উড্ভিল অন্য বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন গ্রামাঞ্চলে।

———

রহস্যময় ছবি

মারগারেট পোটার

নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আন্ড্রু স্টার্লিং ভূতে বিশ্বাস করত না। তখন তার বয়স তের বছর ; কিন্তু পাঁচ বছর আগের একটা ঘটনা না ঘটলে সে তো ভূতকে ভূত বলেই চিনতে পারত না।

সাড়ে সাত বছর বয়সে যে ছিল একেবারেই ছেলেমানুষ ; সম্প্রতি বেশ বাড়তে শুরু করেছে। সপ্তম জন্মদিনে যে টেরিলিন শার্ট তার হাঁটু ছুঁত, এখন সেটা পরলে তার উরু বেরিয়ে পড়ে। একদিন তার বাবা-মা গাড়ি করে তাকে নিয়ে গেলেন হাই হিথ প্রিপারেটরি স্কুলে ভর্তি-পরীক্ষার জন্য। প্রধান শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন স্কুলের বাড়ি ও খেলার মাঠ ঘুরিয়ে দেখাতে। আন্ড্রুকে তুলে দেওয়া হল সেকেণ্ড মাস্টারের হাতে। লোকটি বয়স্ক, নাকের উপরে সোনালী ফ্রেমের চশমা, মুখে মিষ্টি হাসি।

দুজনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটা ছোট অন্ধকার ঘরে ঢুকল। ঘরটার সবগুলি দেওয়াল মেঝে থেকে শিলিং পর্যন্ত বইয়ের

তাকে ঠাসা। মাঝখানে একটা কাঠের টেবিলেও স্তূপীকৃত বই। তার চারিদিকে চারটে চেয়ার।

"স্কুলের শেষ বছরে সবচাইতে সেরা ছেলেরাই এই ঘরে পড়তে আসে," ঈষৎ বিদেশী উচ্চারণে সেকেণ্ড মাস্টার কথাগুলি বললেন।

আণ্ড্রু মাথা নেড়ে বোঝাতে চাইল সে মন দিয়ে শুনছে, কিন্তু আসলে নিজের আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে সে তখন এতই চিন্তিত যে অন্য কিছু ভাববার সময় তার ছিল না।

শিক্ষক বললেন, "এখানে বস। প্রথমে সহজ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি। একটা ছোট গল্প লেখ দেখি কেমন পার।"

লিখতে বসে আণ্ড্রুর বুক কাঁপতে লাগল সে মোটেই গল্প বানাতে পারে না। কিন্তু বাবাকে কথা দিয়েছে সাধ্যমত চেষ্টা করবে। হাতে নিয়ে কোন্ বিষয়ে গল্প লিখতে হবে সেটা শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

শিক্ষক বললেন, "দীর্ঘ গল্প লিখতে হবে না। ততটা সময় আমাদের হাতে নেই। তোমাকে একটা ছবি দেখাচ্ছি। সেটা দেখে তাকে ভিত্তি করেই গল্পটা লিখবে। এই দেখ।"

সাদা-কালোয় আঁকা একটা সাধারণ ছবি; যে রকম ছবি সাধারণত আঁকার বইতে থাকে। একটা একতলা বাসে একটি ড্রাইভার স্টিয়ারিং-হুইলে বসে হাঁ করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। পিছনের সিটে দুজন যাত্রী বসে আছে; পুরুষটির মাথায় মোটর-চালকের শিরস্ত্রাণ আর স্ত্রীলোকটির হাতে একটা পেট-মোটা বাজারের থলে। একজন ফুটবল-অনুরাগী যুবক সবেমাত্র বাসে পা দিয়েছে, তার মাথায় ডোরাকাটা পশমী টুপী, আর জার্সিতে একটা ছোট গোলাপ ফুলের ছবি পিন দিয়ে আটা। একটি বয়স্ক ভদ্রলোক হাত তুলে বাসটা থামাবে বলে ছুটে আসছে। বাতাসে তার স্কার্ফটা উড়ছে। খুবই সাধারণ একটা দৃশ্য। ছবিটাতে কিছু নেই যাতে বোঝা যেতে পারে কেন বাসটার পিছন থেকে বিষাক্ত গ্যাসের মত একটা ভয়ংকর ঘন কালো ধোঁয়ার সারি আণ্ড্রুকে ঢেকে ফেলতে চাইছে, তার দম বন্ধ করে দিতে চাইছে।

আণ্ড্রু উঠে দাঁড়াল। তার চেয়ারটা সশব্দে একপাশে উল্টে গেল

তার পেন্সিলটা ঠুক করে মেঝেতে পড়ল ; কিন্তু সে কিছুই শুনতে পেল না। ছবিটার কাছ থেকে এই মুহূর্তেই পালিয়ে যেতে হবে—এছাড়া আর কোন চিন্তাই তার মাথায় এল না। ঘরটা খুব ছোট। এক পা পিছিয়ে গেলেই দেওয়ালে ধাক্কা খেতে হবে। তার মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল ; হৃৎপিণ্ডের গতি থেমে গেল ; বরং মনে হল হৃৎপিণ্ডটা যেন শরীরের মধ্যে বেলুনের মত ফুলে উঠছে। মাথার চারদিকে একটা গর্জনের শব্দ হচ্ছে, কিন্তু মাঝখানে দেখা যাচ্ছে ত্রাসের একটা ছোট সাদা বৃত্ত। পিছু হটে বইয়ের তাকের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল ; কোন কিছু ধরবার জন্য হাত দুটোকে দুদিকে বাড়িয়ে দিল ; মনে হল, সে বুঝি, পড়ে যাবে।

কিসে যেন তাকে সজোরে আঘাত করল, প্রথম ডান গালে, তারপর বাঁ গালে। একটা হাত গলা চেপে ধরে এমনভাবে তাকে নুইয়ে দিল যে তাঁর মাথাটা হাঁটু স্পর্শ করল। একমুহূর্ত পরে সে শিউরে উঠল ; মাথার ভিতরকার গর্জনটা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হল ; কানে এল শিক্ষকের কণ্ঠস্বর।

"তোমাকে আঘাত দেবার জন্য ওটা করা হয় নি অ্যাণ্ড্রু, তোমার মাথায় রক্তটা ফিরিয়ে আনতেই ওরকম করা হয়েছে। একটু কিছু পান করবে কি ?"

জবাব দিতে আণ্ড্রুর এক মুহূর্ত বিলম্ব হল। সে কিছুতেই বুঝতে পারল না, ভয়ের কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেন সে ভয় পেল। কিন্তু একটা জবাব তো দিতে হবে।

"না ; ধন্যবাদ স্যার।" বাবা তাকে শিখিয়ে দিয়েছে যতবার সম্ভব সে যেন "স্যার" কথাটা ব্যবহার করে।

শিক্ষক বললেন, "মনে হচ্ছে এই ছোট পরীক্ষার জন্য তুমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছ। 'হাই হিথ'-এ আসাটা কি তোমার পক্ষে একান্তই দরকার ?

প্রশ্নটা মোটেই সহজ নয়। জুনিয়র স্কুলে আণ্ড্রু বেশ সুখেই ছিল। কেন যে বাবা-মা তাকে অন্য স্কুলে দিতে চায় তাও সে জানে

না ; কিন্তু সে এটা জানে যে তার সাহায্য ছাড়া তাদের এ পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে না। কাজেই কারণ যাই হোক না কেন, এ ব্যাপারে তার যে একটা দায়িত্ব আছে তা সে বোঝে।

মনে হল, তাকে চুপ করে থাকতে দেখেই শিক্ষক সঠিক জবাবটা পেয়ে গেলেন।

বললেন, "তোমার বাবা হয় তো এটা চান, কি বল ?" আন্দ্রু, মাথা নাড়ল। "কিন্তু কেন চান সেকথা কি তোমাকে কেউ বলেন নি ?"

শিক্ষক একমুহূর্ত থেমে দরজাটা খুলে দিলেন।

"আবার আমার সঙ্গে এস।" সিঁড়ি বেয়ে উঠে তারা একটা বড় ঘরে ঢুকল। মনে হল, ঘরটা একাধারে সভাকক্ষ ও ব্যায়ামাগার। দুটো টানা দেওয়ালে মই বসানো। প্ল্যাটফর্মের পিছনে একেবারে শেষ প্রান্তে কৃতী ছাত্রদের নামের তালিকা সম্বলিত একটা বোর্ড চোখে পড়ল। বোর্ডটা ভর্তি করে সোনালী অক্ষরে অনেক নাম লেখা রয়েছে।

শিক্ষক বললেন, "এটা ভাল ছেলেদের স্কুল। কম-বেশী সকলেই ভাল, কেউ বোকা নয়। কোন ধনী ব্যক্তি যদি তার বোকা ছেলেকে নিয়ে আসেন, আমরা তাকে দুঃখের সঙ্গে ফিরিয়ে দিই।"

আন্দ্রু শুধাল, "এখানে ভর্তি হবার আগেই কি করে আপনারা বোঝেন তারা ভাল ছেলে ?"

শিক্ষক বললেন, "যেসব ছেলে এখানে আসতে চায় তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি একটি ঘণ্টা কাটাই। সেই এক ঘণ্টার পরেই আমি বুঝতে পারি তার বুদ্ধিশুদ্ধি কতটা আছে।" শিক্ষক প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে গেলেন। বোর্ডটা দেখিয়ে বললেন, "কেউ তার ভাল ছেলেটিকে আমাদের এখানে দিলে বিনিময়ে আমরা তাকে এইটি দিতে চেষ্টা করি। পাবলিক স্কুলে যাবার জন্য একটা বৃত্তি।"

আন্দ্রু বলল, আপনারা দেখছি বহু ছেলে পান স্যার।" গত বছরের তারিখ দিয়ে যে নামগুলি সোনালী অক্ষরে লেখা হয়েছে সেগুলিকে সে গুণতে লাগল।

শিক্ষক ঘাড় নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, অনেক ছেলে। এই জন্যই তোমার বাবার মত সকলেই তাদের ছেলেকে 'হাই হিথ'-এ পাঠাতে চান। তেরো বছরের ছেলেরা বৃত্তি পায়, আর তাতেই স্কুলের সুনাম হয়। ফলে সাত-আট বছরের ভাল ছেলেদের এখানে পাঠানো হয় যাতে তারাও একদিন বৃত্তি পেতে পারে। তোমার বাবা মনে করেন তুমিও একটি ভাল ছেলে। কিন্তু বাবারা তো তাদের ছেলেকে ভাল ভাববেনই। তিনি ঠিক ভেবেছেন কি না সেটা প্রমাণ করতে হবে তোমাকে। স্কুলে কি পড়তে তোমার সব চাইতে ভাল লাগে আণ্ড্রু?"

"অংক স্যার।"

"তাহলে তো আমাদের সেই ছোট ঘরটায় ফিরে গিয়ে কিছু অংকই কষতে হবে।"

তারা এত দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামল যে স্পষ্টই বোঝা গেল যথেষ্ট সময়ই এরই মধ্যে নষ্ট হয়েছে।

"এখানে আমার ঠিক পাশে বস। দেখ, এই ছোট বইটাতে একশটা প্রশ্নের অংক আছে। অবশ্য সবগুলো অংক কষতে তোমাকে বলব না। অনেকগুলো অংকই তোমার চাইতে তিন-চার বছরের বড় ছেলেদের জন্য। প্রথমে আমরা তাড়াতাড়ি লাফিয়ে যাব, যাতে আমি বুঝতে পারি কোথায় তোমার শক্ত লাগছে।"

আণ্ড্রু ঘাড় নেড়ে জানাল, সে বুঝেছে। সে সোজা হয়ে বসল। এ পরীক্ষাটাতে তাকে ভাল ফল করতেই হবে।

"প্রথম অংকটা একেবারে বাচ্চাদের জন্য। উত্তর বল।

সহজ গুণ অংকটা মনে মনে কষেই আণ্ড্রু সঠিক জবাবটি দিল

"সোজা চলে যাও দশ নম্বরে। মনে হয়, এটাও তোমার পক্ষে সোজা হবে।"

অংকটা এই রকম : একটি ছেলে কিছু মার্বেল জিতল, কিছু হারল, কিছু ভাগাভাগি করল ; কিন্তু কথাগুলি বলা হল খুব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এ অংকটা আণ্ড্রু মনে মনেই কষে ফেলল।

"তাহলে চলে যাও বিশ নম্বরে। কাগজ-পেন্সিলের দরকার হলে চেয়ে নাও।"

এ অংকটা একটি পরিবারের ছেলেমেয়েদের বয়সের হিসাব। আন্দ্রু অংকটা ঠিক করে ফেলল।

শিক্ষক বললেন, "এবার তোমাকে একটা শক্ত অংক দিতে হবে।

ত্রিশ।"

ত্রিশ নম্বর অংকটার চার অংশ। প্রত্যেক অংশে পর পর কতকগুলি করে সংখ্যা। প্রতিটি অংশে আর একটা সংখ্যা যোগ করতে হবে সংখ্যা-গুলির ক্রম-নিয়ম অনুসরণ করে। আন্দ্রু খুব তাড়াতাড়ি প্রশ্নটা বুঝে নিয়ে সঠিক জবাবই দিল।

ত্রিশ নম্বরে পরে আর লাফিয়ে যাওয়া নেই। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে সে ধীরে ধীরে একের পর এক অংক কষে যেতে লাগল। সাঁইত্রিশ ভুল হল; আটত্রিশ আরম্ভই করতে পারল না। সভয়ে শিক্ষকের দিকে তাকাল।

শিক্ষক বললেন, "তুমি তো ভালই করছ। এবার তোমাকে একটা ছোট্ট পড়া দেব। মন দিয়ে শোন; দেখ ঠিক বুঝতে পার কিনা।"

পড়াটা গড়-বিষয়ক; কথাটা আন্দ্রু আগে কখনও শোনে নি। শিক্ষক বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে চুপ করলেন। আন্দ্রু বুঝতেই পারল না তাকে কি করতে হবে।

"তুমি কি আটত্রিশটা আর একবার দেখবে?"

একার অংকটার দিকে তাকিয়েই আন্দ্রু বুঝতে পারল, সে ঠিক কষতে পারবে। খুশির হাসি হেসে উত্তরটা লিখে দিল।

বলল, "কিন্তু এটা কি হল স্যার? মানে, আপনি তো আমাকে সাহায্য করলেন।"

"তোমার উত্তরগুলো দেখে আমাকেই তো বলতে হবে 'হ্যাঁ, আমরা একে নেব অথবা নেব না। আর আমিই শুধু জানব তুমি কতটা সাহায্য পেয়েছ। তোমাকে যা বলা হল সেটা তুমি ঠিক বুঝতে পার কিনা—সেটাও এক ধরনের পরীক্ষা। এবার এই বইটা থেকে আমাকে কিছু পড়ে শোনাও।"

*

খুব বেশী না থেমেই আণ্ড্রু একটা অনুচ্ছেদ পড়ল। তাকে অনেকগুলি ছবি দেওয়া হল। এক রকমের দুটো ছবি, বা এক ধরনের ছবি নয় এ রকম ছবি সে সহজেই বেছে বের করে দিল। শিক্ষক সারাক্ষণই সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর ছবিগুলি ফিরিয়ে নিলেন।

"এবার লিখতে পারবে তো?"

অকারণেই এবারও আগের মতই একটা ভয় তাকে পেয়ে বসল। এক মিনিট কোন কথা বলতে পারল না; শুধু মাথা নাড়ল।

তারপর যেন কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেল। বলল, "না, না, আমি পারব না।"

"কেন পারবে না?"

কেন পারবে না তা আণ্ড্রু জানে না। শুধু বুঝল, এখানে আসা তার উচিত হয় নি। এখানে তার জন্য কোন অকল্যাণ অপেক্ষা করে আছে। সে এখান থেকে চলে যেতে চায়, এই বুড়ো মানুষটির কাছ থেকে পালাতে চায়; ইনি যে তার মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পান, সেখানে যা কিছু আছে সব পরিষ্কার করে দিতে চান। তাছাড়া, এই বাস ও তার সারিবদ্ধ যাত্রীদের দৃষ্টির বাইরে সে চলে যেতে চায়।

একটা যুক্তি খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টায় সে বলে উঠল, "আমি বানান করতে পারি না। কথাটা সত্যি। জুনিয়র স্কুলের কোন শিক্ষকই বানান শেখার উপর গুরুত্ব দেন নি। তাঁরা বলতেন, তাড়াতাড়ি লিখতে পারলেই হল, আর মনের কথা বোঝার জন্য ঠিক শব্দটা বেছে নিতে পারলেই হল। শব্দের ভিতরকার অক্ষরগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

শিক্ষক দয়ালু গলায় বললেন, "আমি তোমাকে সাহায্য করব কেমন করে বানান করতে হয় তা তোমাকে শিখিয়ে দেব। আজ আমি শুধু দেখতে চাই, বানান করার উপযুক্ত কোন কিছু তুমি ভাবতে পার কি না।"

"না, সেটা ভাবতে আমি চাই না।"

"সে কি! তুমি যদি কিছুই না লেখ, তাহলে আমি তোমাকে

পরীক্ষায় পাশ করাব কেমন করে ?”

“আমি পাশ করতে চাই না।”

“কিন্তু আমি চাই।” শিক্ষক এক মুহূর্ত থামলেন। “এস। আর একবার ‘হাই হিথ’-এর কথাই আলোচনা করি। এ স্কুলে অনেকগুলি পরীক্ষা হয়। পাবলিক স্কুলের বৃত্তি-পরীক্ষাটা হচ্ছে শেষ পরীক্ষা। প্রতি টার্মেই একটা করে ছোট পরীক্ষা হয়। প্রতি তিন সপ্তাহে একবার করে নম্বর যোগ করা হয় ; প্রত্যেক শ্রেণীর একেবারে উপরের ও একেবারে নীচের ছেলে হওয়াটা তো সুখের কথা নয়। কাজেই সব সময় কঠোর পরিশ্রম করে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এ ব্যবস্থাটা সব ছেলের পক্ষেই যে ভাল তা নয়। অনেকেই এতে বিরক্ত হয়, দুঃখ পায়। এই স্কুলে আসাই তাদের উচিত নয়। তুমি খুব ছোট, কিন্তু আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে, তোমাকেও বুঝতে হবে, এখানকার জীবন তোমাকে উদ্দীপিত করবে না বিষণ্ণতার মধ্যে ফেলে দেবে—এটা তোমার পক্ষে সঠিক জায়গা কি না।”

আন্দ্রু কিছুই বলল না। ছবির ব্যাপারটা ছাড়া আর সবই তার ভাল লেগেছে ; তবু কেন যে অকারণে তার মন খারাপ হয়েছে তা সে বুঝতেই পারছে না।

শিক্ষক বলতে লাগলেন, “একটা পরীক্ষা ভালভাবে পাশ করতে হলে তিনটে জিনিস প্রয়োজন। তোমাকে শুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে হবে, আর সেই জ্ঞান তোমাকে দান করাই শিক্ষকের কাজ। সেই জ্ঞানকে কাজে লাগাবার মত বুদ্ধি তোমার থাকা চাই। হয় তো আমার বলা উচিত নয়, তবু বলছি যে সে বুদ্ধি তোমার আছে। কিন্তু আরও একটা তৃতীয় জিনিস চাই। এই সব পরীক্ষায় ভাল ফল করার উচ্চাকাংক্ষা তোমার অবশ্যই থাকা চাই। এই স্কুলে আসার বাসনা যদি তোমার থাকে তো এই পরীক্ষাটা তোমাকে শেষ করতে হবে এবং আরও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ পরীক্ষাটা যদি শেষ করতে না পার তাহলে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, আর কোন দিন এসো না। এখন তোমার যা অভিরুচি।”

আন্দ্রু শিক্ষকের দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। দুটি সদয় চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"দেখ আন্দ্রু, যদি এখানে থাক, আমি তোমাকে গড়ে পিটে মানুষ করে তুলব। তুমি আমার সঙ্গে-কাজ করবে, শক্ত শক্ত অংক কষবে, আর ঐ বোর্ডে তোমার নাম আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়ে দেব। তুমি কি আমার কথা মত থাকবে? গল্পটা লিখে ফেলবে?"

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। স্কুল পাল্টাবার কোন কারণ আন্দ্রুর নিজের নেই, আর সেই মায়ের ছবিটা প্রথম দেখার পর থেকেই বাবার ইচ্ছা ও গুরুত্বও তার কাছে কমে গেছে। কিন্তু যে কারণেই হোক এই বুড়ো মানুষটি তার বন্ধু হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে যে বন্ধন গড়ে উঠেছে আন্দ্রু সেটাকে ভাঙতে অক্ষম। সে ঘাড় নাড়ল।

তখন কিন্তু সে গল্পটা লিখতে শুরু করতে পারল না। ছবিটার দিকে যতবার তাকায় ততবারই সে ভয়টা তাকে পেয়ে বসে; আর সেই ভয়কে জয় করতে গিয়ে আর কোন দিকেই মন দিতে পারে না।

শিক্ষক শান্ত গলায় বললেন, "এই লোকগুলির বরং একটা করে নাম দেওয়া যাক। একটা মুখকে নিয়ে গল্প লেখাটা শক্ত। কিন্তু তাকে যখন একটা নাম দেওয়া যায় তখন সে একটা মানুষ হয়ে ওঠে, আর তার জীবনে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। এবার লেখ।"

পেন্সিলটা আঙুলে চেপে ধরে আন্দ্রু বাসের জন্য ছুটন্ত বুড়ো লোকটার দিকে তাকাল। জড়ানো হরফে লিখতে শুরু করল।

"মিঃ স্মিট্—"

শিক্ষক মুচকি হাসলেন।

"তুমি দেখছি আমাকে নিয়েই লিখছ, কি বল?"

আন্দ্রু চমকে চোখ তুলে তাকাল।

"আপনি মিঃ স্মিথ?"

"ইংলণ্ডে আমি মিঃ স্মিথ। আমার বয়স যখন তোমার মত ছিল তখন আমার নামের বানানটা তুমি যেমন লিখেছ প্রায় সেইরকমই ছিল।

তুমি ইংরেজী বানানটাই রপ্ত করো, কেমন ?”

আন্দ্রু সভয়ে নামটা কেটে ফেলতে গিয়ে পেন্সিলটাতে এত জোরে চাপ দিল যে কাগজে একটা ফুটো হয়ে গেল।

শিক্ষক ঈষৎ হেসে বললেন, “তোমার ভুলটা শুধরে দেওয়া আমার উচিত হয়নি। আমি বাইরে চলে যাব কি ?”

“হ্যাঁ স্যার, তাই করুন।”

“একটু পরেই আমি ফিরে আসব। দয়া করে তোমার গল্প থেকে আমাকে বাদ দিও না। আমার মিঃ স্মিথ সম্পর্কেই লেখ।”

ছবিটার উপরে ঝুঁকে শিক্ষক ছুটন্ত বুড়ো লোকটির নাকের উপর একজোড়া চশমা এঁকে দিলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন!

ছবিটায় যা কিছু অশুভ শক্তি সব যেন তার সঙ্গেই চলে গেল। লেখার ব্যাপারে আন্দ্রু কোনোদিনই পোক্ত নয়, কিন্তু এবার কথাগুলি যেন কাগজে লিখবার আগেই তার মাথা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। তার সর্বশেষ স্কুল-রিপোর্টে বলা হয়েছে, তার মধ্যে কল্পনা-শক্তির অভাব আছে; কিন্তু ছবিটার দিকে তাকিয়ে তার কোন কিছু কল্পনা করার দরকারই হল না। বাসটা সম্পর্কে সব কথাই যেন তার জানা। কোন কিছু বানিয়ে লেখার দরকারই হল না; শুধু সে যা জানে তাই লিখে গেল।

মিঃ স্মিথের প্রত্যাশার অনেক আগেই তার লেখা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ছোট ঘরটাতে একলা বসে থাকতে ভাল না লাগায় সে নিজেই দরজাটা খুলে দিল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই সে শুনতে পেল স্কুল পরিদর্শনান্তে তার বাবা মাকে প্রধান শিক্ষকের পড়ার ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে। একটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল; বাইরের বারান্দায় প্রধান শিক্ষক কাকে যেন কিছু বললেন।

“আমি ভিতরে ঢুকবার আগেই ছেলেটি সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন।”

আন্দ্রু চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল। কোন রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করবার

সাহস হল না, আবার ছোট ঘরটাতে ফিরে যেতে গিয়ে কোনরকম শব্দ করতেও চাইল না। সে বুঝল, এভাবে ওদের কথাবার্তা শোনা তার উচিত নয়, কিন্তু এতক্ষণে মিঃ স্মিথের মতামত তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মিঃ স্মিথের গলা শোনা গেল। "সে এখনও শেষ করে নি। তাকে একটা গল্প লিখতে দিয়ে এসেছি! কিন্তু আপনাকে বলছি স্যার, যদিও সে একটা শব্দের পর আর একটা শব্দ বসাতে পারে না, তবু তাকে এখানে আনতে হবে। তাকে আমার চাই।"

"একটি ভবিষ্যৎ গাণিতজ্ঞ বুঝি?"

মিঃ স্মিথ বললেন, "সে প্রতিভা আর আছে। এর মধ্যেই অংকের যেসব কথা সে বুঝতে পারে তার চাইতে চার বছর বড় অনেক ছেলের পক্ষেই তা বোঝা বেশ শক্ত। তাকে শিছুই শেখানো হয় নি, কিচ্ছু না। এটা একটা অপরাধ। কিন্তু কোন সাহায্য ছাড়াই সে সংখ্যাতত্ত্ব বুঝেছে। কি জানেন স্যার, এখানে পঁচিশ বছর ধরে আমি এমন একটি ছেলেরই খোঁজ করছি যে উইন্‌চেস্টার-এর প্রথম বৃত্তিটি জয় করে আনবে।"

প্রধান শিক্ষক বললেন, 'উইন্‌চেস্টার পরীক্ষার্থীদের নিয়ে আপনি তো আগাগোড়াই ভাল ফল দেখিয়েছেন। গত বছরই তো তৃতীয় স্থান পেয়েছে, আর তার কিছু আগেই পঞ্চম স্থান।"

"কিন্তু প্রথম স্থান তো পায় নি। সেকথা থাক। এতদিনে সেই ছেলেটিকে আমি পেয়েছি।"

"সাত বছর বয়সেই সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না।"

মিঃ স্মিথ বললেন, "ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে। একটা অনুভূতি। আমরা পরস্পরকে কথা দিয়েছি। সে নিজেকে আমার হাতে সঁপে দেবে, আর আমি তাকে দেব উইন্‌চেস্টার বৃত্তি। তালিকার একেবারে শীর্ষ স্থানটি।"

"বলেন কি মশায়!" প্রধান শিক্ষকের কণ্ঠস্বরের বিরক্তিতে আন্ড্রু অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু এখন তার পক্ষে সেখান থেকে সরে যাওয়া

অসম্ভব। আপনি নিশ্চয় ছেলেটিকে এসব কথা বলেন নি? আর তাকে যদি কথা দিয়েও থাকেন তাহলেও সে কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করবেন না। এ ধরনের কথা আপনি আমাকে দিতে পারেন।

"ঠিকই বলেছেন স্যার।"

জানালা দিয়ে একঝলক বাতাস এসে নীচের ঘরের দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিল! মুহূর্তের জন্য অ্যাণ্ড্রু চমকে উঠল; তারপরই যেন একমাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে এমনিভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। তাকে দেখে মিঃ স্মিথ একটু ও অবাক হলেন না।

"শেষ করেছ? এস আমার সঙ্গে।" মিঃ স্মিথ তাকে নিয়ে প্রধান শিক্ষকের পড়ার ঘরে ঢুকলেন। মিঃ ও মিসেস স্টালিং সেখানেই বসেছিলেন। শিক্ষক বললেন, "আণ্ড্রুকে তার গল্পটা জোরে জোরে পড়ে শোনাতে বলব কি? তাহলে বানানে ভুল থাকলেও সেটা কেউ জানতে পারবে না।"

এই দয়াটুকুর জন্য আণ্ড্রু খুব কৃতজ্ঞ বোধ করল। বড়রা যাতে তার গল্পের বিষয়বস্তুটা বুঝতে পারে। সেজন্য ছবিটা সকলকে দেখানো হল। তারপরই আণ্ড্রু পরিষ্কার জোর গলায় পড়তে শুরু করল।

"বাসের ড্রাইভার যাত্রা শুরু করতে প্রস্তুত। তার নাম জ্যাক! স্ত্রী অসুস্থ থাকায় সে খুব চিন্তিত; পিছনের আসনে দুজন বসে আছে। মিঃ জোন্স মোটর বাইকের দোকানে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে বাইকটা খারাপ হওয়ায় তাকে বাসে চেপে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। মিসেস হল বাজার করতে বেরিয়েছে। গরমে তার খুব কষ্ট হচ্ছে, কারণ মহিলাটি খুব মোটা। বাসের মধ্যে আরও একজন কেউ আছে, কিন্তু অন্যদিকে বসার জন্য তাকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে না। মিঃ পারকিন্স সবে বাসে উঠতে যাচ্ছে। সে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল। সেখানেই লড়াই বেঁধেছিল। এখন বাড়ি যেতে পেরে সে খুব খুশি। মিঃ স্মিথ বাসটা ধরার জন্য ছুটছেন। তিনি খুব বৃদ্ধ, তাই জোরে ছুটতে পারেন না। সকলে

বসতেই ড্রাইভার বাসটা ছেড়ে দিল। বাসে একটা দুর্ঘটনা ঘটবে, কিন্তু সেটা এখনও কেউ জানে না। যাত্রার শেষে বাসের সব লোকই মারা গেল।"

নিজের লেখাটা নিয়ে সে খুব খুশি ; কিন্তু সকলকে চুপ করে থাকতে দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল, মনে হল সে বুঝি অন্যায় কিছু করে বসেছে। মা ও বাবা চিন্তিতভাবে দৃষ্টি-বিনিময় করলেন ; প্রধান শিক্ষক অবাক দৃষ্টিতে মিঃ স্মিথের দিকে তাকালেন।

বললেন, "আপনি বলেছিলেন যে ছেলেটির লেখার কোন ক্ষমতা নেই।"

"আন্ড্রু নিজে আমাকে যা বলেছে আমি আপনাকে তাই বলছি। এ লেখাটা তো তখন দেখি নি।"

প্রধান শিক্ষক তবু মাথা নাড়তে লাগলেন! তারপর উজ্জ্বল চোখে আন্ড্রুর বাবা-মার দিকে তাকালেন।

"মিঃ স্টালিং, মিসেস স্টালিং লেখাটা বেশ ভাল হয়েছে। বেশ আনন্দের সঙ্গেই আমরা সেপ্টেম্বর মাসে আপনাদের ছেলেকে এখানে নিয়ে নেব। এখনও যদি কোন পাবলিক স্কুলে তার নাম না লিখিয়ে থাকেন তাহলে অচিরেই সেটা করে ফেলুন।"

মিঃ স্মিথ বললেন, আপনাদের যেখানে খুশি তার নামটা লিখিয়ে রাখুন। কিন্তু তেরো বছর বয়স হলে আমি তাকে উইন্‌চেস্টারেই পাঠাব।"

মুহূর্তের জন্য প্রধান শিক্ষককে বিরক্ত মনে হল।

"দেখুন মিঃ স্মিথ, আপনার কথাটা যেন স্মরণ থাকে।"

প্রধান শিক্ষককে জবাবটা দিলেও মিঃ স্মিথ আন্ড্রুর দিকে তাকিয়েই স্মিত হাসি হাসলেন।

বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয় স্যার। আমি সব সময়ই কথা রাখি।"

আন্ড্রু যেদিন প্রথম "হাই হিথ"-এ ঢুকেছিল নবাগতা ছাত্র হিসাবে তার পাঁচ বছর পর খ্রীস্টমাস টার্মের শেষ দিনে বিদায়ী ছাত্রদের সম্মানে

প্রধান শিক্ষক একটি ভোজসভার আয়োজন করেছেন। ডিসেম্বর মাসেই পাবলিক স্কুলগুলি তাদের অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের প্রার্থীদের বিদায়-সম্ভাষণ জানায়, তার ফলে জানুয়ারী মাসেই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আগত নতুন ছাত্রদের তারা ভর্তি করতে পারে!

এ বছর যে তেরোটি ছাত্র "হাইহিথ" ছেড়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে ন'জন বিভিন্ন স্কুলের বৃত্তি বা সম্মান-পদক লাভ করেছে, কিন্তু আন্ড্রুই হয়েছে সেরা বীর। আগেকার মে মাসে উইন্‌চেস্টার নির্বাচনে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছেলের তালিকায় সেই শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। প্রধান শিক্ষক তার সঙ্গে করমর্দন করেছেন, বাবা হিসাব করছেন বৃত্তির দরুন কত টাকা পাওয়া যাবে; তাকে একটা নতুন বাইসাইকেল কিনে দিয়েছেন; আর মিঃ স্মিথ আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে তার দুই গালে চুমো খেয়েছেন।

আন্ড্রু অবশ্য চোখের জল বা চুম্বন কোনটাতেই বিব্রত বোধ করে নি; অবশ্য অন্য কেউ একাজ করলে সে খুবই বিব্রত হত। মিঃ স্মিথের সঙ্গে তার সম্পর্কটাই অন্য রকম। পরীক্ষার আগের বছর থেকেই ছোট লাইব্রেরি ঘরটাতে বসে দুজনে লেখা পড়া করেছে। সেই সময় আন্ড্রু যেন অনুভব করত, শিক্ষকের সব জ্ঞান আপনা থেকে তার মাথায় ঢুকে যাচ্ছে, তাকে কোনরকম চেষ্টাই করতে হচ্ছে না। ততদিন সে আরও বুঝে নিয়েছে যে উইন্‌চেস্টারকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন মিঃ স্মিথ এতকাল দেখে এসেছেন তাকে পূর্ণ করার শেষ সুযোগটি এনে দিয়েছে সে নিজে। সেকেণ্ড মাস্টারটি ইতিমধ্যেই অবসর গ্রহণের বয়স পার হয়ে গেছেন। লোকে বলে, তার বয়স প্রায় সত্তর বছর; কাজেই এটা নিশ্চিত যে সেপ্টেম্বরের পরে তিনি আর এ-স্কুলে ফিরছেন না। জুলাই মাসের পুরস্কার-বিতরণী সভায় তাকে একটা জটিল দেওয়াল-ঘড়ি উপহার দেওয়া হয়েছে। ঘড়িটার যন্ত্রপাতি সব দেখা যায়। পঁচিশ বছর ধরে যেসব ছাত্রদের তিনি পড়িয়েছেন তারাও এসে তার সঙ্গে কর-মর্দন করে গেছে।

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মিঃ স্মিথ এমনিতেই সেপ্টেম্বরে আর "হাই-হিথ"-এ ফিরে আসতে পারতেন না। আগস্ট মাসে তার একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে; নভেম্বর মাসের শেষে আর একটা বিদায়ী ছাত্রদের ভোজসভায় প্রধান শিক্ষক তো বলেই ফেললেন যে এক ঘণ্টা আগে হাসপাতাল থেকে খবর এসেছে মিঃ স্মিথের "অবস্থা খারাপ।" আন্ড্রু কথাটির অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না; তবুও স্থির করল যে বড়দিনের ছুটিতে প্রাক্তন শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

ভোজসভার জন্য স্কুল থেকে বের হতে আন্ড্রুর কিছুটা দেরী হয়ে গেল। চৌমাথার মোড়ে পেঁছেই দেখতে পেল, একটা বাস স্টপ থেকে ছেড়ে চলে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মা বলেছিল, গাড়ি নিয়ে এসে তার সঙ্গে দেখা করবে। মা তো জানতই, স্কুলের শেষ দিনে আন্ড্রু অনেক জুতো, বই ও বড়দিনের পুরস্কার পাবে। কিন্তু ভোজসভা ঠিক কখন শেষ হবে জানত না বলে সে মার প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিয়েছিল। এখন তার মনে হল, প্রস্তাবটা গ্রহণ করলেই ভাল করত।

বাস চলে আধঘণ্টা পর-পর। এদিকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপার চাইতে সে রুটের টার্মিনাস পর্যন্ত সামান্য দূরত্বটুকু হেঁটে গিয়ে পরের বাসটাতে বসে পড়ল। দেখা যাক, কতক্ষণে বাসটা ছাড়ে।

আটটা নাগাদ ড্রাইভার একটা কাফে থেকে বেরিয়ে এল। একটা টেলিফোন করতে সেখানে গিয়েছিল। এসেই সে সঙ্গে সঙ্গে বাসটা ছেড়ে দিল। বাসটা যেন আগের তুলনায় একটু বেশী ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

ড্রাইভার আন্ড্রুকে ভাল করেই চেনে। শুধু প্রতি টার্মের প্রথম সপ্তাহে অথবা বাসে ইন্সপেক্টর উঠলে তবেই সে আন্ড্রুর সিজন-টিকিটটা একবার দেখতে চায়। কিন্তু আন্ড্রু বাসে ঢোকবার পরেই যে দুটি যাত্রী উঠেছে তাদের টিকিট কাটতেও সে বাসের পিছন দিকে গেল না দেখে আন্ড্রু অবাক হয়ে গেল। যাত্রীদের দুজনের মধ্যে মোটা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে বড়দিনের কেনাকাটার বোঝা, আর যুবকটির পরনে কালো চামড়ার

সুট, মাথায় হলুদ শিরস্ত্রাণ। যাইহোক, সেটা আন্দ্রুর কোন ব্যাপারই নয়।

বোঝা গেল, আজ ড্রাইভারের খুব তাড়া আছে। প্রতিটি বাধ্যতা মূলক বাস-স্টপে গাড়ির গতি মন্থর করলেও নিয়মমাফিক একেবারে থামাচ্ছে না। সে যেন ধরেই নিয়েছে, কোন যাত্রী যখন নামবার জন্য অপেক্ষা করে নেই তখন কেউই সে স্টপে নামছে না, তাতে আন্দ্রুরই ভাল। সে চায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। কিন্তু এ অবস্থায় একটি যাত্রীকে লাফিয়ে বাসে উঠতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। আঠারো বছর বয়সের একটি যুবক ; মাথায় পশমের টুপি, পরনে স্থানীয় ফুটবল ক্লাবের জার্সিতে একটা ছোট গোলাপের ছবি আঁটা। যুবকটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। সে টিকিট চাইল না, ড্রাইভারও তার দিকে নজর দিল না। ধীরে ধীরে হেঁটে বাসের পিছনের দিকে চলে গেল।

তাকে দেখে আন্দ্রু কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। লোকটিকে পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় পরিচয় হয়েছে প্রথমে সেটা বুঝতেই পারল না।

তারপরেই মনে পড়ে গেল। হঠাৎ তার শিরায় শিরায় রক্ত বুঝি জমাট বেঁধে গেল। আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে ঘুরে বাসের পিছন দিকে তাকাল। তিনটি যাত্রী সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশাপাশি বসে আছে ; কেউ কিছুই বলছে না ঃ স্ত্রীলোকটির হাতে বাজারের ঝুড়ি, যুবকটিকে ঘিরে ফুটবলের গল্প, পুরুষটির মাথায় শিরস্ত্রাণ।

যে আয়নাটার মধ্যে যাত্রীদের দেখা যায় সেদিকে চোখ রেখে ড্রাইভার বলল, 'বসে পড়। তোমার স্টপ এখনও আসে নি।'

কিন্তু আন্দ্রু নাড়তেই পারছে না। ভর্তি-পরীক্ষার পর থেকে বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে বাসের সেই ছবিটা এবং এই ছবিটা দেখে তার ভয়ের কথা সে সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিল। সেই ভয়টা আবার ফিরে এসেছে— আগের চাইতেও তীব্রতর হয়ে ; কারণ আগে তো ভয়ের কারণটাও সে জানত না। আজ জেনেছে ; এই বাসটিতেই দুর্ঘটনা ঘটবে।

এই পূর্বাভাষ ছাড়াই কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাটা সে হয়তো অনুমান করতে পারত। ড্রাইভার অত্যন্ত দ্রুত বাস চালাচ্ছিল, যে কোন মোড়ে পেঁছে বাসটাকে যেন ঝড়ের বেগে ঘুরিয়ে নিচ্ছিল, ব্রেক না কসেই সামনের গাড়ির পিছনে পেঁছে যাচ্ছিল। আন্দ্রুর গলা শুকিয়ে আসছে তবু সে নিজেকে সংযত করে রাখল। বাসের ছবিটাতে তার বয়সের কোন ছেলে ছিল না। আর সেখানে ছিল একটা বুড়ো মানুষ। যতক্ষণ না বুড়ো লোকটি এসে তার জায়গায় দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ কোন বিপদ ঘটতে পারে না। এখনও আসন্ন বিপদ থেকে পালাবার সময় আছে।

এক পা এগিয়ে আন্দ্রু বলল, 'আমি এখানেই নেমে যাব।' সামনেই একটা অনুরোধের বাস স্টপ, কিন্তু ড্রাইভার এত জোরে বাসটা চালাচ্ছে যে সেখানে থামাতেই পারল না ; আর সে চেষ্টাও করল না।

মুখে বলল, 'যাত্রীরা যেখানে সাধারণত নেমে থাকে সে স্টপটা কি দোষ করল ? আমরা তো প্রায় সেখানে এসে পড়েছি।'

সামনেই একটা বড় চৌমাথা। সেখানে পেঁছতেই ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠল। কি যেন বিড়বিড় করে ড্রাইভার বাসটা থামিয়ে দিল মোড়টা তাদের বাড়ি থেকে বাস-স্টপের তুলনায় কাছে হলেও অত্যধিক ভিড়ের জন্য আন্দ্রুকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে—সে যেন কখনও এখানে বাস থেকে না নামে। মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও গুরুজনের কথা মেনে চলার অভ্যাসবশত সে এক মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু তখনি সহসা তার মনে হল যে এই চৌমাথায়ই দুর্ঘটনাটা ঘটবে। এমনিতেই তো ড্রাইভারটিকে অস্বাভাবিক রকমেই অধৈর্য মনে হচ্ছে ; হলুদ আলো দেখা মাত্রই সে বাস ছেড়ে দেবে, আর অন্য রাস্তা ধরে আসতে আসতে অন্য কোন গাড়ি হয়তো ভাববে যে লাল আলোটা থাকতে থাকতেই চৌমাথাটা পার হয়ে যেতে পারবে।

সামনে একটু ঝুঁকে আন্দ্রু ভাল করে দেখে নিতে চাইল বাঁ দিক থেকে কোন গাড়ি আসছে কি না। কিন্তু সেটা করবার আগেই তার চোখটা এক জায়গায় আটকে গেল। চৌমাথার ও-পার থেকে একটি বুড়ো মানুষ

বাসস্টপের দিকে ছুটে আসছে ; বুড়োর স্কার্ফটা উড়ছে, নাকের উপর সোনালী ফ্রেমের চশমা হাত নেড়ে বাসটাকে থামাতে বলছে। লোকটি মিঃ স্মিথ।

এই দুর্ঘটনার একমাত্র সাক্ষী আগাগোড়াই বলল যে বাসের প্ল্যাটফর্মে ছেলেটি চীৎকার করে উঠেছিল ; কিন্তু মুহূর্ত পরেই সে বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, আর ঠিক সেইক্ষণেই একটা ট্যাক্সি এসে তাকে চাপা দিল ; কিন্তু কেন যে এরকমটা ঘটল তা কেউ বলতে পারল না। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আণ্ড্রুর মৃত্যু ঘটে নি ; সেই—মুহূর্তে নিজের মাথার মধ্যে একটা গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দই সে শুনতে পায় নি। শুধু আবছাভাবে তার মনে পড়ে, ট্যাক্সি ড্রাইভার সভয়ে তার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল, আর বাস ড্রাইভারটি তীব্র দুঃখে হাতের ড্রাইভিং হুইলের উপরেই মারা গিয়েছিল। তারপরেই পিছনের সিট থেকে উঠে তিনটি যাত্রী সার বেঁধে নীরবে বাস থেকে বেরিয়ে এসে অর্ধচন্দ্রাকারে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। অন্য দিক থেকে ছুটে এসে মিঃ স্মিথ তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তার মুখটা চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

তিনি বললেন, "ঐ বোর্ডে তোমার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আমি কথা দিলাম।"

আণ্ড্রু কথাগুলি শুনল। দুই গালে দুটি চুম্বনের স্পর্শও অনুভব করল। তারপরই মিঃ স্মিথ তাকে তুলে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন।

———

এ্যাডগার এলান পো

লণ্ডনে ফিরে এসে বহুদিন পর একটা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম মনের মতো। আশা ছিল শহরের এক কোণে বাড়িটা হবে। সামনে থাকবে ছোট একটা ফুলের বাগান। কিন্তু লোকজন, ট্রাম-বাসের হট্টগোল যেন একদম শোনা না যায়। এই কল্পনার বাড়ি সর্বত্র খুঁজে চললাম। বেড়াতে বেড়াতে একদিন হঠাৎ আমার মনের মতো বাড়ি খুঁজে পেলাম। বড় রাস্তা থেকে সামান্য ভেতরে। বড় বড় গাছে ঢাকা মস্ত বাগান-ওয়ালা পুরানো আমলের ভাঙাচোরা একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। খুব নির্জন ও নিরিবিলি বাড়িটা দেখে মনে হলো। যেটা আমি মনে মনে খুবই চাইছিলাম। তাছাড়া লোকজন আছে কিনা এই বাড়িতে, বা এই বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হবে কিনা কিছুই জানতাম না। বাড়ির গায়ে কোথাও 'এই বাড়িটি ভাড়া দেওয়া হবে' বলে কোন বিজ্ঞাপন নজরে পড়লো না।

কিন্তু এই বাড়িটা দেখে মনে মনে কেমন জেদ এলো যেমন ভাবেই হোক এই বাড়িই আমাকে ভাড়া নিতে হবে। বাগানের ওক কাঠের দরজা ঠেলে আমি সোজাসুজি ভিতরে ঢুকে পড়লাম। অদ্ভুত ব্যাপার দরজাটা সশব্দে নিজের থেকে বন্ধ হয়ে গেল। বাগানে ঢুকেই মনে হলো আমি এক বিচিত্র জগতে এসে পড়েছি—বাইরের পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কোথাও মানুষের কোলাহল ট্রাম বাসের আওয়াজ, গোলমাল চীৎকার, চেঁচামেচি কোন কিছুই শোনা যায় না। চারপাশের পরিবেশটা যেন খুব শান্ত, মৌন, নিস্তব্ধতা ছড়ানো। পুরনো একটা ঝর্ণা দেখতে পেলাম। ঝর্ণা থেকে সবসময় জল ঝরছে, সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে চারপাশে, ফুলের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা মৌমাছি, প্রজাপতি। সামনের মাঠে বসবার আসনটা দেখে মনে হলো বহু পুরানো অব্যবহারের জন্যে ভেঙেও গেছে।

আমি সদর দরজা পেলাম বাগান পেরিয়ে। মনে মনে ইতস্তত করলেও সাহস করে দরজায় কড়া নাড়লাম। দেখলাম, একজন বুড়ো মানুষ এসে দরজা খুলে দিলেন।

কি বলে কথা শুরু করবো তাই ভাবতে লাগলাম। খানিক ভেবে বললাম—শুনেছিলাম এই বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হবে।

একটু রাগত গলায় ভদ্রলোক বললেন—না, এমনতো কোন কথা নেই। নিশ্চয় ভুল শুনেছেন আপনি। কি আর করি—ভাবলাম বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হলো না। হঠাৎ ভদ্রলোকের স্ত্রী ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, বলুনতো আপনি কি করে জানলেন? অবশ্য আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই এই নিয়ে। কিন্তু সত্যিই আমরা ভেবেছি আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলে যাব এই বাড়িটা ভাড়া দিয়ে। আপনি যদি ভাড়া নিতে চান তাহলে ভিতরে এসে সম্পূর্ণ বাড়িটা দেখে যান।

এইরকম প্রস্তাব শুনে আমি ভিতরে ঢুকে বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। দেখলাম বাড়িটা ভীষণ পুরানো, হাড়গোড় ওর সব বেরিয়ে গেছে। সর্বত্র ইট, কাঠ ভেঙে পড়ছে, আসবাবপত্রগুলোও খুব পুরানো,

অনেক জায়গায় ঝুল জমেছে আবার কোথায়ও কালি পড়েছে। তবুও কি জানি কেন বাড়িটা দারুণ ভালো লাগলো আমার কাছে। বললাম মনে মনে বাড়িটা আমি নেবই যেমন করেই হোক এখানে বসে পড়াশুনা দারুণ হবে। বাড়িটা খুব সুন্দর লাগলো।

সংস্কারবশে আমি না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না—আচ্ছা আপনারা বাড়িটা ছাড়তে চাইছেন কেন ?

লক্ষ্য করলাম বিরক্তির ছায়া পড়লো ভদ্রমহিলার চোখ-মুখে। তিনি নরম সুরে বললেন—সত্যি কথা বলতে কি, এই বাড়িতে আমরা আর থাকতে পারছি না। এই বাড়িতে এক রাতের বেশী থাকতে পারে না! ওদের ঘরে নানারকম অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বাড়ির একদম পিছন দিকে সেই ঘরটা! আজকাল বাড়ির মধ্যেও এ ধরনের নানাপ্রকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমার স্বামী কানে একটু খাটো বলে তিনি অনেক কিছুই শুনতে পান না। এই বাড়িটা আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ঘুমোতে পারি না সারারাত, সব সময় কাদের যেন পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই। আমাদের পক্ষে অসম্ভব ভয়ে ভয়ে এই বাড়িটায় থাকা। ভদ্রমহিলা আবার আপন মনে বলে চললেন—জানেন, এই বাড়িতে আমরা বেশীদিন আসিনি। এই বাড়িতে থাকতেন আমার স্বামীর এক দাদা। তাঁর মৃত্যুর পর আমরা এই বাড়ির মালিক হই। আমার স্বামীর কাকা বাড়ির সামনের দিকেই থাকতেন। কোনদিনই কেউ ব্যবহার করে নি পেছন দিকটা। হঠাৎই একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে চুপটি করে রইলেন ভদ্রমহিলা।

আমার মনের বাসনা পূর্ণ হলো। বাড়িটা ভাড়া নিলাম অনির্দিষ্ট কালের জন্য। দিন দুয়েকের মধ্যে বুড়ো-বুড়ি তাঁদের বাক্স বিছানা সব নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ পুরোনো জিনিস রেখে গেলেন। প্রথম দিন বাড়িটায় ঢুকে খুব আনন্দ পেলাম। সারা বাড়ি ছুটে বেড়ালাম ছোট ছেলের মতো। কোন ঘরে কি আসবাবপত্র সাজাবো

কোথায় কি মেরামত করবো এইসব প্রথম দিনেই ঠিক করে ফেললাম। তালা ঝুলানো ছিল পিছনের একমাত্র ছোট ঘরটায়। আমি তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই সমস্ত শরীরটা ভারী হয়ে উঠল। গায়ে কাঁটা দিতে লাগলো, কি রকম যেন একটা ভয় ভয় অবস্থা! মনে হলো খুব রহস্যপূর্ণ! আর এক পা গিয়েই এগোতে ইচ্ছা করলো না। এই ঘরে একটাও আসবাবপত্র ছিল না, সম্পূর্ণ ফাঁকা। ঘরটা আবার বন্ধ করে দিলাম তাড়াতাড়ি।

দোতলার দুটো ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে নিলাম আমি আর আমার সেক্রেটারী দুজনে মিলে। আমার সেক্রেটারী আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়। আমাদের কোন চাকর-বাকর ছিল না। রাত্রিটা শুধু ঘরেতে ঘুমোতাম। বাইরে হোটেলে খেয়ে এসে ঘুমোতাম বললে মিথ্যে বলা হচ্ছে কারণ আমরা দুজনেই সারারাত্রি জেগে থাকতাম, ভয়ে দুজনেই কাঠ হয়ে থাকতাম।

বেশ মনে আছে প্রথম দিনটার কথা। আমরা উপর নীচ সমস্ত ঘরের দরজা জানালা দেখেশুনে বন্ধ করে এবং সমস্ত কিছু ভালো করে দেখে নিয়ে তারপর যে যার নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। আমার মাথার ঠিক উপরেই ইলেকট্রিক আলো ছিল। তাই ভাবলাম একটা বই পড়ি। বইটা পড়ছি বেশ মেজাজে, হঠাৎ চমকে উঠলাম একটা ভারী আওয়াজ শুনে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, নীচের দরজা খুলে কে যেন ভেতরে ঢুকলো! বইপত্র বন্ধ করে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। এমন কি বাগানে একটা পাতা পড়ার শব্দও পেলাম না। অপেক্ষা করতে লাগলাম অধৈর্য হয়ে কিছু শুনবার জন্যে। খানিকক্ষণ বাদে পায়ের শব্দে চমকে উঠলাম, মনে হলো কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। প্রথম সে হলঘরে ঢুকলো তারপর আমাদের ঘরের দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে গেল। পায়ের শব্দটা ঠিক আমার ঘরের সামনে এসে থামলো। আমি কোন উপায় না

দেখে আলো জেবলে হাতে মোটা ডাণ্ডা নিয়ে দরজার সামনে অপেক্ষা করে রইলাম। ভাবলাম নিশ্চয় চোর-ডাকাত হবে। পা ফেলছে খুব সাবধানে। ঠিক আছে আমিও রেডি। হাতের ডাণ্ডাটা দেখতে লাগলাম এই কথা ভেবে। কে যেন দরজায় চাপ দিচ্ছে বুঝলাম বাইরে থেকে। হঠাৎ দরজাটা সশব্দে খুলে দিলাম। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। শুধু গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে। মনে মনে বললাম, তাহলে দস্যু ডাকাত নয়, বাঁচা গেল। পর মুহূর্তেই ভয়ে শিউরে উঠলাম, ভয়ে মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। তাহলে? বাইরের আলো জ্বালালাম। কাউকেই দেখতে পেলাম না। কিন্তু অনুভব করতে পারলাম কে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে চীৎকার করে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

বিছানায় বসে বসেই বাকী রাতটা কাটিয়ে দিলাম। কখন যে সূর্য উঠেছে, লোকজন জেগেছে সে সব দিকে আমার কোন খেয়ালই ছিল না। অনেক পরে, দিনের আলোয় সাহস করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দিনের আলোয় রাত্রির ভয় সব দূর হয়ে গেল কিন্তু রাতের ঘটনাকে আমি কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারলাম না। অন্য কেউ হলে একে মনের ভুল, বা স্বপ্ন দেখা বলে উড়িয়ে দিতে পারতো কিন্তু আমি তো সারাটা জীবন ধরেই প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছি। তাই তাড়াতাড়ি আমার সেক্রেটারী পার্কারকে ডেকে বললাম—কি হে, কাল রাতে তোমার কেমন ঘুম হলো।

পার্কার বিমর্ষ মুখে বলল—আর একদিনও এই বাড়িতে থাকবো না স্যার। থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললাম—তাহলে তুমিও কাল রাত্রে ওইসব শব্দ শুনেছ? তাহলে আমার কোন খোঁজখবর নাওনি কেন?

প্রশ্ন করলেও মনে মনে ভাবলাম, আমিই যখন ভয়ে এত কাবু হয়ে গেছি আর ও বেচারা নিশ্চয় অনেক বেশী কাবু হয়েছে। আমার চেয়েও বয়সে বড়—বড় হলে কি হবে ওর স্ত্রী আছে ছেলেমেয়ে আছে।

তাই ভয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। পার্কার আবার ভয়ে ভয়ে বললো —চলুন, স্যার, এখান থেকে আমরা চলে যাই। এই বাড়িতে নিশ্চয় ভূত আছে। এটা ভূতের বাড়ি, আর এখানে আমরা থাকবো না।

ওর কথা শুনে আমার সাহসের মাত্রাটা আরও বেড়ে গেল। বললাম—ভূত আছে জেনেই আমি এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছি, তুমি তো জান ভূত-প্রেত নিয়েই আমার চর্চা। সে যাই হোক, আমি এইখানেই থাকবো।

সেদিন রাত্রিতে আমরা সব রকম ব্যবস্থা করে ভূতের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দরজার সামনে দুটো ইজিচেয়ারে বসে সারা রাত কফি আর চা খেয়ে গল্প করে কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম। রাত দশটা পর্যন্ত কোনকিছুই টের পেলাম না। একসময় আমাদের একটু খুব ঘুমও পেল, আর ঠিক তখনই আগের দিনের মত অদৃশ্য পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতে লাগলো। আর মনে হলো সিঁড়ির আলোটা কে যেন জ্বালিয়ে দিল! পার্কার চারদিকে দেখে জোরালো গলায় বললো—এ নিশ্চয় কোন বদমাশের কাজ স্যার। আমরা দুজনেই ছুটে সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম সত্যিই আলোটা জ্বলছে। কিন্তু কাউকেই কোথাও দেখতে পেলাম না। উঁকি মেরে দেখলাম নীচের হলঘরের সমস্ত আলো জ্বলছে। আমি পার্কারের দিকে তাকিয়ে বললাম—পার্কার, আমরা তো সব আলোই নিভিয়ে দিয়েছিলাম, তাই না? তাহলে কে জ্বাললো বলতো? দৌড়ে নীচে গিয়ে দেখলাম, হলঘরের সমস্ত জানালা দরজা খোলা, সব আলো জ্বলছে। হলঘরে ঢুকতেই মনে হলো কে যেন পট্‌পট্‌ করে সব আলোগুলো নিভিয়ে দিল। তারপর কে যেন মেয়েলী কণ্ঠে ব্যঙ্গের-হাসি হেসে জানালাগুলো বন্ধ করতে লাগলো। আমরা দুজনে দৌড়ে আবার উপরে উঠে এলাম। সেদিন রাতে আর নতুন কিছুই ঘটলো না। কোনমতে রাত কেটে গেল!

পরের দিন রাতে আমি আর পার্কার খাওয়া দাওয়ার পর আলোচনায় বসলাম। কি করা যায়? পার্কার বললো ভূতটুত সব বাজে কথা

স্যার, আমার মনে হয় কোন পাজী লোকের কাজ এসব। আমাদের এই বাড়ি থেকে তাড়ানোর জন্য এইসব ভয় দেখাচ্ছে। তাছাড়া ভূত কখনো আলো জ্বালতে পারে? যার জন্যে আমি আজ একটা ভালো জাতের কুকুর এনে রেখেছি। আজ সব বদমায়েশি ধরতে পারবে।

আমি বললাম—ভূত না হয় আলো জ্বালাতে পারে না কিন্তু সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজটা কিসের?

পার্কার আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল—আমরা তো ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি ভুতের কোন দেহ নেই—ও অদৃশ্য তাহলে পায়ের আওয়াজ হয় কি করে।

পরামর্শ সেরে বাড়িতে ঢুকতেই কুকুরের চীৎকার শুনতে পেলাম। কুকুরটা পার্কারের ঘরে বাঁধা ছিল, চীৎকার শুনে মনে হলো কুকুরটা ভয়ে চীৎকার করছে। আমাদের দেখে ওর যেন সাহস ফিরে এলো। কুকুরটাকে নিয়ে আমরা দুজনে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে দেখলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কুকুরটা কিছুতেই বন্ধ ঘরটার সামনে গেল না, বরং একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে গোঙাতে লাগলো। ওর গায়ের সমস্ত লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। ভয়ে কুকুরটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো। ওর অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাই কুকুরটাকে সঙ্গে করে উপরে উঠে এলাম। একটু পরেই কুকুরটা কেমন নেতিয়ে পড়লো। তার পরেই শুনতে পেলাম কে যেন নীচ থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। ক্রমশ পায়ের আওয়াজ ভারী হয়ে এলো। আমি আর পার্কার দু'জনে ভয়ে জড়াজড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পায়ের শব্দের সঙ্গে গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম—এত রাতে আপনারা কি করছেন বলুন তো?

তাকিয়ে দেখলাম রাতের পাহারাওলা পুলিস। পুলিস দেখে আমাদের ধড়ে প্রাণ এল! পুলিস দেখলে যে এত আনন্দ হয় তা আমি এর আগে কোনদিনই বুঝতে পারিনি! পুলিসমশায় আমাদের উপর ভীষণ চটেছিল, তাই বলতে শুরু করলো—কি ব্যাপার বলুনতো আপনাদের! এই

পাঁচ মিনিট আগে দেখলাম বাড়ির সদর দরজা, জানলা সব বন্ধ। আলো জ্বলছে না। আর এখন দেখছি সদর দরজা হাপাট করে খোলা, সমস্ত বাড়িতে আলো জ্বলছে। বাগানে এসে শুনলাম কুকুরটা কাঁদছে, তাই সোজা উপরে উঠে এলাম। অবাক লাগছে!—এই মাঝরাতে কেউ বাড়ির সমস্ত দরজা জানলা খুলে রাখে? কেন বন্ধ করে দেননি আপনারা? কি হয়েছে?

আমি আর পার্কার দুজনেই বললাম—আমরা খুব ভাল করে সমস্ত দরজা খিল দিয়ে এঁটে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তাই কি করে যে খুলল, আমরা তা জানি না। পুলিস আমাদের কথা শুনে বললো—নিশ্চয় এই বাড়িতে একদল বদমাশ লোক ঢুকেছে, আপনারা আমার সঙ্গে চলুন আমি সারা বাড়ি তল্লাস করবো। কি করবো আমরা! সত্যিই তো বাড়ির সমস্ত দরজা-জানলা খুলে হাঁ করে রয়েছে, গোটা বাড়িতে আলো জ্বলছে। তাই কিছু না বলে পুলিসমশায়কে সঙ্গে নিয়ে সারা বাড়ি টহল দিলাম। কিন্তু কুকুরটা আর উঠল না। ও শুয়ে পড়ে সমানে হাঁপাতে লাগলো। আমরা সারা বাড়ি খুঁজে কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। এতে পুলিসের সন্দেহ বাড়লো। আমাদের নাম-ধাম টুকে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু সেদিন থেকে প্রায় বেশ কয়েক রাত আমাদের কোন অঘটন ঘটলো না।

প্রায় পাঁচ-ছয় দিন বাদে আমার এক পুরনো বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। এই বাড়ি দেখে অবাক হয়ে বললে—এই বাড়িতে তুমি আছ কি করে? এটা তো ভূতের বাড়ি। আমি বললাম—তুমি জানলে কি করে যে এইটা ভূতের বাড়ি?

আমার বন্ধুটি বলল—কয়েক বছর আগে আমার এক মেসোমশাই এই বাড়িতে কয়েক দিন ছিলেন। তাতেই টের পেয়েছিলাম এইটা নির্ঘাৎ ভূতের বাড়ি। ঠিক আছে তুমি একটা প্রমাণ দেখ। একটা সাদা কাগজ খামে ভরে তোমার টেবিলের দেরাজে রেখে দাও।

বন্ধুর কথামতো আমি একটা সাদা কাগজ রেখে দিলাম। প্রায়

মাসখানেক বাদে একদিন আমার বাড়িতে বন্ধুদের ডিনার দিলাম। নানান গল্পের মধ্যে এই বাড়িটায় যে ভূত আছে তার কথা উঠলো। তখনই বন্ধুরা সবাই মিলে প্ল্যানচেট শুরু করলেন। প্ল্যানচেট টেবিল তিন মিনিটের মধ্যেই এক অশান্ত আত্মা উপস্থিত হলো। একটা কাগজে লেখা ফুটে উঠল—আমি কার্ল ক্লিট, এই বাড়িতে আগে আমিই থাকতাম। এর চেয়ে বেশী কিছু জানতে চাও তো নীচের বন্ধ-ঘরে সবাই চলে এসো।

আমরা সবাই মিলে নীচের বন্ধ ঘরটায় এসে বসলাম। একটা মোমবাতি জেবলে ধ্যানে বসলাম। আবার শুনতে পেলাম, অশরীরী আত্মাটা বলে চলেছে—আমি কার্ল ক্লিট। এই ঘরে আমি আমার পিসতুতো ভাই আর্থার লিডেলকে খুন করে পুঁতে রেখেছিলাম।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার আত্মার শান্তির জন্যে আমরা কিছু করব কি? আপনি বলুন।

প্রথমটায় কোন উত্তর পেলাম না। অনেকক্ষণ পরে বিরক্ত হয়ে লিখল—দয়া করে এই বাড়িটা ছেড়ে দাও, তাহলেই আমার শান্তি হবে। এতদিন আমি যে একটা সাদা কাগজ খামে ভরে দেরাজে রেখে দিয়েছিলাম তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তাই মনে হতেই তাড়াতাড়ি গিয়ে টেবিলের দেরাজটা খুলে খামে ভরা সাদা কাগজটা বের করে দেখলাম, তাতেও একই কথা লেখা আছে। 'দয়া করে এই বাড়িটা ছেড়ে দাও, তাহলেই আমার শান্তি হবে। পরের দিন আমি বাড়ির পুরানো সব দলিল-পত্র খুঁজে দেখতে লাগলাম। দেখলাম, সত্যিই ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে এ-বাড়িতে কার্ল ক্লিট নামে এক-জার্মান ডাক্তার ও তার স্ত্রী শার্লেট বাস করতো। আর মাঝে মাঝে ডাক্তারের এক আত্মীয় আর্থার লিডেল নামে এক যুবক এই বাড়িতে এসে থাকতো। কিন্তু একদিন রাত্রে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর কিছুদিন পরে কার্ল ও শার্লেট এই বাড়ি ছেড়ে জার্মানিতে চলে গিয়েছিল।

দলিল-পত্র দেখে-শুনে আমার মনের অদম্য ইচ্ছাটা আরও বেড়ে গেল। ভাবলাম, যেমন করেই হোক এই কার্ল, শার্লেট ও লিডেলের গোপন রহস্যটা জানতে হবে। এবং ওদের আত্মার শান্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জানি, ওরা যতদিন জীবিত মানুষের কাছে ওদের গোপন রহস্যের কথা না বলবে ততদিন ওরা মুক্তি পাবে না। তাই আমি বন্ধ ঘরটাতে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করলাম, ঘরটা চুনকাম করলাম, টেবিল, চেয়ার পাতলাম। তারপর আমার বন্ধুদের সব খবর দিয়ে তাদের আসতে বললাম। সন্ধ্যা হবার আগেই তারা এক অন্ধ মিডিয়ামকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসে হাজির হলেন।

আমরা সবাই মিলে সিয়ান্সে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজার সামনে একটা ছায়া দেখতে পেলাম। আস্তে আস্তে ছায়াটা একটা মানুষের মূর্তি ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। মূর্তিটার মুখ শুকনো, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, খোঁচা দাড়ি, সব মিলিয়ে দেখে মনে হলো শীর্ণকায় এক যুবক। আমি বুঝলাম, এ নিশ্চয় কার্ল ক্লিট। খুব করুণ দেখাচ্ছিল ওকে।

আমি বললাম—আমি আপনার প্রতিবেশী। আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে চাই। আপনি কিছু বলুন।

ছায়ামূর্তিটি উত্তর করলো—না আমি এইসব চাই না। তুমি এখান থেকে চলে গেলে বাঁচি। তোমাকে তাড়াবার জন্যে আমি এত চেষ্টা করছি। তবু যাচ্ছ না কেন।

এর উত্তরে আমি বললাম—বহু বছর তো এই বাড়িতে কাটালেন একা একা। এখন কোন বন্ধু পেতে ইচ্ছা করে না?

আমার কথা শুনে মনে হলো কার্ল বেশ খুশী হয়েছে। হতাশ গলায় বলল—আমি তো এই বাড়ি ছেড়ে কোনদিন কোথাও যেতে পারব না। এখানে আমি চিরকালের মত বাঁধা।

জিজ্ঞাসা করলাম, লিডেলকে খুন করতে গেলেন কেন? এইবার দেখলাম কার্ল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বলল—ওই শয়তানটাই

তো আমাদের জীবনের শনি। ওর আসার আগে আমি আর শার্লেট কত সুখেই না ঘর-সংসার করেছি। খুব শান্তিতে ছিলাম। এই লিডেলটা দেশে কুকাজ করে আমার এখানে আশ্রয় নিল। দয়া করে আমি ওকে থাকতে দিলাম। আর ও কি করলো?—আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বদমায়শি করতে চাইত। ওকে জ্বালাতন করতো। শার্লেট অশান্তির ভয়ে প্রথমে এসব কথা আমাকে বলতো না। একদিন লিডেল ওকে চরম অপমান করল যার জন্যে ও কাঁদতে কাঁদতে আমাকে এসে সব কথা বললে। শুনে আমি ক্রোধে পাগল হয়ে গেলাম। ছুটে গিয়ে ওকে খুন করলাম। তারপর ওর মৃতদেহটা এই ঘরের নীচে পুঁতে রেখেছি। এই ঘটনার পর থেকে শার্লেট চিন্তাভাবনায় দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগল। বছরখানেক মধ্যেই ও মারা গেল। ওর মৃত্যুর পর আমি একা একা থাকতে পারলাম না। আমি আত্মহত্যা করি। তুমি যে ঘরে আছ সেই ঘরেতেই আমি আত্মহত্যা করি। এরপর থেকে আমরা বেশ সুখেই এই বাড়িতে বসবাস করছি। শুধু মাঝে মধ্যে লিডেল এসে আমাদের সুখের সংসার ভেঙ্গে দিয়ে যায়। এইভাবেই চলে যাচ্ছে বছরের পর বছর। আমরা ছাড়া এই বাড়িতে আর কারোকে থাকতে দিই না। কিন্তু তোমাদের মতো কেউ এসে থাকলে তাকে আমি কিছুতেই তাড়াতে পারি না, তা তুমি যদি সত্যিই আমাদের মতো দুটি আত্মাকে শান্তি দিতে চাও তাহলে এখানে আর থেক না। এই ঘরে একটা টেবিল, দুটো চেয়ার রেখে যাও। আর সন্ধ্যার পর নীচের তলার এদিকটায় তোমরা কেউ এসো না।

এই কথা শোনার পর থেকে আমি সেইমত সব ব্যবস্থা করলাম। যার জন্যে যে কদিন আমরা এই বাড়িতে ছিলাম আর কোন গোলমাল হয়নি। এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগের দিন স্বপ্ন দেখলাম, কার্ল আর শার্লেট হাত ধরাধরি করে আমার বিছানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের মুখগুলো দেখে মনে হচ্ছে ওরা ভীষণ খুশী। বললাম—কাল সকালে আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। আপনাদের সহযোগিতা পেয়েছি

যথেষ্ট। আমার কৃতজ্ঞতা জানবেন।

কার্ল ম্লান হেসে আমার কথার উত্তর দিল—তোমার মতো বন্ধু আমি জীবিত অবস্থায় পাইনি। শুধু কতকগুলো অকৃতজ্ঞের দেখা পেয়েছি। আমরাও তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। যাবার আগে বন্ধু আর একটা উপকার করে যাও। এই ঘরের কোণে আমার আঁকা শার্লটের একটা ছবি আছে। তুমি ছবিটা কাল পুড়িয়ে ফেলো। আর ঐ ঘরটা ভেঙে ফেলতে পার কিনা একবার চেষ্টা করে দেখ। আর যেদিন তুমি আমাদের জগতে আসবে সেদিন এই অকৃত্রিম বন্ধু দুটি তোমাকে সাদরে গ্রহণ করবে জেনো।

যাবার দিন সকালে ঘরের কোণে সুন্দরী রমণী শার্লটের বিবর্ণ ছবিটা দেখতে পেলাম। সেটা তখনই পুড়িয়ে ফেললাম। তারপর বাড়িওয়ালাকে না জানিয়েই আগে সে ছোট ঘরটা ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করলাম। তারপর সব কথা বাড়িওয়ালাকে জানালাম।

* * *

আমার মনে হয় এই গল্প পড়ে পাঠকরা নিশ্চয় বাড়িটা ঠিক কোথায় কত নম্বর জানতে চাইবেন। আগেই ক্ষমা চেয়ে বলছি—আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ বাড়িওয়ালা আমাকে শাসিয়ে দিয়েছেন, বাড়ির ঠিকানা জানলেই আমার নামে মামলা করবেন। অতএব বুঝতে পারছেন···

———

ক্যাথারিন ক্রো

আমার কাহিনী বলতে হলে শুরু করতে হবে তিন শ বছর আগে থেকে।

আমাদের পরিবার নিঃসন্দেহে বহু প্রাচীনত্বের দাবিদার। একাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত খুব একটা সম্পদ আমাদের পরিবারে ছিল না। কিন্তু এই সময় আমদের কৃপণ স্বভাবের এক বংশধর নিজ স্বভাব গুণে ও প্রভাবে পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধি করলেন। অর্থের জন্যই তিনি অর্থকে ভালবাসতেন।

মেঝেতে ও দেওয়ালে লুকানো থাকত লোহার সিন্দুক। কিন্তু একদিন তিনি বুঝতে পারলেন যে তার দু'হাজার পাউণ্ড খোয়া গেছে। এ টাকাটা তার সম্পত্তির তুলনায় খুবই সামান্য, তবু তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। অপরাধীকে ধরার উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ি থেকে লোকটির দোকানে পেঁাছে দেখলেন যে শয্যাশায়ী, তার মৃত্যু আসন্ন। তার বন্ধুরা ও ডাক্তার শপথ করে জানাল কাউণ্টের বাড়ির কাজ শেষ করে যেদিন সে

বাড়ি ফিরেছে সেইদিনই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

পরদিনই লোকটির মৃত্যু হয় এবং তার সমাধিও হয়। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল দুই চাকরের উপর। তিনি তাদের ছাড়িয়ে দিলেন, এবং নতুন কোন চাকর রাখলেন না। চোর যেই হোক সে যতখানি দক্ষতার পরিচয় রেখেছে সেকথা ভেবে তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন। কাজেই তিনি স্থির করলেন আর চাকর রাখবেন না। পাশের একটা খাবার দোকান থেকে নিজের খাবারটা আনিয়ে নেবেন। বাইরে শান্ত ভাব দেখালেও এই ক্ষতি তার মনের উপর চেপে বসল, তার মনে মহা অশান্তি বাসা বাঁধল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি তার বোনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। বোন লিখেছেন, তার স্বামী মারা গেছে; এ অবস্থায় তার একমাত্র ছেলে কোন ব্যবসায়ে ঢুকুক এটাই তাঁর ইচ্ছা, তিনি ছেলেকে ফ্লোরেন্সে পাঠাচ্ছেন; দাদা যেন যে টাকা সে সঙ্গে নিয়ে যাবে যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করবেন।

যুবকটি ধনী মামার বাড়ীতে হাজির হল। তার মা ও বোন খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে; তাদের যৎসামান্য যা কিছু ছিল সবই এই প্রচেষ্টায় বিনিয়োগ করছে; তাদের আশা, আত্মীয়টির সহায়তায় তাদের এই ত্যাগ একদিন পরিপূর্ণ হয়ে ফিরে আসবে।

আর্থার অ্যালেন ছিল খোলা মনের একটি চমৎকার ছেলে। সে ভাল ভাবে মানুষ হয়েছে, লেখাপড়াও ভালই শিখেছে। মায়ের চেষ্টায় সে ইতালীয় ও ইংরেজি ভাষা শিখেছিল।

যে ভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হল তাতেই তার প্রত্যাশায় অনেকখানি ভাটা পড়ল। মামার কঠিন, ধূসর চোখে ও কুঞ্চিত মুখে স্মিত হাসির একটা রেখাও সে দেখতে পেল না। সে তাড়াতাড়ি মামাকে প্রকৃত অবস্থা বোঝাতে জানিয়ে দিল যে সে দু'হাজার পাউণ্ড সঙ্গে করে এনেছে।

আর্থার পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে টাকার থলি নিয়ে হাজির হল।

টাকা পয়সা গুণে গেঁথে পরীক্ষা করে বুড়োর লোহার সিন্দুকে রাখা হল। তিনি অতিথিকে নিয়ে খাবার টেবিলে বসলেন। কিন্তু এক বোতল পুরনো ল্যাক্রিমা কিস্তি ছিল, যুবক প্রথম গ্লাসটি ঢালবার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল মুখটা বেঁকে গেল—আর শরীরটা শক্ত হয়ে গেল।

স্মৃতিকথায় লিখেছেন বুড়ো, গলার শব্দটা শুনেই বুঝতে পারলাম কি হয়েছে; পাছে ডিনারের জিনিসপত্র নিয়ে এসে চাকরটা যে কুঠুরিটা থেকে আমার দু'হাজার পাউন্ড চুরি গিয়েছিল। সেটা খুলে মদের বোতলটা সমেত দেহটাকেও তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। তালা বন্ধ করে দুটো পেরেক ঠুকে দিলাম। তারপর আমার ডিনার শেষ করতে বসে গেলাম।

পরদিন পর্যন্ত ভালয় ভালয় কাটল। আমার দু'হাজার পাউন্ড বার বার গুণলাম—সেটা হাতাতে পারার জন্য আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম। বোনকে চিঠি লিখে দিলাম যে তার ছেলে এসে পেঁছয় নি; এসে পেঁছিলে সাধ্যমত সাহায্য করব।

'হ্যাঁ, এ পর্যন্ত বেশ তাই ছিল; কিন্তু পরদিন ডিনারে আমি যেই বসতে যাই, অমনি সেই অনাহূত অতিথি ঘরে ঢুকে আমার বিপরীত দিকের চেয়ারটায় বসে। বাড়িতে ডিনার খাওয়া ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তাতেও কোন তফাৎ হল না; যেখানে খেতে বসি সে সেখানেই এসে বসে পড়ে! আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। ক্ষিদে চলে গেল, অকালে শুকিয়ে মরতে চললাম। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফ্রা গিসেপ্পের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি অনুতাপ করতে বললেন, টাকাটা ফিরিয়ে দিতে বললেন। ভাবলাম টাকাটা যদি আর কাউকে দিতে পারি তাহলে হয় তো মুক্তি পাব। কাজেই একটা সুবিধাজনক লেনদেনের খোঁজ করতে লাগলাম। শুনলাম বার্তোলোমিউ মালিফ খুব অর্থ কষ্টে পড়েছে তখন তার কাছেই প্রস্তাব দিলাম—তার জমিটার জন্য আমি নগদ দু'হাজার পাউন্ড দাম দিতে রাজী আছি।

আমরা চুক্তি পত্রে সই করলাম, তারপর বাড়ি ফিরে যে ঘরে টাকাটা ছিল সে ঘরের দরজাটা খুললাম ; কিন্তু এ কি! যে সিন্দুকের মধ্যে টাকাটা তালাবন্ধ আছে তার উপরে যে সেই বসে আছে ; তাই টাকাটা নিতে পারলাম না। অগত্যা বাধ্য হয়ে অন্য টাকা দিয়ে জমিটা কিনতে হল।

বন্ধু গিসেপ্সের সঙ্গে আবার পরামর্শ করলাম ; সে বলল টাকাটা ফিরিয়ে না দিলে কিছুই হবে না। নিজেকে বোঝালাম, বললাম, "আমি যদি টাকাটা নিয়ে ইংলণ্ডে যাই তো কি হয় ?" সে মাথা নোয়াল।

বুড়ো সিন্দুক থেকে টাকাটা নিয়ে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। স্বামী জীবিত থাকতে তার বোন যে বাড়িতে থাকতেন তখনও মেয়েকে নিয়ে সেই বাড়িতে ছিলেন। বাড়িটার উপর তাদের মায়াও পড়েছিল ; আশা করেছিলেন, ছেলের ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি হলেই সে বাড়িটা রাখতে পারবেন। বাড়িটা ছোট ; সামনে ফুলের বাগান ; মা-মেয়েতেই বাগানের পরিচর্যা করেন। পাশেই ছিল গ্রামের গির্জা ; গির্জার উঠোনটা বাগানের একেবারে গায়ে। আর্থারের পেঁছান সংবাদ না পেয়ে দুজনেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। এদিকে বুড়ো যখন স্বয়ং হাজির হয়ে জানালেন যে আর্থারের সঙ্গে তার দেখাই হয় নি, তখন তাদের দুঃখ ও যন্ত্রণার আর শেষ রইল না। তারা বুঝতে পারল ছেলেটি নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে।

ভ্রমণে বের হবার পর থেকে বুড়ো সেই ভয়ংকর অতিথির সঙ্গ থেকে অব্যাহতি পেলেন, তার শরীরও একটু করে ভাল হতে লাগল। তিনি ভাবতে লাগলেন, কেমন করে এই ভূতকে ঠকানো যায়। কিন্তু এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে সেই টাকাটার নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি শংকিত হয়ে উঠলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, যখনই মালপত্র স্থানান্তরিত করেন তখনই তার সঙ্গের একটা ভারী সিন্দুকের ওজন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এখানে পেঁছিবার পরে দুটি কুলিকে ডাকা হল ; সেই সময় তিনি এমন কিছু মন্তব্য শুনতে পান যাতে তার মনে

হল যে সিন্দুকের মধ্যে কি আছে সে সম্পর্কে তারা একটি সঠিক অনুমান করতে পেরেছে। পরবর্তী সময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে সেই লোক দুটি সন্দেহজনকভাবে বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে।

একদিন সকালে তাকে তার বিছানায় নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তার সিন্দুকটাও লুট হয়ে যায়। পরিবারের মা, মেয়ে ও একটি চাকরকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়; তারা নিজেদের নির্দোষ বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ড হয়।

আর্থার অ্যালেনের পরিবার নির্বংশ হয়ে যাওয়ায় জাকোপোর ভ্রাতুষ্পুত্র জনৈক কপর্দহীন সৈনিক তার উপাধি ও জমিদারির উত্তরাধিকারী হয়, এবং ঘটনার পূর্ণ বিবরণসম্বলিত স্মৃতিকথাটি ইতালীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হারানো দু'হাজার পাউণ্ডের অনেক খোঁজ করা হয়, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মেলে না। পরবর্তীকালে বুড়ো ইংলণ্ডে পেঁছলে যে দুটি লোক সিন্দুকটা বাড়ির মধ্যে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই একজন কিছু ইতালীয় সোনা ও একটা হীরের আংটি বিক্রী করতে গিয়ে ধরা পড়ে। জানা যায় যে জাকোপোই ঐ আংটিটা পরতেন। ফলে তদন্ত শুরু হয় এবং লোকটি স্বীকার করে যে সে ও তার সঙ্গীই বুড়োকে খুন করেছিল। এইভাবে মহিলা দুটি খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার দায় থেকে অব্যাহতি পায়। সে লোকটি কিন্তু আরও বলে যে সিন্দুকের কোন জিনিস তারা লুট করতে পারে নি, কারণ তারা সেটা খুলতেই পারে নি; চাবির খোঁজ পাবার আগেই একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে তাদের দুজনকে তাড়া করে। তারা সিন্দুকটাকে বয়ে নিয়ে যেতেও ভয় পায়; কারণ অত বড় সিন্দুকটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কাজেই বুড়ো লোকটির কাছে খুচরো টাকা-পয়সা যা ছিল এবং তার গায়ে যেসব হীরে-মুক্তো ছিল তারা কেবল সেইগুলিই লুট করেছিল। কিন্তু জানা গেল যে তার

সঙ্গী নিখোঁজ হয়ে গেছে এবং সেই ঘটনার পরেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

ব্যাপারটা প্রায় আড়াই শতাব্দী ধরে সেখানেই থেমে ছিল। জাকোপো ফেরাল্‌দির জন্য কেউ শোক করল না, আলেন পরিবারের দুর্ভাগ্য নিয়েও কেউ মাথা ঘামাল না।

আমার যখন জন্ম হল তখন আমার বাবা সেই পুরনো প্রাসাদেই বাস করতেন, আর আমাদের আর্থিক অবস্থাও তখন মোটামুটি ভাল। সেই বাড়িতেই আমার জন্ম হয়। মনে আছে, যে ঘরের মেঝের নীচেকার গোপন কুঠুরিতে জাকোপো তার অতিথিকে কবর দিয়েছিল, ছেলেবেলায় সেই ঘরটা সম্পর্কে আমার মনে অনেক কৌতূহল ছিল। অতিথির মৃত-দেহটা সেখানেই পাওয়া যায় এবং খ্রীস্টীয় বিধি অনুসারে তাকে কবরও দেওয়া হয়। কিন্তু কুঠুরিটা তখনও ছিল, আর ভুতুড়ে ঘর হিসাবে ঘরটাকে বন্ধ করে রাখা ছিল। আমি কখনও অসাধারণ কিছু চোখে দেখিনি, কিন্তু রাতেরবেলায় মাঝে মাঝে সে ঘর থেকে যে ভয়ার্ত আর্তনাদ ও গোঙানির শব্দ ভেসে আসত। সে শব্দকে থামাবার জন্য দরজার সামনে দেওয়াল গেঁথে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতে ফল তো কিছু হলই না। তাই অশান্ত আত্মাকে তুষ্ট করতে দেওয়ালটা ভেঙে দেওয়া হল।

এবার আমার নিজের কথায় আসছি। কয়েক বছর হল রাজনৈতিক কারণে আমি সপরিবারে ইতালি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। সঙ্গে করে নিয়ে আসা কিছু নগদ টাকা ছাড়া আর কোন সম্বলই আমার ছিল না। কোনরকম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার আগে একজন ভাগ্যবিড়ম্বিত বিদেশীকে যে কতরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আমার যৎসামান্য সম্বল ফুরিয়ে গেল, এবং প্রায়ই আমাকে আর তার চাইতেও দুঃখের আমার স্ত্রী-পুত্রকেও অনাহারে থাকতে হত, এবং জীবনের অত্যাবশ্যকীয় জিনিস-গুলির জন্য দেশের কোন সমৃদ্ধতর মানুষের কাছে ঋণ করতে হত; ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়লাম; আমি যদি একলা হতাম তাহলে যে কি করে

বসতাম তা নিজেই জানি না ; একটা পরিবার আমার উপর নির্ভর করে আছে ; কাজেই অসুবিধা যত বড়ই হোক তার সামনে ভেঙে পড়লে তো আমার চলবে না।

"একদিন রাতে সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারের একজন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে গান করেছিলাম ; সেখানে একটি যুবক আমার গানের খুব প্রশংসা করলেন। মনে হল যুবকটি ইতালীয় সঙ্গীত খুব ভালবাসেন, আর বোঝেনও। প্রথমত, সেই আসরে উপস্থিত হতে পারাটাই আমার পক্ষে সৌভাগ্যসূচক, কারণ গৃহস্বামী ছিলেন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ; আমার একজন পরিচিত গায়ক সিনর এ-কেই সেখানে গান গাইতে ডাকা হয়েছিল ; শেষ মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনিই একখানা পরিচয়-পত্র দিয়ে আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন।"

"জানতাম সে রাতের কাজের জন্য আমি ভাল টাকাই পাব, তবু টাকাটা যদি সেই রাতের পাওয়া যেত তাহলে প্রত্যাশিত টাকার অর্ধেক হলেও টাকাটা আমি সানন্দেই হাত পেতে নিতাম, কারণ আমাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় সেদিন ছিল সম্পূর্ণ নিঃশেষিত ; পরের দিনের জন্য প্রাতরাশ কিনবার মত ছ'টা পেনিও তখন আমার হাতে ছিল না। আমার পিছনে বড় হলের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল ; আমিও পথে এসে দাঁড়ালাম ; একদিকে বিলাসের উজ্জ্বলতা, অন্যদিকে সবরকম নিঃস্বতাকে নিয়ে আমি একা, এই বৈপরীত্য আমাকে নির্মমভাবে আঘাত করল, কারণ একদিন আমিও ধনী ছিলাম, আলোকোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদে বাস করতাম, একদল তকমাধারী ভৃত্য আমার হুকুম তামিল করত, সুমধুর সঙ্গীত আমার ঘরে-ঘরে প্রতিধ্বনিত হত ; বেপরোয়া হয়ে উঠলাম, টুপিটাকে চোখের উপর টেনে দিয়ে স্কোয়ারের মধ্যে পায়চারি করতে করতে এই দুঃখের হাত থেকে স্বস্তিলাভ অথবা পলায়নের যত সব উদ্ভট ফন্দি আঁটতে লাগলাম। নিশ্চয়ই আমি খুব পাগলা হয়ে উঠেছিলাম, কারণ আপনারা তো জানেন ইতালীয়দের অঙ্গভঙ্গী করার অভ্যাস আছে, আর আমিও হয়তো চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পাও নাড়ছিলাম ; তাই হয় তো অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছিল

আমার উপর। কিন্তু নিজের চিন্তায় আমি এতই ডুবে ছিলাম যে সে খেয়ালই আমার ছিল না, এমন সময় একটি কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠলাম ঃ "সিনর ফেরালদি, এই শীতের রাতে আপনি এখনও এখানে! আপনার গলাটার জন্যও কি ভয় নেই—ও গলার যে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া উচিত!"

"উদ্ধত গলায় বললাম, 'কিসের জন্য?' এ গলা তো আমাকে খাওয়াবে না।" তাকিয়ে দেখলাম, লর্ড-এর বাড়িতে যে যুবকটি আমার গানের প্রশংসা করেছিলেন এ তিনিই। টুপিটা খুলে তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হতেই তিনি আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

"বললেন, ক্ষমা করবেন; আসুন না, একসঙ্গেই হাঁটা যাক।" একটু থেমে ক্ষমা পাওয়ার ভঙ্গীতে বললেন "মনে হচ্ছে, আপনি এদেশে নির্বাসিত।"

'তাই', আমি বললাম।

তিনি বলতে লাগলেন, "আমার ধারণা স্বেচ্ছায় যে গোপন কথা আপনি আমাকে বলতেন না, আপনাকে চমকে দিয়ে সেই কথাটিই আমি জেনে ফেলেছি। আপনারা যখন দেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হন তখন যে আপনাদের কত কষ্ট সইতে হয় তা আমি জানি। তাই আপনাকে মিনতি করে বলছি, আপনাকে যদি মন খুলে সব কথা জানাতে বলি তাহলে আমাকে সুবিনীত বলে মনে করবেন না।"

"সেই মুহূর্তে এই নতুন বন্ধুটির অনুরোধ রক্ষা করতে আমি কোন রকম ইতস্তত করলাম না—সব কথাই তাকে বললাম—আরও জানালাম, একদিন আমি নিশ্চয়ই নাম করতে পারব, আর তখন যে নিজের পথ নিজেই করে নিতে পারবে সে সম্পর্কেও আমার কোন আশংকা নেই; কিন্তু তার আগে এখনই যে আমরা অনাহারের মুখোমুখি এসে

দাঁড়িয়েছি।”

কথা বলতে বলতে আমরা স্কোয়ারের চারিদিকে হাঁটতে লাগলাম ; যুবকটি সেখানেই থাকতেন।

তার দরজা থেকে বিদায় নেবার আগে তিনি আমার হাতে একটা উপহার তুলে দিলেন ; আমি ওটাকে উপহারই বলছি, কারণ তার সে দান যে আমি কোনদিন ফিরিয়ে দিতে পারব একথা মনে করার কোন কারণই তার ছিল না ; তিনি বললেন, তাকে গান শেখাবার জন্য আমি যে পারিশ্রমিক পাব এই দশ গিনি তারই অগ্রিম ; তার প্রথম কিস্তির টাকাটা পরদিন আমাকে দেওয়া হবে।

হাল্কা মনে বাড়ি ফিরলাম। পরদিন সকালে সেই ছাত্র বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করলাম ; যেমনটি আশা করেছিলাম, ছাত্র হিসেবে যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা তার মধ্যে লক্ষ্য করলাম। তিনি খোলাখুলিভাবেই জানালেন, এখানকার শৌখিন সমাজে তার বিশেষ কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই, কারণ তারা হঠাৎ বড়লোক হয়েছেন ; তবে তার দুটি বোন আছে ; তার মতই গান ভালবাসে ; শীঘ্রই তারা লণ্ডনে আসবে এবং আমার কাছে গান শিখবে।

এই প্রথম ‘আমার জীবনে একটা শুভ ঘটনা ঘটল, আর সে শুভ সূচনা পূর্ণ হতেও দেরী হল না। পরিবারের সকলে লণ্ডনে এলে তাঁদের কাছ থেকে আমি খুবই সদয় ব্যবহার পেলাম। তাদের গান শেখাতাম, তাদের আসরে গান করতাম, সুযোগ পেলেই তারা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আমার নাম সুপারিশ করত।

আমার নতুন বন্ধুটির নাম ছিল গ্রেটহেড ; আমার জন্য একটা মতলব তাদের মাথায় এল ; সেই মতলব মতই তারা আমাকে চলতে পরামর্শ দিল। তারা বলল, দেশে তাদের একটা বাড়ি আছে ; তার আশেপাশে আরও অনেক বাড়ি-ঘর ও লোকজন আছে ; আসলে বাড়িটা গরম জলের একটা বড় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছে অবস্থিত। গ্রীষ্মের

কয়েকটা মাস যদি আমি সেখানে গিয়ে থাকি তাহলে গান শেখাবার প্রচুর সুযোগ পাব ; তারা আরও বলল, 'কি জানেন, এখানকার তুলনায় সেখানে আমরা আরও অনেক বড়লোক ; সেখানে আমাদের প্রশংসা-পত্র অনেক বেশী কাজ হবে।

"বন্ধুদের পরামর্শ মতই কাজ করলাম। তারা লণ্ডন থেকে চলে যাবার কিছুদিন পরেই আমি সাল্টন-এ গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হলাম, তাদের জায়গাটার নাম সাল্টন। সামান্য কিছু টাকা দিয়ে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের শহরেই রেখে এসেছিলাম ; কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের নিয়ে আসতে ব্যগ্র হয়ে পড়লাম। পরদিন সকালেই একটা বাসা খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম, এবং সেখানকার অধিবাসী ও আগন্তুক-দের কাছে আমার সেখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা জানাতে চেষ্টা করলাম। সে সব কাজ শেষ করে পথের নির্দেশ দিয়ে আমার পরিবারকে চিঠি লিখে সাল্টনে ফিরে গেলাম।

"বাড়িটা আধুনিক ; অনেকটা জমির উপর বাড়ি, জানালার নীচেই সুন্দর একটা ঘাসে ঢাকা মাঠ, একটা মনোরম ধ্বংসস্তূপ, কলস্বনা ছোট নদী, চমৎকার ফুলের বাগান। প্রাতঃরাশে বসে যে দৃশ্য দেখতে পেলাম তার চাইতে ভাল দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না। একটি মনোরম সুন্দর ইংরেজ পরিবারে বাস করার সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা ; কি বাড়ির ভিতরে, কি বাইরে, আমার সব প্রত্যাশা একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। প্রাতঃরাশের পরে মিঃ গ্রেটহেড ও তার ছেলে আমাকে অনুরোধ করল তাদের সঙ্গে বাড়ির চারদিকটা একবার ঘুরে দেখতে, কারণ বাড়িটার কিছু অদল-বদল করার কথা তারা ভাবছেন।

"মিঃ জি, বললেন, অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে এই ছোট নদীটির পথও আমরা ঘুরিয়ে দিতে চাই , নদীটির নতুন পথে যে গাছপালার পুরনো বেড়াটা পড়েছে সেটার প্রতি আমার স্ত্রীর একটা অদ্ভুত টান আছে, সে কিছুতেই ওটাকে ভেঙে ফেলতে দেবে না।"

"আমার মনে হল, উল্লিখিত বেড়াটা যেভাবে ফুল-বাগানের দুটো দিককে ঘিরে আছে সেটা কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছে।"

"আমি বললাম, কেন! এই বেড়াটার প্রতি মিসেস গ্রেটহেডের কিসের এত আকর্ষণ?"

'কেন? এটা অনেক দিনের পুরনো; আগে তো এটাই গির্জার প্রাঙ্গণের সীমানা ছিল; ওই যেসব ধ্বংসস্তূপ দেখছেন ওখানেই ছিল গ্রামের গির্জা; আমার তো মনে হয়, কবরখানার উর্বরা মাটি পেয়েই ফুলের বাগানটা আরও সুন্দর হয়েছে। কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন, এই বাগানের অংশটায় সবই ইতালীয় ফুল; স্মরণাতীতকাল থেকে লোকে তাই দেখে আসছে। এটা যে কি করে হল তা কেউ জানে না, কিন্তু এখানকার মাটিতে নিশ্চয় এমন কোন পুরনো বীজ ছিল যা থেকে এই সব ফুলের গাছ জন্মেছে। বেড়ার গায়ে এই সাইক্লোমেনের ঝোপটার দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

"ডিনারের সময় বাড়ির অদল-বদলের কথাটা আবার উঠল। মিসেস গ্রেটহেড তখনও বেড়াটা ভেঙে দেওয়ায় আপত্তি করায় তার ছোট ছেলে হ্যারি বলল, মামণি এমনিভাব দেখাচ্ছে যেন ফুলের জন্যই সে বেড়াটা ভেঙে দিতে আপত্তি করছে, কিন্তু আমি ঠিক জানি যে আসল কারণ হল, মামণি ভূতকে চটাতে ভয় পাচ্ছে।' মিসেস গ্রেটহেড বললেন, 'যত বাজে কথা হ্যারির। আপনি ওর কথা বিশ্বাস করবেন না মিঃ ফেরাল্‌দি।'

"ছেলেটি বলল, 'দেখ মামণি, তুমি যা দেখেছ সেটা কোন ভূত নয় সেকথা যে তুমি কোনদিন স্বীকার করবে না তা তো তুমিও জান।"

"তিনি বললেন, 'সেটা কি ছিল সে কথা থাক; ও বেড়া ভাঙতে আমি দেব না।' তারপর বললেন, 'আচ্ছা মিঃ ফেরাল্‌দি কেউ ভূতে বিশ্বাস করে শুনলে আপনি নিশ্চয়ই হাসবেন।"

"আমি জবাব দিলাম, 'মোটেই না, বরং ঠিকই উল্টো ; আমি নিজেই ভূতে বিশ্বাস করি, আর তার যথেষ্ট কারণও আছে ; আমাদের পরিবারেই একটি বিখ্যাত ভূত আছে।"

'অথচ দেখুন না, মিঃ গ্রেটহেড ও ছেলেরা আমাকে ঠাট্টা করে। কিন্তু মিঃ গ্রেটহেডের ঠাকুরদার মৃত্যুর পরে আমি এখন এখানে বাস করতে এলাম—তার বাবা কখনও এ বাড়িতে বাস করেন নি, কারণ বৃদ্ধের মৃত্যুর আগেই দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছিল—তখন কিন্তু আমি ঘুণাক্ষরেও শুনি নি যে এ জায়গাটা ভুতুড়ে, আর শুনলেও হয় তো আমি সেকথা বিশ্বাসই করতাম না।

কিন্তু একদিন সন্ধ্যেবেলা—ছেলেমেয়েরা তখন শুতে চলে গেছে, আর মিঃ গ্রেটহেড ও জর্জ কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে খাবার ঘরে বসে আছে—তখন আমি ও আমার এক বোন বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। আগষ্ট মাস, উজ্জ্বল তারা-ভরা রাত। হঠাৎ আমার বোন কথা বন্ধ করে আমার হাতে হাত রেখে বলে উঠল, 'ও কে?' চোখ তুলে দেখলাম, মাত্র কয়েক গজ দূরে একটি বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ; শীর্ণ-বিশীর্ণ চেহারা, অদ্ভুত একটা সেকেলে পোশাক পরা, মাথায় একটা খাড়া টুপি। ফুল-বাগানের এত কাছে দাঁড়িয়ে সে কি করছে, লোকটিই বা কে হতে পারে, কিছুই বুঝতে পারলাম না ; তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাগানের এক কোণে একটা পুরনো সমাধির ভগ্নস্তূপ আপনি দেখেছেন কি না জানি না। লোকে বলে, ওটা গ্রাম্য গির্জার জনৈক প্রাক্তন রেক্টরের সমাধি ; ১৫৫০ তারিখটা এখনও পড়া যায়। বুড়ো লোকটি বেড়ার এক কোণ থেকে সমাধির পাথরটা পর্যন্ত হেঁটে গেল, মনে হল সে যেন পা গুণে গুণে গেল। কোন জমি মাপতে হলে লোকে যেভাবে হাঁটে সেই রকম। তারপর থেমে গিয়ে হাতের কাগজ-পেন্সিলে মাপটা লিখে নিল। পুনরায় সেই একই কাজ করল, বেড়ার অন্য কোন থেকে হেঁটে সমাধি পর্যন্ত গেল এবং ফিরে এল।

বেড়াটা সরিয়ে দিয়ে পুরনো সমাধিটা খুঁড়ে ফেলা হোক। "সেই সময় একবার কথা হয়েছিল, আমার মনে হল, এ বিষয়ে আমার স্বামী যেন কার সঙ্গে কথা বলেছিল, সে ব্যাপারের সঙ্গেই এ লোকটির কোন যোগাযোগ থাকতে পারে ; তবু তার পোশাক ও চেহারা দেখে আমার যেন অদ্ভুত লেগেছিল। আরও আশ্চর্য যে লোকটি যেন আমাদের দেখতে পেল না ; তাছাড়া, আমাদের খুব কাছে থাকা সত্ত্বেও তার কোন পায়ের শব্দ আমরা শুনতে পাই নি ; কিন্তু তখন এ ব্যাপারগুলো ঠিক খেয়াল হয় নি। যাই হোক, এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করব যে সে কি চায়, সেই সময় বোনটি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ধপাস করে মাটিতে এলিয়ে পড়ল ; আর ঠিক সেই মুহূর্তে রহস্যময় বুড়ো মানুষটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

"বোনটি বলল, তার হাঁটু দুটো হঠাৎ বেঁকে গেল, আর ভয় পেয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। আমি যে খুব স্বস্তি পাচ্ছিলাম তা নয় ; বোনকে তুলে ধরে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর চলে গেলাম এবং যা দেখেছি সব বললাম। লোকজনরা ছুটে গেল, কিছুই দেখতে না পেয়ে আমাদের ঠাট্টা করতে লাগল ; কিন্তু কিছুদিন পরে হ্যারির জন্ম হলে গ্রাম থেকে আমার জন্য একটি নার্স এসেছিল ; একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, একটি বুড়ো মানুষকে আমি কখনও হেঁটে বেড়াতে দেখেছি কি না।

সেদিনকার ঘটনার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, তাই জানতে চাইলাম সে কোন্ বুড়োর কথা বলছে। তখন সে আমাকে বলল, অনেককাল আগে এখানে একটি বিদেশী ভদ্রলোক খুন হয়েছিল,—অর্থাৎ এই বাড়িটা তৈরী করার সময় মিঃ গ্রেটহেডের ঠাকুর্দা যে পুরোনো বাড়িটা ভেঙে ফেলেছিলেন সেই বাড়িতে ; সেই থেকেই এ জায়গাটাতে ভূতে পেয়েছে, সন্ধ্যার পরে কেউ এই বেড়া ও পুরনো সমাধির পাশ দিয়ে হাঁটে না ; কারণ ভূতটা ঐটুকু জায়গার মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়।

"আমি বললাম, "কিন্তু আমার তো মনে হয় ও জিনিসগুলো অক্ষত না রেখে ভেঙে সরিয়ে দেওয়াই তো আপনার দিক থেকে ভাল, কারণ তাহলে হয় তো ভূতটা এখানে আসা একেবারেই বন্ধ করে দেবে।

'ঠিক উল্টো।' জবাব দিলেন মিঃ জি, "আশেপাশে লোকেরা বলে, এই বাড়ির আগেকার মালিকও সেইরকমই ভেবেছিলেন, এবং সবকিছু ভেঙে ফেলাই স্থির করেছিলেন; কিন্তু তার পর থেকেই বুড়ো লোকটি উৎপাত শুরু করে দিল, এমন কি বাড়িতে হানা দিতে লাগল। নার্সটি তো আমাকে নিশ্চিত করেই বলেছিল যে বুড়ো মিঃ গ্রেটহেডেরও সেই ইচ্ছাই হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তিনি পাল্টা আদেশ দিয়ে ভাঙচুর বন্ধ করে দিলেন; মুখে তিনি কিছু না বললেও লোকের বিশ্বাস তিনি ভূতটাকে দেখেছিলেন।

"যুবকরা হাসতে লাগল, কিন্তু মহিলাটি তার প্রতিবাদে স্থির-সংকল্প; বললেন, ভূতের ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেও তিনি বেড়াটাকে ভালবাসেন ইতালীয় ফুলগুলির জন্য আর কবরটাকে পছন্দ করেন তার প্রাচীনতার জন্য। ফলে মিঃ গ্রেটহেডের পরিকল্পনার পরিবর্তন করে স্থির হল যে বেড়া ও সমাধিকে যথাযথ রেখেই নালাটার গতি-পথ বদলে দেওয়া হবে।

"কয়েকদিনের মধ্যেই আমার পরিবারের লোকজন এসে পড়ল, আর আমিও গ্রীষ্মকালের মত এসে শহরে বাসা বাঁধলাম। আমার কাজকর্ম বেশ জমে উঠল, মিঃ ও মিসেস গ্রেটহেডের আনুকুল্যে এবং আমার ও আমার স্ত্রীর প্রতি তাদের ব্যক্তিগত সদয় ব্যবহারের ফলে বেশ আরামেই আমাদের দিন কাটতে লাগল। আমাদের লণ্ডনে ফিরে যাবার সময় হয়ে এলে তারা আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, চলে যাবার আগে একটা পক্ষকাল যেন তাদের কাটিয়ে যাই; তাই আমাদের বাসা ছেড়ে দেবার দিনই আমরা সাল্টনে চলে গেলাম।

ইতিমধ্যে নালাটাকে ঘুরিয়ে দেবার কাজ শুরু হয়ে গেছে। পেঁছিবার

পরেই আমি মিঃ গ্রেটহেডের সঙ্গে কাজকর্ম দেখতে বেরিয়ে গেলাম। মজুরদের মধ্যে বছর চৌদ্দ বয়সের একটি ছেলে ছিল। আমরা তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। একটা কিছু তুলে নিয়ে মিঃ জির-র হাতে দিয়ে সে বলল, এটা কি আপনার স্যার?' পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা ষোড়শ শতাব্দীর একটা স্বর্ণমুদ্রা—তার উপর তারিখ লেখা ১৫৪৫। ছেলেটি তখনও খুঁড়েই চলেছে; সে আরও একটা স্বর্ণমুদ্রা পেল তারপর আরও কয়েকটা।

"মিঃ গ্রেটহেড বললেন, 'খুব মজার ব্যাপার তো; মনে হচ্ছে আমরা কোন গুপ্তধন পেয়ে গেছি; ফিস্ ফিস্ করে বললেন, তিনি এখন সেখান থেকে যাবেন না।

"ফলে ডিনারের সময় পর্যন্ত তিনি সেখানেই রইলেন, এবং আগ্রহের বশে আমিও থেকে গেলাম।

এরপর আরও অনেকগুলো মুদ্রা পাওয়া গেল। মিঃ গ্রেটহেড চলে যাবার সময় মজুরদের ছুটি দিয়ে দিলেন এবং জায়গাটা পাহারা দেবার জন্য একটি চাকরকে পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন আরও কয়েকটি মুদ্রা ওঠার পরেই মনে হল যে ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা যখন এই টাকা পাওয়ার কথা শুনল তখন তারা সকলেই মনে করল যে এই জন্যই বুড়ো লোকটি এই জায়গাটাতে ভর করেছিল। কোন সন্দেহ নেই যে টাকাগুলি সেই পুঁতে রেখেছিল; এখন দেখা যাক, টাকাটা যখন পাওয়া গেছে তখন তার অশরীরি আত্মা শান্ত হয় কি না।

আমার দুটি শিশুই সেই সময় আমার সঙ্গে সাল্টনে ছিল। তারা ঘুমাত চারতলার একটা ঘরে। একদিন সকালে আমার স্ত্রী বলল যে ছোট মেয়েটির অসুখ করেছে, তাই তাকে দেখতে আমি উপরে উঠে গেলাম। সুন্দর খোলামেলা ঘর, দুটি ছোট সাদা বিছানা, ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা পুরনো ছবির প্রিণ্ট দেওয়ালে টাঙানো; সাধারণতই

নার্সারিতে যে রকমটা দেখা যায়। মেয়ের সঙ্গে কিছু কথা বললাম; আমার স্ত্রী দাসীর সঙ্গে কথা বলল; তারপর দুই পকেটে হাত রেখে আমি অকারণেই চারদিকে তাকাতে লাগলাম। একটি জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল; প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি; কয়েকটি রেখা ও বিন্দু আঁকা এই বিবর্ণ পার্চমেণ্ট কাগজখানাকে কেন যে ঝকঝকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে তাও বুঝি নি। এখানে-ওখানে কয়েকটি কথা লেখা আছে, কিন্তু আমি তা পড়তে পারি নি; তাই ফ্রেমটাকে পেরেক থেকে তুলে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন বুঝলাম যে শব্দগুলো ইতালীয় ভাষায় সেকেলে আঁকাবাঁকা হাতে লেখা ঃ প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল একটা শিবিরের নক্সা বা রেখাচিত্র—কিন্তু ভালভাবে নজর করে দেখতে পেলাম একটা গির্জার প্রাঙ্গণের অংশবিশেষ; তাতে অনেক কবর দেখানো রয়েছে, আর তারই একটা কবর থেকে অনেকগুলো রেখা টানা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুর দিকে সেই রেখাগুলোর মাঝে মাঝে সংখ্যা বসানো, আর এখানে-ওখানে ডাইনে, বাঁয়ে কিছু শব্দ। তাতে সমকোণ সৃষ্টিকারী দুটো সরলরেখা পুরো কাগজটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে। কিছুক্ষণ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার পরে আমার মাথায় এল, যে গির্জার প্রাঙ্গন ও বেড়া নিয়ে কয়েকদিন আগে এত কথা হয়েছিল এটা তারই একটা মোটামুটি মানচিত্র।

"প্রাতরাশে বসে মিঃ ও মিসেস গ্রেটহেডকে কথাগুলি বললাম; তারাও আমার কথা বিশ্বাস করলেন; পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলার সময় ওটা পাওয়া গিয়েছিল, এবং পুরানবস্তু হিসাবেই ওটাকে রেখে দেওয়া হয়েছে। আমি শুধালাম, ওটা কোন যুগের জিনিস? আর একজন ইতালীয়ই বা ওটা তৈরী করেছিল কেন?'

"মিঃ গ্রেটহেড বললেন, 'শেষ প্রশ্নটার জবাব দিতে পারব না; কিন্তু তারিখটা তো ওটার উপরেই লেখা আছে বলে আমার বিশ্বাস।'

"আমি বললাম, 'না' আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখছি—কোন তারিখ নেই।'

'আঃ, আমার তো ধারণা ওতে তারিখ ও নাম দুইই আছে—তবে আমি নিজে কখনও ভাল করে দেখি নি।' ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য তিনি ছেলে হ্যারিকে উপরে পাঠালেন ওটা নিয়ে আসতে ; বললেন জানেন তো কয়েক শতাব্দী আগে নানা ধরনের ইতালীয় স্থপতি ও নক্সাকারী এদেশে বিরল ছিল না।'

"হ্যারি ফ্রেমটা নিয়ে এল, সেটা নিয়ে অনেক কথাও হল, কিন্তু কোন তারিখ বা নাম খুঁজে পাওয়া গেল না।"

তবু আমার মনে হচ্ছে আমি শুনেছি যে নাম ও তারিখ ছিল। ফ্রেম থেকে ওটাকে খুলে দেখা যাক।'

'কাজটা সহজেই করা গেল, আর তারিখ ও নামও পেয়ে গেলাম।'

কাউ একটু থেমে আবার বললেন—'আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন ?'

'জাকোপো ফেরাল্‌দি ?' আমি বললাম।

তিনি জবাব দিলেন, 'ঠিক তাই, "আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় এল, তার খুন হবার রাতে যে টাকা চুরি হয়েছিল বলে মনে করা হয়েছিল সেটা তিনিই মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর এই নক্সাটা হচ্ছে সেই জায়গাটা, পরে খুঁজে বের করবার নির্দেশিকা। তাই যে কাহিনী এখন আপনাদের বললাম সেটাই মিঃ গ্রেটহেডকেও বলেছিলাম ; তাকে আরও বলেছিলাম যে আমার এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে সেখানে আরও সোনা পাওয়া যাবে।

"বুড়ো লোকটির মানচিত্রটাকে নির্দেশিকা হিসাবে মেনে নিয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিলাম। ঠিক যেমনটি আশা করেছিলাম, দেখা গেল যে বাগানের কবরের পাথরটাই হচ্ছে সেই জায়গাটি যেখান থেকে সবগুলি রেখা টানা হয়েছে। মনে হল টাকাটা ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন থলেয় ভর্তি করে রাখা হয়েছিল ; কালক্রমে থলেগুলি পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

স্মৃতি-কথায় যত টাকার উল্লেখ ছিল তার সবটাই পাওয়া গেল ; জমিদার বাড়ির কর্তা হিসাবে মিঃ গ্রেটহেড উদারতাবশত আইনসম্মত উত্তরাধিকারী হিসাবে সব টাকাটা আমার হাতেই তুলে দিলেন, যদিও আমি মোটেই সেই টাকার উত্তরাধিকারী নই, কারণ আসলে সেটা খুন ও চুরির মাল, আর ন্যায়ত অ্যালেনরাই তার মালিক। কিন্তু সে পরিবারটি নির্বংশ হয়ে গেছে ; অন্তত আমাদের তাই বিশ্বাস, কারণ ভাগ্যহীনা দুটি মহিলারই প্রাণদণ্ড হয়েছিল। তাই অনেক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এবং শান্ত বিবেকই সে দান আমি গ্রহণ করলাম। সেটা পেয়ে আমি আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম এবং ভবিষ্যতে সুদিনের জন্য প্রতীক্ষার সুযোগ পেলাম।

সমাপ্ত

www.deshkal.com